—উৎসর্গ—

যাঁর নিরন্তর প্রেরণা ও ইচ্ছার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ
আমার সেই শিক্ষক-সাহিত্যিক প্রাজ্ঞ

পিতাকে

সূচি

নিবেদন

এ যাবৎ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। শ্রমসিদ্ধ গবেষণাগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সকলেই হাস্যরসের প্রচলিত ধারা humour, satire, wit fun-কে দৃষ্টিতে রেখে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাসমূহের সমৃদ্ধি নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। অথচ এর বাইরেও যে কল্পনার অতিরঞ্জনের খেয়াল খেলা থেকে একধরণের হাস সৃষ্টি হয়েছে, তা তাদের অলক্ষ্যে রয়ে গেছে।

আরও লক্ষ্য করবার হল, হাস্যরসের পরিচিত ধারাচতুষ্টয়ের সৃষ্টি হয়েছে কোন-না-কোনভাবে আমাদের গভীর গম্ভীর সত্তাকে আলোড়িত করে। কিন্তু কল্পনার খেয়াল খেলার হাসি উৎসারিত হয়েছে আমাদের লঘুউচ্ছল প্রসন্ন সত্তা থেকে। ফলতঃ প্রথম ক্ষেত্রে হাসি যেখানে অশ্রু ও অসূয়ামুক্ত হয়ে প্রসন্ন ও বিশুদ্ধ হতে পারে নি, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাসি সেখানে আঘাত-পীড়ন-অশ্রুমুক্ত, অতএব বিশুদ্ধ। কল্পনার এই হাসি যখন সাহিত্যে রূপলাভ করেছে, ওদেশ তাকে grotesque, bizarrerie, nonsense literature বলে গ্রহণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে তাকে **উৎকল্পনার হাস্যরস** বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের রৌদ্রালোকিত প্রান্তরে সার্ধশতকের ওপর ধরে উৎকল্পনার এই হাস্যরসের একটি ধারা স্ফীতউচ্ছলতায় প্রবাহিত রয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে এই ধারায় সোৎসাহে বিচরণ করে ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অথচ বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের বিস্তৃত আলোচনায় এই ধারা-প্রবাহটি উপেক্ষিত।

গত কয়েক বছর ধরে এই ধারাটির উৎস ও প্রকৃতির সন্ধান করেছি। এই আলোচনার পূর্বসূরি নেই বলেই মনে করি। আর সেজন্যই একরকম নিঃসঙ্গ সভয় বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমার এই বিশ্লেষণকে পি-এইচ. ডি. উপাধিতে গ্রহণ করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

নিয়ত আমাকে যিনি উৎসাহিত করেছিলেন, পরিচালিত করেছিলেন আমার সেই শিক্ষক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আজ প্রয়াত। এই গ্রন্থ

প্রকাশক্ষণে তাঁকে স্মরণ করি। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য আমার হতোদ্যম অবস্থায় উৎসাহ দিয়েছেন, আমার 'গাইড্' হতে সম্মত হয়েছেন। শিক্ষক-ঋণ অপরিশোধ্য। সুহৃদ্-ঋণেও আমি ঋণী। অধ্যাপক অশোক বসু, অধ্যাপক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডঃ প্রসূন মুখার্জি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমার চিন্তাসূত্রকে সুগতি দিয়েছে। অপর যে সুহৃদ্‌কে স্মরণ করব তিনি হলেন জিতেন মৈত্র। দিনে-দিনে সংবাদ নিয়েছেন, আর কত দূর। আমার পক্ষে তিনি এক উৎসাহ-উৎস। বন্ধুবর মধুসূদন ভট্টাচার্য এক অপরিশোধ্য ঋণে আমাকে ঋণী করেছেন।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় আমার ছাত্র সুকৃতি মুখার্জি দিনরাত পরিশ্রম করে সাহায্য করেছে। সাহায্য করেছে শমিতা চক্রবর্তী, বুদ্ধীশ্বর নাইঞা, শুক্লা বিশ্বাস। তাদের কাছে আমার সানন্দ ঋণ।

আরেকজনের কাছে আমার ঋণ রয়েছে। তিনি শাশ্বতী চক্রবর্তী, এম. এ., সাহিত্যভারতী। তাঁর সাহায্য ব্যতীত পূর্বসূরিত্বহীন এই গ্রন্থ-রচনা অসম্ভব হত।

প্রকাশক গ্রন্থপ্রকাশের দায়িত্ব না নিলে এ গ্রন্থ হয়তো প্রকাশিতই হত না। তাঁর উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশক সম্পর্কে আমার মনোভাবকে বেশ কিছুটা ঝাঁকিয়ে দিয়েছে।

আমার এই সামান্য প্রয়াসে যদি বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী পাঠক-সমাজ বিন্দুমাত্র উপকৃত হন, তবেই এই শ্রমের সাফল্য।

মানুষ যুগপৎ হাস্যপ্রিয় এবং দুঃখভোগী জীব। তার জীবনের রূপ হাসি ও কান্নার দ্বারা আলিম্পিত একটি আলেখ্য। এ্যারিস্টটল মানবপ্রকৃতির এই দুই দিককে 'Grave spirit এবং 'Trivial sort' আখ্যা দিয়েছেন। মানুষ জীবনের Grave spirit-কে বাণীরূপ দিয়ে সাহিত্যের মহান বেদনা, গভীর ক্রন্দন, গম্ভীর ভাবনার সৃষ্টি করেন। পক্ষান্তরে স্বভাবের এই লঘু উচ্ছল খেয়ালী দিকটির মুক্তির মধ্যেই হাসির উৎসার। বাস্তব জীবনে যে রূঢ় কর্মব্যস্ততা রয়েছে, যেদিকে তাকালে দেখি জীবনে দুঃখকষ্ট, সমস্যাজ্বালা বহুতর, তার মধ্যেও মানুষ হাসির উপাদানের সন্ধান ক'রে চলেছে। এই দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধানেই জীবনের পূর্ণতা এবং সাহিত্যের সম্পূর্ণতা।

যে মানুষ হাসতে পারে না জীবনীশক্তি তার ক্ষয়িষ্ণু। রোহিতকে ছদ্মবেশী ইন্দ্র পর পর পাঁচবার 'চরৈবেতি' মন্ত্রে যেমন বলেছেন,—যে চলে তার দেহ-শোভা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়, তার আত্মা দিন দিন বিকশিত হয়, পাপ অবসন্ন হয়,—অনুরূপ মত হাস্যসম্বন্ধেও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ পোষণ করেন। যে হাসে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, শিরাপেশী স্ফীত এবং বর্ধিত হয়, অবসন্নতা বিদূরিত হয়ে মন প্রফুল্ল ও শ্রীমণ্ডিত হয়। দুঃখবেদনার মধ্যে একটা সংকোচন ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু হাস্যের মধ্যে রয়েছে সম্প্রসারণ শক্তি। J. Sully হাস্যের এই শক্তির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "It (laughter) illustrates the broad generation laid down by psychologists that a state of pleasure manifests itself in vigorous and expansive movements whereas a state of pain involves a lowering of muscular energy and a kind of shrinking into oneself.[১] দুঃখবেদনার তীব্রতা হৃদয়কে স্পর্শ ক'রে রক্তচলাচলের স্বাভাবিক অনাহত গতিকে মন্থর করে তোলে; বুক ব্যথিত হয়ে ওঠে; সমস্ত স্নায়ুশক্তি যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে কুণ্ডলীপাকিয়ে মন্থর হয়ে আসতে চায়। কিন্তু হাসি রক্তপ্রবাহকে দ্রুত করে। বানের জলে খালবিলের মত শরীরের শিরাপেশী রক্তস্নাত সঞ্চালিত হয়। ফলে ফুস্‌ফুস্ সবল ও দেহযন্ত্র সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জীবনীশক্তি বর্ধিত হয়ে দেহমন অনবসন্নতায় শ্রীযুক্ত হয়।

---

১. Sully. J.—An Essay on Laughter.

যে হাসতে পারে না সে যেমন পরকে আপন করতে পারে না, আপনাকেও আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডী থেকে দশের মধ্যে মুক্তি দিতে অপারগ হয়। সুতরাং সে রোগগ্রস্ত, এবং এই কারণে আত্মহা বটে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও জীবনের এই সত্যই প্রদীপ্ত। যে জাতির সাহিত্যে হাসির অভাব, তার সৃজনশীলতা যতই দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ হোক, বেদনার মহনীয় বিকাশে ভাস্বর হোক, একদিকে সে দীন।

অথচ বিস্ময়কর এই যে বাস্তব জীবনে অশ্রুর তুলনায় হাসির অভাব না ঘটলেও, সাহিত্যে কিন্তু হাসির দীনতাই লক্ষণীয়। কবি-সাহিত্যিকগণ যুগে যুগে যত কাঁদিয়েছেন, তুলনাগতভাবে হাসিয়েছেন কম। সাহিত্যে আজ পর্যন্ত হাসির তুলনায় কান্নার পট রেখা ও বর্ণবহুল। অশ্রুসৃষ্টিতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাগণ উদাত্ত ও অকৃপণ; কিন্তু হাসি সৃষ্টিতে তাঁদের কৃপণতা স্মর্তব্য। শেক্সপীয়রের দলভুক্ত অনেকেই, কিন্তু মলিয়্যার প্রায় নিঃসঙ্গ। সুকুমার রায়ের উত্তরসূরী নেই।

আমাদের সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরস রসের তালিকাভুক্ত হয়েছে, কিন্তু স্রষ্টার অপূর্ব নির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞাপ্রতিভা করুণ বীরশৃঙ্গার রসসৃষ্টির মত হাস্যরস সৃষ্টিতে কখনই উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। কালিদাসের কাব্য নগাধিরাজ হিমালয়ের মত যে মহান গাম্ভীর্য এবং বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে বিরাজ করছে, সেখানে হাসির আলোকচূর্ণ উপেক্ষিত। আরো লক্ষণীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এবং প্রাচীনকালের সৃজণশীলক্ষমতা মনে করতেন উন্নত কোনো সত্তা থেকে নয়, নীচুতলার অপরিমার্জনা থেকে হাসির জন্ম। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের বিশ্লেষণীমন হাস্যরস সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। কিন্তু আলোচনান্তে "দীর্ঘত্বরহিতো হাস্যঃ" [২] বলে হাসিকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। পরন্তু বিদূষকের অঙ্গভঙ্গী ও রসিকতায় স্থান করে দিয়ে হাস্যরসের শেষ বিচার করেছে। এ্যারিস্টটল-এর Poetics-কে যে-রূপে আমরা পেয়েছি, তাতে দেখেছি Poetics ট্রাজেডী আলোচনার সুমথিত সমুদ্র। কিন্তু কমেডি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা স্বল্পস্থান-বিস্তৃত। হাস্যরস সম্পর্কে ওদেশের মনোভাবকে মেরেডিথ দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করেছেন, "Comedy, we have to admit, was never one of the most honoured of the Muses." [৩] প্রাচীন পণ্ডিতগণ শুধু নন,

---

২. কুম্ভকর্ণ—সঙ্গীতরাজ

৩. Meredith—The Idea of Comedy.

আধুনিক যুগেও জীবনকে ট্রাজেডীর মধ্যে উপলব্ধি করাই জীবনকে যথার্থ উপলব্ধি করা, এই মত অনেকে ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু জীবনসত্যের নিয়মেই এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধতাও হয়েছে। জীবনে আমাদের আর্থসামাজিক বিভিন্ন সমস্যা, প্রবৃত্তির বহুধা আকর্ষণ রয়েছে; কামনা ও বাসনার একাগ্রতা এবং তার অপূর্ণতাজনিত জ্বালা ও অশ্রুর ধারাসার রয়েছে। কিন্তু এই বেদনাকেই ঊর্ধ্বায়িত করে তুলবার চেষ্টার মধ্যে অনেকেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান নি। তাঁরা এই বাস্তব সত্যটাকে দেখেছেন যে দুঃখ-হতাশা, অন্ধকারের হাত থেকে আনন্দহাসি ও মিলনের মধ্যে মুক্তির সংগ্রাম মানুষের আদিম সংগ্রাম। বিচ্ছেদের সুর মানবজীবনের সুস্থ সুর নয়, মিলনের সুরই জীবনসুর। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে "a wise man and a gigantic laughter" র‍্যাবলা চোখের জলের চাইতে হাসিকেই স্বাগত জানিয়েছেন।[৪] Hartly Coleridge উচ্চহাসি দিয়ে জীবনের বিবর্ণতা ও কান্নাকে ধুইয়ে দিতে সরব হয়ে উঠেছেন।—

"On this hapless earth
There's small sincerity of mirth—
And laughter oft is but an art
To drown the outcry of the heart"[৫]

কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায়। যাঁরা হাসিকে জীবনালেখ্যের একটি অবিচ্ছেদ্যরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁরাও কি হাসি দিয়ে outcry of the

৪. Better to write of laughter than of tears. For laughter is the essence of mankind. Live happy (Gargantua Pantagruel) গ্রন্থারম্ভেই পাঠকের কাছে কবিতায় এই নিবেদন র‍্যাবলা জ্ঞাপন করেছেন—

... ...

No polished art with me you'll find
But laughter that can heel the mind.
You grieve ; and if my argument
Can comfort you I can content.
To laugh at fate through lip's short span
Is the prerogative of man. [Powys P—133]

৫. Hartly Coleridge—Address to Certain Gold Fishes.

heart ডুবিয়ে দিতে পেরেছেন ? সুপরিচিত হাস্যধারাগুলি কি তা পেরেছে ? অনস্বীকার্য সত্য হল এই যে সর্বস্বীকৃত যে হাস্যধারাচতুষ্টয়, যেমন humour, satire, wit, fun—তারা অশ্রুআঘাতমুক্ত বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করে মানুষকে আরামদানে অপারগ হয়েছে। হাসতে গিয়ে মানুষ কখনও কেঁদেছে, ভেবেছে, সংকুচিত হয়েছে। অর্থাৎ হাসাতে গিয়েও স্রষ্টারা জীবনের গভীর প্রদেশকেই আলোড়িত করেছেন। যেমন humour বা করুণ হাস্য।

যে করুণহাস্য বা humour-কে হাস্যরসের উচ্চপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে তাকে আমরা অশ্রুসিক্ত না করে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসাতে পারিনি। হাসি দিয়ে অপূর্ব করুণরস ও মর্মান্তিক দুঃখের অতর্কিত ইঙ্গিতসৃষ্টি শ্রেষ্ঠ humour-রচয়িতার লক্ষ্য। জীবনের প্রতি ট্রাজেডীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এর উদ্ভব। প্রত্যক্ষ-দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে humour-এর আঘাত হয়তো অনুভূত হয় না। কিন্তু নিবিষ্ট-বিচারে দেখা যাবে কোনো না কোনোভাবে বৃহত্তর জীবনমহিমাকে পর্যুদস্ত করার মধ্যেই তার সার্থকতা। ফলতঃ humour-এর হাসির রসরূপটি সর্বথা সজল। রবীন্দ্রনাথ করুণহাস্যের স্বরূপ সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন।—

"বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভেতরে থাকে আঁখির জল।"

Lamb-এর অট্টহাসির অন্তরালে অশ্রু রয়েছে এবং খেয়ালী কল্পনার বহির্লঘুতার মধ্যে রয়েছে গভীরতর জীবনবোধের স্থিরতা। Dickens-এর রচনায় যে humour, তা অশ্রুসজলতা আশ্রয়ী। বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনে, রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমারের হাসি সৃষ্টিতে এই ধর্ম উপস্থিত। Humour শব্দটির যে উৎপত্তিগত অর্থ, সেক্ষেত্রেও এই সজলতা উল্লিখিত।[৬] এইজন্যই humour প্রসন্ন হয়েও বেপরোয়া উচ্চহাস্যের ফলশ্রুতি রচনায় অপরাগ।

Satire-এর হাসি অন্যকে আহত না করে সৃষ্ট হতে পারে না। ব্যক্তি বা শ্রেণীমানুষের দুর্বলতার উপর, রাষ্ট্র বা সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতির উপর হাসির কশাঘাত হেনে সংস্কারমানসে satire-এর উদ্ভব। এর মধ্যে শ্রেণীবৈষম্য স্পষ্ট। এক শ্রেণীর মানুষ হেসে ওঠে অন্য শ্রেণীর পিঠে হাসির শঙ্কর চাবুক পড়তে দেখে। যাদের পিঠে পড়ে তারা হাসতে গিয়ে আহত হয়, লজ্জিত হয়; কখনও ক্ষুব্ধ হয়,

---

৬. Humour—Latin humour—noisture :—Evryman's Encyclopaedia—6th volume.

রক্তে জ্বালা ধরে। Satire-এর চরিত্র সুলিখিত হয়েছে, "A Treasury of Laughter"-গ্রন্থের ভূমিকায়—"Satire is probing and critical ; it cuts through pretension with quick corrosive acid ; its purpose is coldly destructive."[৭] "Coldly destructive -চরিত্রের জন্যই satire "outcry of the heart"-কে ডুবিয়ে দিয়ে বিশুদ্ধ হাসির আনন্দে আমাদের আরাম দিতে অক্ষম। Dryden কি Pope ; Swift কি Shaw ; কালীপ্রসন্ন সিংহ কি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের হাস্যসৃষ্টি সমাজ ও জীবনের প্রতি যে-আঘাতে জর্জরিত, তার পটভূমিতে উচ্চহাস্যের প্রসন্ন আনন্দস্ফূর্তির কোন প্রকাশ নেই।

Wit-এর যে হাসি, তাও প্রসন্ন নয়। এবং উচ্ছ্বাসটাও রাশটানা। Wit কথা বলবার বিশুদ্ধ রসিক ভঙ্গীমাত্র। কথা নিয়ে, শব্দ নিয়ে, কথাশব্দের অর্থ নিয়ে অপ্রত্যাশিত বিচিত্র খেলা হচ্ছে wit. এ-খেলার উৎস বুদ্ধির দিবালোক, মনের নাগরিকতা। সমকক্ষ গোষ্ঠী না পেলে wit হাসতে নারাজ। ফলতঃ এর আবেদন তীক্ষ্ণধী, পরিশীলিত, এক ক্ষুদ্রাংশ পাঠক-সমাজের নিকট। Wit-এর হাসির উপভোগ্যতায় তাই শ্রেণীভাগ স্পষ্ট। Wit উচ্চস্তর থেকে সাধারণ্যে নেমে আসতে পারেনি। যে কোন শিল্পকৃতি সচেতনভাবে, স্বেচ্ছাকৃত হয়ে যদি বহুকে বঞ্চিত করে তা'হলে নিশ্চয়ই তা অসাধু ও নিষ্ঠুর। আভিজাত্যের এই নিষ্ঠুরতার জন্যেই wit-এর হাসির প্রতি সর্বজনমনের প্রসন্ন আত্মীয়তার দৃষ্টি নেই। ততোধিক wit-কে ঘিরে বুদ্ধির যে শাণিত আলোকরশ্মি বিরাজ করে, তা wit-এর তনুঙ্গ থেকে বেপরোয়া উচ্ছল হাস্যকে ছেঁটে দিয়ে তাকে ছিমছাম ভদ্র ক'রে রেখেছে। Wit-এর হাসি এই স্বভাবধর্মেই humour ও satire-এর স্তরভুক্ত। অর্থাৎ বিশুদ্ধ হাসির আনন্দ-সঞ্চারে ব্যর্থ হয়েছে।

কৌতুক হাসি বা fun-এর মধ্যে উচ্ছ্বসিত আমোদ রয়েছে। "কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি।"[৮] Humour-এর মত কৌতুকের আড়ালে কোন গভীর জীবনানুভূতি নেই ; satire-এর মত হাসির কশাঘাতে সংস্কার-মানসের একাগ্রতাও নেই ; wit-এর বুদ্ধিদীপ্ত অভিজাত ও বাক্‌প্রসূত হাসি

---

৭. Louis Lutermeyer—A Treasury of Laughter.

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কৌতুকহাস্য, পঞ্চভূত

কৌতুকের হাসি নয়। Fun অনেকাংশে "An art to drown the outcry of the heart." কিন্তু সর্বাংশে যে নয়, তার কারণ কৌতুক হাসির মূলে যে পীড়ন থেকে যায়, তা রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন। কৌতুক শব্দটির প্রতিশব্দ যে ক'টি বলা যাবে,—'আমোদ', 'মজা', 'ঠাট্টা' 'তামাশা', 'রহস্য'[৯]—তাদের প্রত্যেকের মূলে সে সূক্ষ্মপীড়ন রয়েছে, তা শব্দচরিত্রই প্রকাশ করে। পীড়নের এই উপস্থিতির জন্যই স্রষ্টার নিরাসক্ত মনের ব্যাপক খুশিতে কৌতুকহাস্য উজ্জ্বল নয়। এই পীড়নের পথেই শ্রেণীবৈষম্য এখানেও স্পষ্ট। কৌতুক হাসির মাত্রা সম্পর্কে যত সচেতন হই না কেন, পীড়ন থাকবেই। মাত্রাসচেতনতার জন্য পীড়ন হাসির অন্তরালে সংগুপ্ত থাকে। মাত্রা বিস্মৃত হলে পীড়ন অশ্রুময় ও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, defects of others থেকেই যে কৌতুক হাসির সৃষ্টি একথা Thomas Hobbes-ও স্বীকার করেছেন তাঁর Leviathan গ্রন্থে। 'Laughter' প্রবন্ধে ম্যাক্স্ বীয়রবম্ লক্ষ্য করেছেন যে খোঁচা দিয়ে জগতের বেশির ভাগ কৌতুক হাসির সৃষ্টি।

এই খোঁচা বা পীড়নের অস্তিত্বের জন্যই কৌতুকহাস্যের উপভোগে এপক্ষ ওপক্ষ এসে পড়েছে। পীড়ন সূক্ষ্ম হোক, স্থূল হোক, একপক্ষ তাকে সহ্য ক'রে অপরপক্ষকে হাসায়। কৌতুক সৃষ্টিতে হাসির লক্ষ্য যারা, স্রষ্টার সূক্ষ্মপীড়ন সৃষ্টির নৈপুণ্যে তারা তা গায়ে না মেখে হেসে ওঠে সত্য, কিন্তু হাসতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তাদের হাসির তলায় একটু অসহায়তা, ব্যথাবোধ, কিছুটা হয়তো রুচি ও মনের অস্বস্তি দেখা যায়। পীড়ন যেখানে স্থূল সেখানে লক্ষ্য যারা, তারা অন্যের উচ্ছ্বসিত হাসির পটভূমিতে ব্যথায় কাঁদে। কৌতুকের হাসির মধ্যে এই কারণে উপভোগের সর্বসাধারণত্ব নেই।

সুতরাং অশ্রু-আঘাত-দাহমুক্ত প্রসন্নমনের বিশুদ্ধ হাস্যসৃষ্টিতে আমাদের পরিচিত হাস্যধারাগুলি যে অপরাগ হয়েছে, একথা বোধহয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। বিশ্লেষিত বক্তব্য যদি গ্রাহ্য বিবেচিত হয়ে থাকে এবং এ্যারিস্টটল grave spirit ও trivial sort অভিধায় মানবপ্রকৃতির যে সুচিন্তিত এবং সূত্রায়িত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকে গ্রহণ করতে যদি দ্বিধা না থাকে, তাহলে যথেষ্ট প্রত্যয় নিয়ে এই উপপত্তিতে পৌছন যায় যে, দেশে দেশে পরিচিত

৯. সংসদ বাংলা অভিধান

হাস্যধারাগুলিও মূলতঃ স্রষ্টার grave spirit থেকেই জন্ম নিয়েছে, মনের প্রসন্নলঘু উচ্ছলতা বা trivial sort থেকে উৎসারিত হয়নি। এবং সর্বথাই তা হাসির অবয়বে পাঠকের 'সিরিয়স' মনটাকেই চকিত ও উদ্বেজিত করে তুলেছে। ফলে হাস্যরসের সুপরিচিত ধারাগুলিতে পাঠক বিশুদ্ধ হাসির আনন্দ লাভে স্বভাবতই ব্যর্থ হয়েছেন।

হাস্যরসের সাহিত্যভূমিতে এই গুরুত্বগর্ভ দিকটা লক্ষ্য করেই একশ্রেণীর লেখক হাসির ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা প্রয়াস করেছেন অশ্রুআঘাতদাহমুক্ত বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা। বিশুদ্ধ হাসির প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "তাকে একটুখানি হাসিয়ে দেই গে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।"[১০] বিশুদ্ধ হাসিতে শুধু যে বুদ্ধির ভেজাল থাকবে না তা নয়, রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় সেখানে অনুপস্থিত থাকবে 'ব্যঙ্গ', 'প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামো', 'চোখের জল।' অর্থাৎ এ-এক অবিমিশ্র হাস্যরসসামগ্রী। অশ্রু-আঘাত-পীড়ন বুদ্ধি-সর্বস্বতার কোন ফলশ্রুতি এখানে নেই। আর যা অবিমিশ্র তার পক্ষে বিশুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। এই জাতের লেখা পড়ে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত হাসি হেসে উঠি। এই অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসির আনন্দ-ফলশ্রুতিকে ওদেশে অনেকে ব্যাখ্যা করেছেন, "delightful relief" বলে, এমনকি "divine light" অভিধায়। বিশুদ্ধ হাসি একদিকে বয়সের ব্যবধানকে ভেঙে চলে—ছয় থেকে ষাট বছরের পাঠক এর রসাবেদনে সামিল হয়। আরেকদিকে satire, wit, fun-এর রসাস্বাদনে যে শ্রেণীভাগ রয়েছে, বিশুদ্ধ হাসি তাকে ঘুচিয়ে দেয়। উপভোগের এই সর্বসাধারণ্য বিশুদ্ধ হাসির আন্তরবৈশিষ্ট্য।

জীবনসংগ্রামের শতভাঙচুরের মধ্যেও জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই মানব প্রকৃতিতে সংগুপ্ত রয়েছে একটি প্রসন্নলঘু উচ্ছল মন। অপরাজেয় জীবনীশক্তির নকীব সে। এই মনটা ক্ষণে ক্ষণে চায় সিরিয়স মন থেকে মুক্তি পেতে। জীবন যত সমস্যা-জটিল ও দ্বন্দ্বসংঘাত মুখর হয়ে উঠছে, মানুষ ততবেশি সেই জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে তার খেয়ালী প্রসন্ন মনটাকে বিকশিত ও উচ্ছ্বসিত করে তুলতে আগ্রহী হবেই। এই নিয়মেই উনিশ শতকের যন্ত্রসভ্য ইংলণ্ডের রূঢ় কঠিন পরিবেশে Alice's Adventures in Wanderland-এর 'delightful relief

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সে'

of the absurd' সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই একই নিয়মে সম্ভব হয়েছে চলন্তিকা রচয়িতা, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদক, বিজ্ঞানী রাজশেখর বসুর রেবতীর পতিলাভের মত উৎকল্পনার গল্পকথা সৃষ্টি, বিজ্ঞানী H. G. Wells-এর The story of the Late Mr. Eluesham-রচনা। এই নির্ভার আনন্দ-মুক্তির বাসনা থেকেই 'প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা'র লেখক বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আশী বছর পার করে দিয়ে ডঃ মালাকো-কে নিয়ে খেয়ালীমন ও মনের নির্মল উচ্ছলতায় মুখর হয়ে উঠেছেন; সত্তর বছরের বৃদ্ধ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলির উদ্ভট কল্পনায় সরব হয়ে উঠেছেন। এই অপরাজেয় মন পাঠকের খেয়ালী ও লঘু উচ্ছল প্রকৃতিকে উচ্চকিত করে তুলে নির্মল আনন্দ দান করে এবং জীবনের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণেই জীবনে হাসির মূল্য অসাধারণ। জীবনের এত বড় সত্যকে সাহিত্যেও যে-কোনো মূল্যে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

প্রসন্ন মনের এই অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করতে গিয়ে স্রষ্টারা আশ্রয় নিলেন কল্পনার বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির। তারই সাহায্যে তাঁরা নানারকম উদ্ভট, আজগুবি, খাপছাড়া চরিত্র, ঘটনা, কাহিনী নির্মাণ করে আমাদের বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধি, কার্যকারণ সম্পর্ক ও সঙ্গতিবোধকে উলটপাক খাইয়ে দিলেন। পাঠক স্বতস্ফূর্ত হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আর যেখানেই তা শক্তিশালী লেখনী থেকে উদ্ভূত হয়েছে, চতুর সমালোচক ও গুরুগম্ভীর শিল্পবিশেষজ্ঞ ও পাঠকসমাজ সেখানে তত্ত্ব খুঁজতে গিয়ে দেখলেন,—এ তাঁদের অগম্য! সাহিত্যে যখন এই বিশুদ্ধ হাসি রূপাবয়ব লাভ করেছে, ওদেশ তাকে Bizarre, Grotesque, Nonsense Literature বলে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। বাংলা সাহিত্যেও আমরা তাকে 'উৎকল্পনার হাস্যরস' অভিধায় গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

উৎকল্পনার হাস্যরসের একটা সংজ্ঞার্থ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে' গ্রন্থে। অবশ্য তিনি 'উৎকল্পনা' এই কথাটা ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ হাসির সৃষ্টিকে বলেছেন 'অসম্ভব কল্পনার সৃষ্টি।' রবীন্দ্রনাথ অনেকটা 'এহো বাহ্য আগে চল আর'—স্বরূপসন্ধানের এই পদ্ধতিতে বিচার করে দেখিয়েছেন বিশ্বাস্য বাস্তব জগৎটার পথঘাট দেশকাল ইতিহাস ভূগোল ইত্যাদি আশ্রয় করে কবিকল্পনা যখন বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের কল্পনার জগতে সফল যাত্রা করে এবং যখন লেখকের এই অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস্য করে তুলবার প্রচেষ্টা

দেখে পাঠক মজা পেতে পারেন তখনই সার্থক সৃষ্টি হয় অসম্ভব কল্পনার হাস্যরসের। এই সংজ্ঞার্থই উৎকল্পনার হাস্যরসের নিটোল সংজ্ঞার্থ।

উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টাদের অনেকেরই ব্যক্তিজীবনে পুঞ্জীভূত বিষাদ, তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে তাঁরা ট্রাজেডী রচনা করলেন না, তীব্র স্যাটায়ার সৃষ্টিতে উৎসাহী হলেন না, অথবা জীবনে কোনো দুঃখাবহ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি থেকে শিল্পচৈতন্যকে বিচ্যুত রাখার হিউমারসুলভ চেষ্টা করলেন না। Charles Lamb-এর ব্যক্তিগত জীবনে দুঃখবেদনার এক গোপন প্রদেশ ছিল। তিনি চেয়েছিলেন হাসি দিয়ে হৃদয়ক্ষত ধৌত করবেন। কিন্তু হাসির পত্রপুটে Lamb তাঁর আন্তরযন্ত্রণা ও অশ্রুকেই রূপ দিলেন। অপরপক্ষে Edward Lear-এর জীবনে 'melancholy' ছিল, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জীবনে সমাজ, দেশ, মানুষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত। এই বিষাদ ও তিক্ততাকে তাঁরা বিদূরিত করলেন উৎকল্পনার উচ্চ হাসি দিয়ে 'divine light of nonsence' সৃষ্টি করে। তাঁদের সৃষ্ট হাসির জগতে ফলতঃ অপূর্ব করুণরস, মর্মান্তিক দুঃখের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস অনুপস্থিত। তাঁরা কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধি খেলিয়ে কোথাও শিশুর চপলতা ও বিস্ময়, কৈশোরের দুষ্টামি ও গভীর কৌতূহল মিশ্রিত করে দিয়ে এমন এক উৎকল্পনার সাহিত্যজগৎ সৃষ্টি করলেন যেখানে কোনো দার্শনিক কুহেলি নেই। যার উৎস, বিস্তার ও পরিণতি অভিজ্ঞতায ধরা পড়ে না, কার্যকারণ সম্পর্কে যার ব্যাখ্যা চলে না। সুতরাং তা নিয়ে উচ্চহাসি ছাড়া উপায়ান্তর নেই; এই উচ্চহাসির সূত্রেই এখানে কোনরূপ অশ্রু-আঘাত-বেদনার ফলশ্রুতি সম্ভব নয়। এই হাসির ক্ষেত্র তাঁদের নিটোল আনন্দ ও মুক্তির ক্ষেত্র। স্বাভাবিক ধারানুসৃত বা ফর্মাল শিল্পে এই মুক্তি অলভ্য। এই জন্যই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির মধ্যে কোনরূপ সংগুপ্ত সত্য ও গূঢ়ার্থ সন্ধানের পণ্ডিত-সুলভ চতুরতা রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতার পণ্ডিতদের "উনিশ পিপে নস্যি ফুরিয়ে" যাবার মতই হাস্যকর হয়ে উঠতে বাধ্য। এই সত্যতা বিষয়ে অনবধান হলেই উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টাকে কখনও মনে হবে humorist, কখনও satirist।

হাস্যরসের পরিচিত ধারাগুলির সঙ্গে এই বিশেষ শাখার হাস্যসৃষ্টির রূপ ও রসগত পার্থক্য বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

উৎকল্পনার হাসির মূলে রয়েছে কল্পনার অসঙ্গতি। 'কল্পনার অসঙ্গতি'

কথাটা লক্ষণীয়। অসঙ্গতি থেকেই হাসির উদ্ভব। কিন্তু কল্পনার অসঙ্গতি থাকে একমাত্র উৎকল্পনার হাসির ক্ষেত্রেই।

Humour, satire, wit, fun-এর হাসিও অসঙ্গতি জাত। অসঙ্গতি ঘটছে তখনই, যখন একটা ঘটনা স্বাভাবিকভাবে ঘটছে না, একটা চরিত্রের যে-ভাবে চলা উচিত, সেভাবে চলছে না।[১১] যেমন—'কলকাতার দর্জিপাড়ার ছেলে নতুনদা[১২] তার চালচলন সাজপোষাকে আমাদের মনে সম্ভ্রমে, ভয়ে এবং অপছন্দে একটি বিশেষ মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই নতুনদাকে যখন দেখলাম 'ঠুন্‌ঠুন্ পেয়ালা' গান গাইতে গিয়ে কুকুরের তাড়া খেয়ে একগলা জলে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত স্বরে কেঁদে উঠল, "এই যে আমি"—তখন যে আমরা হেসে উঠছি, তার কারণ নতুনদার পূর্বেকার আচার আচরণ ও আস্ফালনের সঙ্গে তার এই দুর্দশাটা একেবারে বেমানান। এই অসঙ্গতি মারাত্মক হয়ে আমাদের হতভম্ব করতে পারত, কিম্বা নিদারুণ দুঃখ দিতে পারত কিন্তু অসঙ্গতি যেখানে অনুরূপ কিছু নয়, সেখানেই তা হাস্যকর। নতুনদাকে বাঘের পেটে না পাঠিয়ে, তাকে শীতের রাতে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠমগ্ন করে শাস্তি দিয়ে এবং তার বহুমূল্য পাম্পশু ও ওভারকোট গলাবন্ধ ও টুপি ভিজিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র দর্জিপাড়ার বাবুটিকে নিয়ে একটা হাস্যকর অসঙ্গতি সৃষ্টি করলেন। নতুনদার আচরণকে আমরা যে কোটিতে অপছন্দ করতাম, শরৎচন্দ্র সেই কোটিকে অনুভব করে নতুনদাকে নিয়ে যে কৌতুকটা করলেন, তাতে আমরা খুশী হলাম। এইভাবে চরিত্র-চিত্র-ঘটনা-প্রতিবেশের অসঙ্গতিকে কখনও একটু খোঁচা দিয়ে, পীড়ন করে, কখনও সমবেদনা দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে, কখনও ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে, কখনও বা তা নিয়ে বুদ্ধির খেলা খেলে fun, humour satire, wit-এর স্রষ্টারা আমাদের হাসিয়ে তোলেন।

উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টাও ঘটনা-চরিত্র-পরিস্থিতির অসঙ্গতি সৃষ্টির কৌশল

১১. "The ludicrous is where there is the same contradiction between the object and our expectation, heightened by some deformity or inconvenience that is by its being contrary to what is customary or desirable" : W. Hazlitt—Wit and Humour [English Comic Writers]

১২. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব

অবলম্বন করেন। যেমন Raspe-র Baron Munchausen-র একটি কাহিনী। শিকারী Baron একদিন সৈকতে পরিধেয় বস্ত্র খুলে রেখে নির্জন সমুদ্রে স্নান করতে নেমেছিলেন। অতর্কিতে তিনি এক বিবৃতমুখ তিমির দ্বারা আক্রান্ত হন। আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখে, দ্রুত তিনি মাথা-হাঁটু একত্র করে যথাসম্ভব নিজেকে সংকুচিত করে তিমির বিবৃতমুখের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিমির উদরে পৌঁছে Baron পরম আরামে আছেন। সমুদ্রে তিমি উঠছে, পড়ছে ; Baron পা তুলে নাচছেন, পেটের মধ্যে ঘোরাফেরা করছেন। তিমি যখন হাঁ করছে, সেই বিশাল রন্ধ্রপথে যে আলো প্রবেশ করছে তাতে দেখে নিচ্ছেন গতিপথ। তিমি যখন ধরা পড়ল এবং জাহাজে উত্তোলিত হয়ে দ্বিখণ্ডিত হল, Baron উদর থেকে বেরিয়ে উলঙ্গতার লজ্জায় সৈকতে-পরিত্যক্ত পরিধেয় আনবার জন্যে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে সাঁতার দিলেন।[১৩]

Raspe এই কাহিনীটাকে তাঁর গ্রন্থে এমন সরস হাস্যমণ্ডিত করে তুলেছেন, যা পড়ে সকল বয়সের মানুষ হেসে উঠবে। এরও কারণ, হিংস্র তিমির সঙ্গে Baron-এর যে আচরণ তা আমাদের প্রত্যাশা ও সঙ্গতিবোধের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করছে না।

কিন্তু নতুনদার কাহিনীর হাস্যকর অসঙ্গতির সঙ্গে Raspe-র এই কাহিনীর হাস্যকর অসঙ্গতির পার্থক্য কোথায়, তা লক্ষণীয়। পার্থক্য কল্পনার ক্ষেত্রে। নতুনদার গল্পে কল্পনার খেলা নেই। কল্পনার কাজ উদ্ভাবন করা। এই বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির যে পরিচয় Raspe-র এই কাহিনীতে রয়েছে, নতুনদা-গল্পে তার অভাব। নতুনদার কাহিনীর সত্যতার ভূমি আছে। অনুরূপ চরিত্র, এবং তার দুর্দশা আমরা অনেক দেখেছি, না দেখলেও শুনেছি। শরৎচন্দ্রের হাতে এই পরিচিত একটি কাহিনী হাস্যরূপ পেয়েছে। কিন্তু Raspe-র গল্প সম্ভব এবং অসম্ভবের সীমারেখা পেরিয়ে গেছে। এ-কাহিনীর জন্ম লেখকের খেয়ালরসে মগ্ন প্রসন্ন মানসলোকে। আমাদের মধ্যে বিশ্বাস করবার যে শক্তি রয়েছে, তাকেও অতিরঞ্জিত করে Raspe এই কাহিনীর হাস্যময় অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন।

হাস্যরসের সুপরিচিত কোন ধারাতেই কল্পনার খেলা নেই। সকলক্ষেত্রেই

১৩. Raspe—The Travels and surprising adventures of Baron Munchausen—.

হাস্যস্রষ্টা বাস্তব ও পরিচিত সমাজ ও জীবনের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। মধুসূদন দত্ত তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যুবসমাজের বিকারকে আঘাত করে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'সমাজ বিভ্রাট' ও 'কল্কি অবতার'-এ গোঁড়াহিন্দু ও নব্যহিন্দুদের সমাজবিভ্রাটকে বিদ্রূপ করে যে স্যাটায়ার রচনা করেছেন, সে একটা যুগের সত্য ছিল। 'তোতা কাহিনী'তে রবীন্দ্রনাথ উৎকাল্পনিক বহিঃকাঠামোর মধ্যে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তীব্র আঘাত করে যে বিদ্রূপহাসি সৃষ্টি করেছেন, সেই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই আমরা আবাল্য লালিত ও বর্ধিত। রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা-'য় বৈকুণ্ঠবাবুর স্বীয় লেখার প্রতি দুর্বলতা যে করুণ হাস্যসৃষ্টি করেছে 'ঠাকুরদা' গল্পে তার হৃতগৌরবের প্রতি আসক্তি নিয়ে যে কৌতুক অশ্রু ব্যথিত হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গে প্রতিবেশী জীবনে আমরা পরিচিত। 'চিরকুমার সভা'র সভ্যরা কৌমার্যব্রত গ্রহণ করেছে, অথচ কৌমার্যব্রত ভাঙার জন্য তারা পা বাড়িয়ে আছে—এই যে হাস্যকর অসঙ্গতি, যা আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, রবীন্দ্রনাথ তাকেই wit এবং fun-এ সুসজ্জিত করে পরিবেশন করেছেন।

কিন্তু উৎকল্পনার হাসিতে অনুরূপ ঘটে না। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত', 'লুল্লু' প্রভৃতি গ্রন্থ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাপছাড়া', 'সে'; অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চন্ডটি নাটক', 'রাসধারী' রচনা; রাজশেখর বসুর 'রেবতীর পতিলাভ' জাতীয় বহু গল্প; সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল'; প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'; সম্বুদ্ধের 'উদ্ভট শিকার কাহিনী'; Edward Lear-এর 'Nonsense Rhymes'; বিজ্ঞানী H. G. Wells-এর 'The Story of the Late Mr Eluesham'; 'The Plattner Story'-প্রমুখ গল্প; Carroll-এর 'Alice's Adventures in Wanderland' প্রমুখ গ্রন্থ; Raspe-র 'Baron Munchousen'-র শিকার কাহিনী; Eric Knight-এর 'The Flying Yorkshire Man'—এ-জাতীয় স্বদেশ ও বিদেশের রচনায় স্রষ্টার প্রসন্ন খেয়ালী মনের কল্পনা থেকে যে-সব ঘটনা, কাহিনী উদ্ভাবিত হয়েছে, সে-সব আমাদের বিশ্বাস করবার অতীত; কোন সম্ভাব্য সত্যতা পর্যন্ত তাদের নেই। স্রষ্টার অসম্ভবের কল্পনাপ্রিয়তার এই উদ্ভাবনাকে আমাদের জাগরণের বোধবুদ্ধি, আমাদের সংস্কার-ভয়-ভক্তির বিচার দিয়ে বিশ্বাস করতে গেলে নিজেকে পাগল বলে মনে হবে। সকলরকম অভিজ্ঞতার, সমস্ত প্রকার বিশ্বাসের বনিয়াদে

উল্টপাক খাইয়ে দিয়েই উৎকল্পনার হাসি বিকশিত হয়। এই হাস্যজগতের সব-কিছুই যখন উৎকাল্পনিক ও হাস্যমুখর তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অশ্রু-পীড়নের অস্তিত্বও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হয়ে দেখা দিতে পারে না।

কোন মানুষকে ভূতে পেয়েছে—একথা বই-এ পড়লে, বা শুনলে আমাদের হাসি পায় না। তার কারণ, ভূতের বাস্তব সত্যতা থাক্ আর না থাক, আমাদের মনে ভূতের সম্ভাব্য সত্যতা রয়েছে। ভূতের অস্তিত্ব একটা স্বাভাবিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে ; আবাল্য সংস্কারের রূপ লাভ করেছে। ভূতের গল্পের রসস্রষ্টা ভূত সম্বন্ধে পাঠকমনের এই সংস্কার ও বিশ্বাসকে জাগ্রত করে ভৌতিক গল্পের রস উদ্রিক্ত করেন। কিন্তু যখন ত্রৈলোক্যনাথের বইয়ে পড়ি—দিল্লীর আমীর শেখ ভূতের তেলের জন্য শিশি হাতে ভূত ধরতে বেরিয়েছে, এবং ভূত ধরে কলুর ঘানিতে পিষে এক শিশি তেল বা'র করে ভূতকে ছেড়ে দিয়েছে,—তখন উদ্ভাবন শক্তিতে এবং কল্পনার এই উদ্ভট মৌলিকতায় ভূত সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও স্বাভাবিক সঙ্গতিবোধ সহাস্য বিচলিত হয়। ডমরুধরের আধখানা শরীরের সঙ্গে একটা গাভীর অর্ধাংশ এক করে, এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে জুড়ে ত্রৈলোক্যনাথের ভিখু ডাক্তার তাকে দিয়ে চাষ করিয়ে নিচ্ছে এবং চঞ্চলার বাবা রোজ সকালে দু সের ক'রে দুধ দুইয়ে নিচ্ছে—এই কল্পনা আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাসশক্তিকে ছাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত হাস্যে রূপ পেয়েছে। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা এইভাবে তাঁর প্রসন্ন স্ফূর্তিবাজ মনের বেপরোয়া কল্পনার সাহায্যে মানুষ-দেবতা, ভূতপ্রেত, সমাজকথা-ইতিহাস কথা-রূপকথা-পুরাণ কথাকে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্যে সংমিশ্রিত করে এক অদ্ভুত অবয়ব দান করেন। সেই উদ্ভট দেহকান্তি দেখে আমরা আমাদের ধীর গম্ভীর পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের স্বাভাবিক সংগতিবোধ ভুলে গিয়ে উচ্চহাসি হেসে উঠি। Humour, satire, wit বা fun-এর সঙ্গে উৎকল্পনার হাস্যরসের পার্থক্য তাই মৌলিক।

উৎকল্পনার এই হাস্যসৃষ্টি এবং হাস্যপ্রীতির মনোবিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তি রয়েছে। এর আন্তরপ্রেরণা (subjective stimulus) লক্ষণীয়। সমাজভুক্ত যে মানুষ সে প্রতিনিয়ত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানান বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। এই বৈষম্যগুলো থেকে তার মনে সূক্ষ্মস্থূল বিচিত্র আঘাত এসে জড় হচ্ছে। হাসি সৃষ্টি করতে গিয়ে স্রষ্টা একে এড়াতে পারেন না বলেই সকল দেশের সাহিত্যে humour, wit, satire, fun অশ্রুদাহ-আঘাত থেকে মুক্ত

হতে পারেনি। কিন্তু সামাজিক সত্য এই যে সৃষ্টির উষালগ্ন থেকে এই বৈষম্য-দূরীকরণে মানুষের সংগ্রাম নিরন্তর চলে এসেছে। বহিঃশক্তি ও সামাজিক শক্তির বশ হযে জীবনটাকে সে অন্ধসংস্কার ও বিশ্বাসের দাসত্বে, ভূমিদাসত্বে, মজুরীদাসত্বে ও নানান দাসত্বের চাকায় বাঁধতে বাধ্য হয়েছে সত্য, কিন্তু মুক্তির জন্য বিদ্রোহও করে এসেছে যুগে যুগে। ১৬ ঘণ্টা কাজের বিরুদ্ধে একদিন পৃথিবীজুড়ে তার যে সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল তার অবকাশের দাবী—অবকাশের ক্ষণে সে তার সংগুপ্ত প্রসন্ন উচ্ছল মনটাকে মুক্তি দেবে। কিন্তু কাগজে কলমে সে অবকাশকে ছিনিয়ে আনলেও জীবনে সে মজুরিদাসত্বের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা সংগ্রহ করতে অবকাশকে বিকিয়ে দিতে হয়েছে। সুতরাং হাসতে গিয়ে এই বৈষম্যে হয় সে কেঁদেছে, না হয় আঘাত করেছে, পীড়ন করেছে এই বৈষম্যকে। সাহিত্যে তার রূপাবয়ব হয়েছে সূক্ষ্মস্থূল, রক্তাক্ত-সজল। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টার পক্ষেও সামাজিক জীব হিসেবে এই সত্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু জীবনে মার খেয়েও একশ্রেণীর মানুষ যেমন সংগ্রাম বিমুখ হয়ে পড়েনি, হতাশার শিকার হয়নি, অনুরূপ জীবনীশক্তির ওপর তীব্র বিশ্বাস থাকার দরুণ এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী হ্যাঁ-অর্থক হওয়ার ফলে উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা এত বৈষম্যের মধ্যেও, এত অশ্রু-যন্ত্রণার মধ্যেও প্রসন্ন হাসির আনন্দসৃষ্টির আন্তরপ্রেরণা লাভ করেছে।

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির আন্তরপ্রেরণার সন্ধানে আরেকটি বিশেষ দিকও স্মর্তব্য। এই আন্তরপ্রেরণার পশ্চাতে স্রষ্টা ও পাঠকমনের এক গোপন লালিত বাসনা কাজ করে চলেছে। সমাজভুক্ত যে মানুষ তাকে আমাদের এই সমাজ ও সংসারের স্বাভাবিকতা মেনে চলতে হয়। কিন্তু সে যেমন স্বাভাবিকতা মেনে চলে, আবার স্বাভাবিকতার কেন্দ্রচ্যুত নানারকম অ-স্বাভাবিক কল্পনা, উদ্ভট নানারকম চিন্তাভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই আকর্ষণ স্বভাবেরই একটা দিক। স্বভাব যত নিয়মের আনুগত্য স্বীকার করে চলে, অনিয়মের প্রতি তার কৌতূহল তত বর্ধিত হয়। সঙ্গতির বাঁধা পথে চলাটাই অসঙ্গতির প্রতি আকর্ষণের কারণ। অথচ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সমাজের ভয়ে, লোকলজ্জায় স্বাভাবিকতার কেন্দ্রচ্যুত হতে পারে না। যদি কখনও বিচ্যুত হয় সেখানে সে পাগল বলে অভিহিত ; নচেৎ সে স্বতন্ত্র এক জগৎবিহারী। ইংরেজ কবি Blake সম্বন্ধে শোনা যায়—একদিন কবির বন্ধু কবি ও কবিপত্নীকে বিবসন

অবস্থায় Paradise Lost পড়তে দেখে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন, Blake হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ডেকে বললেন, 'ভেতরে এস, সংকোচের কি আছে—আমরা দু'জন আদম এবং ঈভ।' Blake-এর আচরণ ব্যবহারিক জগতে অ-স্বাভাবিক, উৎ-কেন্দ্রিক। ও-দেশে Blake-কে Eccentric বলা হয়। Eccentric কথাটার বিশ্লেষণ করলেও দাঁড়ায় Ek. out of Kenton. Centre.

Blake-এর আচরণ কেন্দ্র বা স্বাভাবিকতার বহির্ভূত। Blake যদি কবি না হতেন, তাঁর আচরণকে মাথা-পাগলামো বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত। কিন্তু কবি Blake-এর eccentricity এক অ-সাধারণ কবিরসজ্ঞের পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছে। মুগ্ধস্মিত হাস্যে বিস্ময় জাগে মনে। কবির জীবনের কোন সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে পাঠকমনে সহানুভূতিও সঞ্চারিত হতে পারে।

দৈনন্দিন জীবনে এই উৎকেন্দ্রিকতা-প্রিয়তাকে সামাজিক মানুষ প্রতিমুহূর্তে অবদমিত করে চলে বলেই বোধহয়, প্রত্যেক মানুষ কখনও না কখনও স্বপ্নে উৎকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। স্বপ্নে দেখি রাস্তা দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ পথটা নদী হয়ে গেল ; গোরুটা ঘাস খেতে খেতে মুখ তুলে আমাকে দেখে মুচকি হাসল ; চলতে চলতে যখন আর পারছি না, তখন অনায়াস সহজতায় উড়ে চললাম , শরীরটা গাড়ির চাকায় দু'টুকরো হয়ে গেলেও বেঁচে উঠলাম ; বাঘের পেটে ঢুকেও মৃত্যু হল না। জাগরণের বুদ্ধি দিয়ে যখন এই স্বপ্নের ঘটনা-কাহিনী পর্যালোচনা করি, তখন তা চূড়ান্তভাবে অসঙ্গত—Nonsense। অথচ স্বপ্নলোকে এরা তো Nonsense বোধ হয়নি। তার কারণ এ-জগৎটা তখন ছিল স্বতন্ত্র একটা সত্যজগৎ, স্বপ্নলোকের বুদ্ধিতেই তখন তাকে বিচার করেছি। তার স্বকীয় কারিগরি, স্বতন্ত্র সুর, লয় ছিল। সুতরাং অসঙ্গত, উৎ-কাল্পনিক কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু জাগ্রত বুদ্ধির ভূমিতে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের এই জগতের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি, জাগরণের বিশ্বাস-নিষ্ঠা নিয়মশৃঙ্খলার বিচারে স্বপ্ন-জগতের সবকিছু অসঙ্গতিপূর্ণ ও হাস্যময় হয়ে ওঠে। উৎকল্পনার হাস্য-স্রষ্টা মনের এই অবদমিত বাসনাকে গল্পে ছন্দে যখন রূপায়িত করেন এবং তাকে সচেতন বুদ্ধির ব্যূহরূঢ় জগৎটার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন তখনই আমাদের বিশ্বাস, বিচারশক্তির নিকট এ-জগৎটা এক হাস্যকর অসঙ্গতির রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেখা দেয়। আমরা অসম্ভব কল্পনার আনন্দে আর এক মুক্তি লাভ করি।

উৎকল্পনার হাস্যের আন্তরপ্রেরণার সঙ্গে সঙ্গে বহিঃপ্রেরণা (Objective stimulus) বিচার্য। Humour, satire, wit, fun-এর বহিঃপ্রেরণার প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে যে জগৎ ও জীবনের বাধা বৈষম্য, ব্যক্তিমানুষ ও শ্রেণীমানুষের আচার আচরণের চ্যুতি-বিচ্যুতি বিকার-বিকৃতি সম্বন্ধে স্রষ্টার সচেতন আসক্তিই এ-সব ক্ষেত্রে বহিঃপ্রেরণা হয়ে কাজ করে। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টাও সামাজিক মানুষ। তাঁর মন পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। কারণ বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ মনের কোন অস্তিত্ব নেই। "Social being determines consciousness." শিল্পীর সৃজনী প্রতিভার উৎস বাস্তব জগৎ। কারণ সমস্ত কাল্পনিক সৃষ্টি শিল্পীরই। যে জগতের প্রতি তাঁর ভালবাসা, ঘৃণা—সে জগৎটাই তাঁর শিল্পের উপাদান। স্বপ্ন অবচেতন মনের সৃষ্টি। কিন্তু তার মূল রয়েছে জগৎ ও জীবনচারী সচেতন মনের মধ্যেই নিবদ্ধ। যে কোনো মনঃসমীক্ষকই নিতান্ত অর্থহীন অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে একান্ত বস্তুমূলক সত্যের সন্ধান পাবেন। উৎকল্পনার হাস্যরস তাই বাস্তব ও পরিচিত জগৎ ও জীবনের মধ্যে নিবিষ্টমূল। দৈনন্দিন জীবনে চলতে গিয়ে স্রষ্টা আকাশ মাঠঘাট অরণ্য দেখছেন। মরুভূমির গর্ভ থেকে একদা সমৃদ্ধনগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের কাহিনী পড়ছেন। মনে কল্পনা জাগছে : আরব্য উপন্যাসের বিস্ময়কর কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁর মনে বিস্ময় আনন্দ নানা জিজ্ঞাসা জাগছে। তারই সঙ্গে আবাল্য বহু সংস্কার কাজ করছে। সহযোগী হয়ে রয়েছে বিচিত্র কৌতূহল, বহুধা প্রশ্ন। যেমন, পৃথিবীর বাইরে কি আছে, মানুষের জন্ম কি, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পর কোথায় সে যায়, আমাদের অতীত যুগ কেমন ছিল ও ভবিষ্যৎ কেমন হবে, মানুষে মানুষে বিভেদ কেন, সামাজিক ও অ-মানবীয় নানা অত্যাচারে মানুষ পীড়িত কেন ইত্যাদি। এর সঙ্গে রয়েছে বহু অদ্ভুত ইচ্ছা—পাখির মত আকাশে উড়তে পারার আকাঙ্ক্ষা, অতীত যুগে ভ্রমণের বাসনা, সমুদ্রের তলদেশ দেখবার আগ্রহ, মাছের মত সাঁতার কাটতে পারার কৌতূহল, বার্ধক্যকে কোন কৌশলে তারুণ্যে ফিরিয়ে আনবার অভীপ্সা। অধিকন্তু রয়েছে আর্থসামাজিক নানা কারণে যে বঞ্চনা দেখা দেয়, তাকে অদ্ভুত পন্থায় পূর্ণ দেখবার বাসনা। দারিদ্র্য যখন কিছুতে দূর হচ্ছে না, তখন উদ্ভটপন্থায় তাকে দূর করবার কল্পনা আসে। বহু চেষ্টা করেও যখন কণ্ঠে সুর এল না, তখনই ইচ্ছা জাগে কোন এক ভূতের রাজার বরে যদি সুর-তাল-লয়ে জগৎজোড়া খ্যাতিলাভ ঘটে! অন্যদিকে আবার বহু

প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের মনে ভীড় করে আছে। হিংস্র আরণ্যক জন্তু বা জলজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত মানুষের কোন দৃশ্য তিনি দেখেছেন, বা শুনেছেন, সামাজিক অত্যাচার পীড়িত কোন মানুষের কাহিনী, মৃত্যু কবলিত কোন করুণ ঘটনা হয়তো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, না করলেও এমন বহু ঘটনা দৃশ্যের কথা শুনেছেন, পড়েছেন এবং মনে মনে এ-সব ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছে। এই সবই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির বহিঃপ্রেরণা রূপে কাজ করে। উৎকল্পনার হাস্যলেখক এইভাবে বস্তুজগতের সঙ্গে একান্ত সম্পর্কিত মন নিয়েই রচনায় প্রয়াসী হন।

কিন্তু বস্তুজগতের উপাদানকে আশ্রয় করেই মনের স্বতন্ত্র হয়ে ওঠার একটা ক্ষমতা রয়েছে। সেইজন্যই সৃষ্টির ক্ষেত্রে এত বৈচিত্র্য। বস্তুজগৎ থেকে উদ্ভূত হয়ে মন বা কল্পনা একটা গতিশীল শক্তি হয়ে ওঠে এবং তারই জোরে সক্রিয় হয়ে বস্তুজগৎকে পরিবর্তিত করে। মন বা কল্পনার এই শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রেই হাস্যরসের অন্যান্য ধারার সঙ্গে উৎকল্পনার এই হাস্যের পার্থক্য। পরিচিত জগৎ ও জীবনের, ব্যক্তিমানুষ ও শ্রেণীমানুষের আচার আচরণ, ত্রুটি বিচ্যুতি দেখে তাকে ব্যঙ্গ আঘাত করে, হেসে হাসিয়ে হাস্যরসের পরিচিত ধারাগুলি ক্ষান্ত। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যরস-স্রষ্টা কল্পনার শক্তির জোরে এই সবের মধ্যে অদেখা একটা বিশেষ ও স্বতন্ত্র রূপের আবিষ্কার ক'রে আমাদের হাসিয়ে তোলেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ডমরুধর যে অনায়াসেই বাঘের পেটে ঢুকে জীর্ণ না হয়ে কৌশলে বেরিয়ে আসতে পারেন; মিত্তিরজা যে স্বর্গে গিয়ে যম দেবতাকে বোকা বানিয়ে জগতের সমস্ত পাপীদের মুক্ত করতে পারেন; রাজশেখর বসুর দুই বৃদ্ধ যে ধুস্তুরি ফলের রসে সিক্ত ছোলা খেয়ে বার্ধক্যকে তারুণ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন, মার্কটোয়েনের কানেক্টিকাট প্রদেশের ইয়াংকি যে উনিশ শতককে ষষ্ঠ শতকের রাজা আর্থারের রাজত্বে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে আর্থারের মহামন্ত্রী হয়ে বসতে পারে—স্রষ্টার এইসব অঘটনঘটনক্ষমতা আমাদেরই অন্তরলালিত এবং জীবনযুদ্ধ থেকেই উদ্রিক্ত বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার শিল্পরূপায়ণ।

এই হাস্যসৃষ্টির সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করে শিল্পিমনের নিরাসক্ত প্রসন্ন স্বভাব। Humour-wit-satire-fun-এর হাস্যস্রষ্টা জগৎ ও জীবনকে নিরাসক্ত হয়ে দেখতে পারেন না। আসক্তি তাঁদের সচেতন ও হিসেবী করে তোলে।

কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা পুরাণের উপরিচর বসুর ইন্দ্রপ্রদত্ত রথের মত এক উপরিচর মনের অধিকারী। এই-মন নিয়ে খুশীমত তিনি সমাজ ও জীবনের উপরিভাগে উঠে বিচরণ করেন এবং উপরিচর মনটার নিরাসক্তি ও খেয়ালের প্রসন্ন হাসি সামাজিক মনটার ওপর বিকীর্ণ করে দেন। চাঁদ সম্পর্কে তাঁর আবাল্য কৌতূহলী মন সেই কারণেই কালো বার্নিশ করা এক চাঁদের কল্পনা করতে পেরেছে। সেরখানেক ওজনের এক শিকড় চাঁদের গায়ে গজিয়ে দিয়ে তার থেকে তোলাখানেক কেটে নেবার অসম্ভব কল্পনা সম্ভব হয়েছে।[১৪] আলনা-সাজানো শাড়িগুলো উনুনে বিছিয়ে দিয়ে, উনুনের হাঁড়িগুলো আলনায় সযত্নে তুলে রাখার বেপরোয়া কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এই কারণেই।[১৫] উনিশ হাত লম্বা স্ত্রীর সাড়ে তিন হাত স্বামী কল্পনা এবং অবশেষে উনিশ হাত স্ত্রীকে সোয়া-তিন হাতে পর্যবসিত করার উদ্ভট কৌশলের পশ্চাতে[১৬] এই তীব্র নিরাসক্ত খেয়ালী মনই কাজ করেছে।

উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা সামাজিক মানুষ বলেই তাঁর রচনায় পরিচিত জগৎটার কথা, সমাজ রাজনীতি ধর্মনীতির কথা এসে পড়তে পারে। কিন্তু কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার হাস্যের মধ্যে তা সামঞ্জস্যময় হয়ে উৎকল্পনার হাসিকেই একটা নির্ভার রসপরিণতি দান করে। শিল্পীর এই সামাজিক পরিচিতির পথেই, এবং পরিচিত জগতের সঙ্গে উৎকল্পনার জগতের সর্বব্যাপী গতাগতির একটা সহজ সেতু থাকার জন্যই কোন কোন চিত্র-চরিত্র ঘটনা দেখে লেখক কখনও ব্যথিত হন, ক্ষুব্ধ হন ; তাঁর মধ্যে ন্যায়নীতির স্বাভাবিক জগতের যে মানুষটি রয়েছে, সে জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখনই তিনি একটু বিদ্রূপ করেন, ইঙ্গিত করে বসেন। কিন্তু একদিকে কল্পনার হাস্যকর উদ্ভটতা, আরেকদিকে পূর্বোক্ত উপরিচর মনোভাব—এই দুয়ের মধ্যে আঘাত-ব্যঙ্গ-পীড়ন স্বতন্ত্র গৌরবে কোথাও আবিষ্কৃত হতে পারে না। এরা গল্পের উৎকাল্পনিকতাকে ও বেপরোয়া হাসিকে প্রভাবিত না করে বরং তারই মধ্যে জারিত হয়ে উৎকল্পনার হাসিকেই শিল্প-গুণান্বিত করে তোলে। এ অনেকটা সেই চমক লাগানো বাণিজ্যিক সূত্রের মত—pure milk contains 80% water. এই জলীয় ভাগ যেমন দুধেরই

১৪. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—কঙ্কাবতী

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—খাপছাড়া

১৬. রাজশেখর বসু—রেবতীর পতিলাভ (ধুস্তুরী মায়া)

অঙ্গ হয়ে পড়েছে, শক্তিশালী লেখকের হাতে উৎকল্পনার হাস্যের, ব্যঙ্গ, আঘাত পীড়নের অনুরূপ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কই ঘটে থাকে। যেমন ঘটেছে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনায়, Lewis Carroll-এর রচনায়, রাজশেখর বসুর গল্পে। ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত হাস্য-রচনায়ই সমাজধর্মসংস্কারের প্রতি মৃদু ইঙ্গিত ও কটাক্ষ ইতস্তত বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। Carroll-এর বেপরোয়া কল্পনার হাস্যস্ফীত রচনায় সামাজিক মানুষ Carroll-এর পরিচয় উপস্থিত। কিন্তু কল্পনার হাস্যকর উদ্ভাবনার মধ্যে সে-সব মিশ্রিত হয়ে গল্পে এমন একটা স্বাদ এনে দিয়েছে, যার ফলে একদিকে পাঠকমনের পরিণত-বয়স্কতা মহার্ঘ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, অপরদিকে পাঠকমনের মুক্তপক্ষ যে শৈশব-কৈশোর-মনস্কতা, তা কল্পনার অসম্ভবতা দেখে অবাধ হাস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই সকল স্তরের পাঠক-শ্রোতার রসবোধে উৎকল্পনার হাস্যরস উপভোগ্যতার সাধারণ্য লাভ করে। রাজশেখর বসুর শিল্পিমনের স্বভাবধর্ম যে বুদ্ধিশাসিত কৌতুকপ্রবণতা, লেখকের উৎকল্পনার হাস্যে তা সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়ে গল্পের চতুর্দিকে একটা প্রাঞ্জলবুদ্ধির সহাস্য লাবণ্য ফুটিয়ে তুলেছে। এই লাবণ্য উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্টির অঙ্গসজ্জার কাজ করেছে। এইভাবে উৎকল্পনার হাসি সামঞ্জস্যের হাসি হয়ে অশ্রু-আঘাত-পীড়ন-দাহমুক্ত প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাস্যের ফলশ্রুতি রচনা করে চলে।

উৎকল্পনার হাসি কিভাবে যুগপৎ প্রসন্ন ও উচ্ছ্বসিত হচ্ছে তা দেখা যেতে পারে।

উৎকল্পনার যে হাস্যজগৎটা, তার সবকিছু যখন অসম্ভব, অবিশ্বাস্য তখন এ জগতে অশ্রু-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পীড়নের ব্যথিত বিদ্ধ করবার ক্ষমতাটাও অসম্ভব। সেইজন্যই উৎকল্পনার হাসি প্রসন্ন। এই যে প্রসন্ন হাসি, এর উপভোগে এ-পক্ষ, ও-পক্ষ নেই—শ্রেণী-বৈষম্য নেই। পাঠক বা শ্রোতা যখন এই উদ্ভট জগৎটার কথা পড়েন বা শোনেন তাদের মন কল্পনার এতবড় হাস্যকর অসঙ্গতিতে এমন পরিপূর্ণ থাকে যে বিপরীত কোন অনুভূতি সেখানে যেমন উদ্রিক্ত হতে পারে না, কল্পনার অসঙ্গতিকে বাধা দেবার মত কোন ভারত্ব বা প্রতিবন্ধকতাও সেখানে স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ফলে শিরা থেকে শিরাসংযুক্ত পেশীতে এই অসঙ্গতিবোধ অনাবিল গতিতে সঞ্চারিত হয়ে হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে।

এই প্রসন্ন হাসিকে উচ্ছ্বসিত করতে গিয়ে স্রষ্টা একটা বড় কৌশলের আশ্রয়

গ্রহণ করেন। এই কৌশল তিনি যত নিখুঁত আয়ত্ত করেন, উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসি তত বেশি উতরোল হয়। এই নৈপুণ্য হল অবিশ্বাস্য কাহিনীটাকে বিশ্বাস্য করবার একটা কৃত্রিম চেষ্টার কৌশল। হাস্যস্রষ্টা তাঁর উদ্ভাবিত কাহিনীকে পরিবেশন করতে গিয়ে ছদ্ম বিশ্বাসের একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেন। যেমন Baron-এর শিকার কাহিনীতে Raspe সমুদ্র স্নানের সময় হিংস্র তিমির আক্রমণের একটা বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, এবং Baron-এর হাঁটু-মাথা এক করে তিমির মুখবিবরে প্রবেশ ব্যতীত যে অন্যপথ ছিল না, তা পাঠকমাত্রেই বিশ্বাস করবেন।—রাজশেখর বসু 'রেবতীর পতিলাভ' গল্পে রেবতীর বিবাহ-সমস্যার বিশ্বাস্য-বাস্তব ঘটনাটা সৃষ্টি করলেন। ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যেকেই পরিচিত জগৎটার প্রেমপ্রীতি মিলন অশ্রুর কথা এনে, পরিচিত ঘরবাড়ি লোকজনের নিখুঁত পরিচয় দান করে ইতিহাস কথা ও ভূগোল কথা উপস্থাপিত করে শ্রোতা ও পাঠককে যেন বলতে চান—"দেখ, যা বলতে যাচ্ছি তার কিছুই মিথ্যে নয়।" Raspe তো তাঁর গ্রন্থের আরম্ভেই গল্পের বিশ্বাস্যতা প্রমাণ করবার জন্য পৃথিবীখ্যাত তিনজন ভ্রমণকারীর সার্টিফিকেট জুড়ে দিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রমাণ সঙ্গে বহন করে বেড়াতেন। এইভাবে একটা বিশ্বাস্য পরিবেশের সৃষ্টি করে যখন দেখেন শ্রোতার মন গল্পটা বিশ্বাস করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখনই স্রষ্টা নিপুণ চমক দিয়ে কল্পনার হাস্যকর অবিশ্বাসটা বিশ্বাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন। অ-বিশ্বাসের আঘাতে বিশ্বাসের ছদ্মবেশটা খুলে পড়ার ফলে একদিকে পাঠক ও শ্রোতৃমন তীব্র অসঙ্গতিতে ভরে ওঠে, অপরদিকে অবিশ্বাস্য উদ্ভট কল্পনার অতবড় মিনারটাকে বিশ্বাসের পরিচিতলোকের এতটুকু আবরণখানা দিয়ে আচ্ছাদিত করবার চেষ্টা দেখে পাঠকের সঙ্গতিবোধ আরও মথিত হয়ে হাস্যকে বেপরোয়া উচ্ছ্বসিত করে তোলে। আর সেখানেই লেখক কৌশল সৃষ্টির সাফল্যে আনন্দিত হন। কারণ সকল দিক থেকে অসঙ্গতি সৃষ্টি করে পাঠকের মনে বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র জাগ্রত হতে না দেওয়াই উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টার লক্ষ্য। বিশ্বাসের পথে অসম্ভবের হাসি উচ্ছ্বসিত হতে পারে না। অলৌকিক দৈবী গল্পে, রূপকথার গল্পে, কথাসরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাসের গল্পে কল্পনার অসম্ভবতা থাকলেও তারা যে কোথাও হাস্যসৃষ্টি করে না, তার কারণ বিশ্বাসের মাটিতে তারা গ্রথিত। সে-কথা পরে আলোচনা করা যাবে।

এইভাবে উৎ-কল্পনার হাস্যরসের গল্পে একই সঙ্গে দুইদিক থেকে হাস্যকর অসঙ্গতি জাগ্রত করে দিয়ে লেখক হাসিকে যুগপৎ প্রসন্ন ও অনিয়ন্ত্রিত করে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার চতুর্মুখের ব্যাখ্যাস লিখেছেন —

একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে ওঠে উচ্ছ্বসিয়া।[১৭]

বিধাতা তাঁর চতুর্মুখের চতুর্থ মুখে উৎকল্পনার উচ্ছ্বসিত হাসিই হাসেন। বিধাতার চতুর্থমুখের পাগলামোর বেড়াভাঙা হাসির বিকীর্ণ উপাদান সংগ্রহ করেই মর্ত্যের দ্বিতীয় বিধাতারা উৎকল্পনার এই হাস্যময় জগৎটা রচনা করে ডাক দিয়েছেন—

"আয়রে পাগল আবোল তাবোল
মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।
আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন সুদূর।
আয় খ্যাপামন ঘুচিয়ে বাঁধন
জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্
আয় বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া
নিয়ম হারা হিসাব হীন।

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—খাপছাড়া [উৎসর্গপত্র]

আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল
মাতবি মাতাল রঙ্গেতে
আয়রে তবে ভুলের ভবে
অসম্ভবের ছন্দেতে।[১৮]

যুগপৎ প্রসন্ন ও উচ্ছ্বসিত হাস্যসৃষ্টির ধারা ওদেশে উনিশ শতক থেকেই সাহিত্যরসিকদের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। বর্তমানকালে এই ধারার রসমূল্যের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছেন G. K. Chesterton তাঁর 'A Defence of Nonsense' প্রবন্ধে।[১৯] রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে' গ্রন্থে উৎকল্পনার হাস্যরসের শিল্পরূপ ব্যাখ্যা করে এই ধারার শিল্পোৎকর্ষ দেখিয়েছেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য সমালোচকগণের আলোচনায় এই রসধারা আদৃত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে প্রমথনাথ বিশীর আলোচনা, সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' ও অন্যান্য 'আজগুবি চালের' রচনা নিয়ে কবি-সমালোচক অজিত দত্তের 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে উচ্ছ্বসিত আলোচনা, সাহিত্যিক সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কথা কোবিদ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'সে' গ্রন্থের খেয়াল রসসৃষ্টির মূল্যায়ন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুচরিত' গ্রন্থের পাঠ্যতালিকাভুক্তি, ১৯৬৯-এ সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' চিত্র নির্মাণ ও তার জনাদর, উৎকল্পনার হাস্যরসের প্রতি বর্তমানকালের আগ্রহকেই প্রমাণিত করছে।

এই অবিমিশ্র হাস্যরসের প্রতি পাঠক সমাজের আগ্রহের সবচেয়ে বড় কারণ হল এর জীবনবাদী আবেদন ও আশাবাদ। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বাস্তববাদের নামে স্বভাববাদের প্রতি উল্লেখ্য ঝোঁক দেখা দিয়েছে, মনস্তাত্ত্বিকতার নামে যৌনবিকৃতির রচনা চলছে, হতাশাবাদ, মূল্যবোধহীনতা, শূন্যতাবাদ, অপরাধপ্রবণতা নিয়ে লেখা রাশীকৃত হচ্ছে, জীবনের প্রতি ও জীবনের সংগ্রামী শক্তির প্রতি নঞ্‌র্থক দৃষ্টি লেখায় সচেতন স্পষ্টতায় স্থান পাচ্ছে। এই পটভূমিতে উৎকল্পনার হাস্যরসের জীবনের প্রতি ভালবাসা ও মূল্যবোধকে আধুনিক পাঠক অভ্যর্থনা জ নাবেনই।

১৮. সুকুমার রায়—আবোল তাবোল

১৯. A Book of English Essay—Edited by W. E. Williams (a Pelican original)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে উৎকল্পনার হাস্যরস, জীবনবিমুখ ; রূঢ় কঠিন জীবন থেকে খেয়ালী কল্পনার ও আজগুবি চরিত্র-ঘটনা সৃষ্টির জগতে উড্ডয়ন হল পলায়ন বৃত্তি। কিন্তু জীবন ও সমাজের পজিটিভ্ ভ্যালুজগুলি যাঁদের দৃষ্টিপথে আসে না, তাঁরাই পলায়নী দৃষ্টির লেখক। জীবনের সংগ্রাম ক্ষমতার ওপর, সকল রকম বাধাবন্ধ অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার শক্তির ওপর যাঁরা বিশ্বাস রাখেন না, যাঁরা হতাশাজনিত বিকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, আত্মবিক্রয়-প্রবণতার শিকারে পরিণত হন তাঁরাই বাস্তববিরোধী পলাতক। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টার উদ্দেশ্য যেখানে জীবনের আনন্দের সন্ধান দেওয়া, যেখানে তিনি বিশ্বাস করেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার যন্ত্রণা জীবনের আনন্দ-সন্ধানকে বিনষ্ট করতে পারে না, যেখানে তিনি জীবন সংগ্রামে মার খেয়ে খেয়েও হার মানতে চান না, হতাশার শিকার হতে চান না, সেখানেই তিনি জীবনের 'পজিটিভ ভ্যালুজ'-এ বিশ্বাসী, তিনিই জীবনবাদী। বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির চাম্পিয়ান ত্রৈলোক্য-নাথের ব্যক্তিজীবনে এই সত্যের পরিচয় পেয়েছি। দারিদ্র্যের পেষণে, সমাজ-প্রকৃতি-মানুষের নিকট অবিচার ও অত্যাচারে তিনি তিক্ত, ক্ষুব্ধ। কিন্তু হাস্য-স্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ জীবনী-শক্তিকে উচ্চহাস্যে প্রচার করেছেন। পাঠক যখন রূঢ় কঠিন সমস্যাক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনটার দুঃখকষ্ট চিন্তার মধ্যে খেয়ালী কল্পনার এই হাসির জগৎটা দেখতে পান, বয়সের সীমা, সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা বিস্মৃত হয়ে হেসে ওঠেন। নির্মম ও জটিল পারিপার্শ্বিকতা জীবনের সরসতাকে যে নিঃশেষ করে দিতে পারে নি, মুখের হাসি মুছে দিতে পারে নি, এই বোধে মানসিক অবসাদ দূর হয়, একটা মুক্তপক্ষ নির্ভার স্বাদুতায়, ক্লান্তিহর হাস্যে জীবনটার মূল্য অনুভূত হয়। এখানেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি জীবনরসের সন্ধান দিয়ে সামাজিক মানুষের জীবনে আদৃত হয়েছে তথা শিল্প কর্ম হয়ে উঠেছে। এবং উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা "অলস-কল্পনাবিলাসী"—এই জাতীয় সমালোচনা থেকে মুক্ত হয়ে জীবনবাদী শিল্পীরূপে পরিগণিত হয়েছেন।

বস্তুত উৎকল্পনার হাসি একটা বিদ্রোহ। জীবনটার প্রতি আমাদের গুরু-গম্ভীর মনোভাবের, একদেশদর্শী দৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; জীবন সম্বন্ধে বদ্ধমূল ট্রাজিক ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হাস্যরসের পরিচিত ধারাগুলি হাসির ছদ্মবেশে পাঠকের "grave spirit'কেই যে উত্তেজিত করে চলছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হাস্যরসের মহার্ঘ্য সম্পদের রসাস্বাদনে শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ। উৎকল্পনার হাসি হতাশাবাদ, নৈরাশ্যবাদ এবং সাহিত্যিক রুগ্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। জীবনের ভারাক্রান্তির বিরুদ্ধে জীবনীশক্তির জেহাদ ঘোষণা রয়েছে এই প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাস্যরসের ধারাটিতে। প্রথানুসৃতি ও বাঁধাপথে পরিক্রমার বিরুদ্ধে উচ্ছল মুক্তমনের আনন্দ সন্ধানের বিদ্রোহ উৎকল্পনার এই হাসি। এই কারণেই আধুনিককালের জীবনসচেতন পাঠক ও সমালোচকের নিকট এই হাস্যরসধারাটি জনাদর অর্জন করেছে। এবং এই জনপ্রিয়তার সূত্রেই উৎকল্পনার হাস্যরসধারা বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়নের দাবী রাখে।

একটা জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক। অলৌকিক কাহিনী বা রূপকথা, উপকথা বা ছড়া—সমস্তই সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখাহীন কল্পনার সৃষ্টি। দেবতা মানুষ, ভূতপ্রেত, পশুপাখি, সমাজকথা, ইতিহাসকথা—একাকার করে এই কথা-কাহিনীর জগৎ গড়ে ওঠে। স্বাভাবিকতার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়ে এ-জগৎও উৎকল্পনার জগৎ। কিন্তু রূপকথা বা অলৌকিক কাহিনী, ছড়া বা উপকথা উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্টি করে না কেন ?

এই জিজ্ঞাসার উত্তর হাস্যরসের এই ধারাটির স্বরূপ বিশ্লেষণে অধিকতর সহায়ক হবে।

অলৌকিক কাহিনী যে হাসি উদ্রেক করে না, তার কারণ কল্পনার অসম্ভবতা দিয়ে হাস্যসৃষ্টি করা অলৌকিক কাহিনী রচয়িতার লক্ষ্য নয়। তাঁর উদ্দেশ্য পাঠকমনে একটি ভক্তিনত বিশ্বাস্য জগৎ রচনা করা। মানুষের মনের গভীরে আবাল্য যে সংস্কার-বিশ্বাস-ভক্তি সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, অস্বাভাবিক ঘটনাচরিত্র উদ্ভাবন করে সেই বিশ্বাস সংস্কারকে যদি জাগিয়ে তোলা যায়, তাহলেই অলৌকিক গল্পের রস ঘনীভূত হয়। বিশ্বাস ও ভক্তি-আস্থার এই ঢলের উপর হাসি দাঁড়াতে পারে না।

অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে কল্পনা ও সৌন্দর্য যেমন স্বীকৃত তারই সঙ্গে ভয়-বিস্ময়ভক্তি এবং সর্বোপরি বিশ্বাস জড়িত। উৎকল্পনার হাসির জগতে কল্পনা ও সৌন্দর্য যেমন উপস্থিত তারই সঙ্গে হাস্যময় অসঙ্গতি এবং অবিশ্বাস জড়িত। ভয় ও বিস্ময়ের অবতারণা এ-জগতে দানা বাঁধতে পারে না। ভয়ের ঘটনাটা হাসিতে বিতাড়িত হয়ে হাল্কা হয়ে অপসৃত হয়। বিস্ময় রয়েছে, কারণ অপ্রত্যাশা ও অ-স্বাভাবিকতা প্রথম অবস্থায় বিস্ময় জাগ্রত করে তোলে। কিন্তু বিস্ময়ের বিহ্বলতা মনে স্থায়ী হবার পূর্বেই উলট্ পাক খেয়ে হাসির উচ্ছ্বাসে তা বিদূরিত হয়। বিশ্বাস হল অলৌকিকতার গ্রানিটস্তর। আমাদের জাগ্রত বাস্তববোধ ও বিজ্ঞানবুদ্ধির নিকট অলৌকিক কাহিনীকে স্রষ্টার খেয়ালী কল্পনার অবিশ্বাস্য, আজগুবী কাহিনী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একে দীর্ঘকাল ধরে মানুষ বিশ্বাস এবং আস্থার প্রণতি দিয়ে এমন সহজে মেনে নিয়েছে যে, তাকে অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব বলে প্রমাণ করতে গেলে, তার মধ্যে অসঙ্গতি বা হাস্যকর

কিছু খুঁজতে গেলে, আমাদের বিশ্বাসী মন যুগপৎ ক্ষুণ্ণ ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আজ বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকার সম্মুখে অলৌকিক গল্প পড়তে বসে আমরা যে বাস্তব অবাস্তবের ভেদরেখাটি ভুলে যাই, তার কারণ, বাস্তববোধ যতই না কেন জাগ্রত হোক, বিজ্ঞানবুদ্ধিতে মন যতই না কেন শুদ্ধ হোক, অলৌকিকতার সঙ্গে আমাদের আবাল্য নানা সংস্কার জড়িত রয়েছে। মানুষের নানারকম সাধারণ বিশ্বাস, আবাল্য ও স্থায়ী নানা রহস্যময় ধারণার মধ্যে আমাদের অলৌকিক চিন্তাগুলি প্রসারিত হতে পারে। কিন্তু উৎকল্পনার হাসির জগতের স্রষ্টা বিশ্বাস বা সংস্কারের বনিয়াদটি ভেঙে দিয়ে হাস্যকর এমন একটি প্রতিবেশ গড়ে তোলেন যেখানে দেবতামানুষ-পাহাড়মাটি-নদনদী-ভূতদৈত্যদানা বাস্তব-অবাস্তবের প্রভেদসীমা ঘুচিয়ে দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু তাদের চলাচলের পথ বিশ্বাসের ও ভক্তি আস্থার পথ নয়, প্রসন্ন হাসির উচ্ছ্বাসের পথ। হাসির এই উচ্ছলতার ওপর ভক্তি বিশ্বাস-সংস্কার দাঁড়াতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ অলৌকিকতা অনেক সময়েই প্রতীকী হয়ে ওঠে। শ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাহিনী শ্রেষ্ঠ প্রতীকী কাহিনী। রবীন্দ্রনাথের কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা গল্পে অলৌকিকতার অনুভূতি সঞ্চারিত। কিন্তু এরা শ্রেষ্ঠ প্রতীকী গল্প। অ্যালান পে র অ-সাধারণ গল্পগুলি প্রতীকী অর্থের দ্যোতনায় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যরসের উৎসমূলে এ-ধরণের কোন গবেষণা নেই। পাঠক যে এই হাসির ভক্ত, সেও কোন প্রতীকী অর্থের জন্য নয় ; কল্পনার পাগলামোর আনন্দের ভক্ত তারা। এই হাস্যরসের জগতে গুহাহীত অর্থ খুঁজতে গেলে, যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে বিশ্বাস করতে গেলে, নিজেকেই উদ্ভটপাগল বলে মনে হবে। না হলেও, উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা তাকে ধমক দিয়ে বলবেন, 'দেখ, সবক্ষেত্রে খোঁচ ধরো না।' ভারহীন মনের আরাম এখানে। এই হাসির মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংস্কার ভয় তর্ক বিতর্ক-ব্যঙ্গকটাক্ষ যতই থাক না কেন শেষপর্যন্ত সবকিছু শিল্পীর অপূর্ব নির্মাণক্ষমতার বলে সহস্র হাস্যকণায় দানা বেঁধে প্রসন্ন আনন্দে ঝলমল করে ওঠে।

কল্পনার অ-সম্ভবতা বা অ-স্বাভাবিকতাকেই নিয়ে শিল্পী কিভাবে অলৌকিক জগৎ রচনা করেন এবং কিপন্থায় উৎকল্পনার হাসির জগৎ রচনা করছেন, উদাহরণ তুলে দেখান যেতে পারে।

॥ মহাভারত ॥

বনপর্বে যুধিষ্ঠির মহাতপা মার্কণ্ডেয় মুনির কাছে পুরাকালের গল্প শুনছেন। মার্কণ্ডেয় বললেন, "একদা প্রলয়কালে আমি নিরাশ্রয় হয়ে সমুদ্রজলে ভাসছিলাম এমন সময় দেখলাম, এক বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিব্য আস্তরণযুক্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন বালক শুয়ে। তার বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন। সেই বালক বললেন, বৎস মার্কণ্ডেয়, তুমি পরিশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের ভিতরে বাস কর—এই বলে তিনি মুখব্যাদন করলেন। আমি তাঁর উদরে প্রবেশ করে দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্র সূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভৃতি সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বৎসরের অধিককাল তাঁর দেহের মধ্যে বিচরণ করে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আমি সেই বরেণ্য দেবের শরণ নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃতমুখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এসে দেখলাম, সেই পীতবাস দ্যুতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তিনি সহাস্যে বললেন, 'মার্কণ্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো?' আমি নবদৃষ্টি লাভ করে মোহমুক্ত হয়ে তাঁর কোমল আরক্ত চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করলাম।"[১]

॥ কথাসরিৎ-সাগর ॥

চতুর্দ্দারিকা নামক পঞ্চম লম্বক-এর ষড়্‌বিংশ তরঙ্গের একটি কাহিনী।[২]

"পূর্বকালে কম্বুক নামে একটি পুরী ছিল। ঐ পুরীতে হরিদত্ত নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার দেবদত্ত নামে এক পুত্র ছিল। হরিদত্ত ধনশালী ছিলেন। পুত্রকে বহু অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইলেন; কিন্তু দেবদত্ত পণ্ডিত হইয়াও কুসঙ্গে মিশিয়া ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িল। যখন জুয়াখেলায় তাহার পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল, তখন লজ্জায় আর গৃহে ফিরিল না। নিঃসম্বলে বাহির হইয়া একাই পথ চলিতে থাকিল। ক্রমে রাত্রি হইলে, সম্মুখে এক দেবমন্দির দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখে, এক

১. 'মহাভারত' (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

২. 'কথাসরিৎ-সাগর,' প্রথম খণ্ড (উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত)

জটাবল্কলধারী সাধু জপ করিতেছেন। এই সাধুর নাম জালপাদ, ইনি প্রত্যহই এখানে আসিয়া জপধ্যানাদি করিয়া থাকেন। দেবদত্ত ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রণামকরত উপবেশন করিল। কিছুক্ষণ পরে সাধুর ধ্যানভঙ্গ হইল, তিনি দৃষ্টিপাত করিয়া দেবদত্তকে দেখিতে পাইলেন।

দেবদত্তকে দেখিয়া আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবদত্ত নিজের ব্যসনজনিত বিপদের কথা জানাইল। দেবদত্তের কাতরতায় জালপাদ সদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি ব্যসন পরিত্যাগ কর। ব্যসনীব্যক্তি কখন দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, তবে আমার কথা মত চল। এই দেখ, আমি বিদ্যাধরদেহ পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি। তুমিও আমার সহিত তপস্যায় মনোনিবেদন কর, ইহাতে শীঘ্রই অভীষ্টপদ লাভ করিতে পারিবে।

এই কথায় দেবদত্তের মন আকৃষ্ট হইল, সে সবিনয়ে জানাইল, প্রভো! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

ক্রমে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এই সময়ে তপস্বী জালপাদ দেবদত্তকে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস! এই দেবালয়ের নিকটে একটি শ্মশান দেখা যাইতেছে। উহার মধ্যে একটি বটবৃক্ষ আছে, আমি প্রতিদিন এই সময়ে ঐ বৃক্ষের মূলদেশে বসিয়া অভীষ্টদেবতার পূজা করিয়া থাকি। আজি সেই সময় উপস্থিত, আমি এখনই ঐ স্থানে যাইব, তুমিও আমার সহিত আগমন কর।

তপস্বী শ্মশানে পৌছিয়া বট-বৃক্ষের মূলে উপবেশনপূর্বক পূজায় মনোনিবেশ করিলেন, দেবদত্তও তপস্বীর কাছে বসিয়া তাঁহার পূজাপ্রণালী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে তপস্বী পূজা শেষ করিয়া দেবদত্তকে বলিলেন, বৎস! দেখিলে ত? এই প্রকারে পূজার অনুষ্ঠান করিতে হয়। তুমিও প্রত্যহ এই সময় এই স্থানে আসিয়া এইরূপে পূজা করিবে এবং পূজান্তে বলিদানপূর্বক নয়ন মুদিত করিয়া প্রার্থনা করিবে, হে বিদ্যুৎপ্রভে! আমার পূজা গ্রহণ কর, এইরূপে প্রত্যহ পূজা করিলে তোমার বিদ্যাধর-পদপ্রাপ্তি অচিরেই সঙ্ঘটিত হইবে।

দেবদত্ত সন্ন্যাসী জালপাদের আদেশানুসারে সেদিন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল। পরদিন নিশীথসময়ে সেই বট-বৃক্ষের মূলে বসিয়া পূজা আরম্ভ করিল। পূজার

শেষে বলিদানপূর্বক বিদ্যুৎপ্রভার উদ্দেশে চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইল। এইরূপে দেবদত্ত প্রতি রাত্রিতেই শ্মশানস্থ বটবৃক্ষমূলে অবস্থানপূর্বক পূজা করিয়া পূজা ও ধ্যানান্তে গৃহে আসিয়া একান্তে নির্জনে অবস্থান করিতে লাগিল।

দেবদত্ত এই প্রকারে কিয়দ্দিন যথানিয়মে পূজা ও ধ্যান সমাধা করিতে লাগিল। একদিন হঠাৎ সেই শ্মশানস্থ বটবৃক্ষটি সশব্দে ফাটিয়া গেল। ভীষণ শব্দে দেবদত্তের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে সভয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—সম্মুখে এক পরমা সুন্দরী রমণী-মূর্তি দণ্ডায়মানা। দেবদত্ত সহসা সম্মুখে এক অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী রমণী-মূর্তি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হওয়ায় কোনরূপ বাক্যস্ফূর্তি হইল না। সেই রমণীও তৎকালে দেবদত্তকে কিছু না বলিয়া হস্ত দ্বারা দেবদত্তের গাত্র স্পর্শ করিয়া পুনরায় দ্বিধাভূত বটবৃক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

দেবদত্ত এইরূপ ব্যাপারে আরও বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল,—এ কি হইল, এরূপ আশ্চর্য ঘটনা ত আর কোথাও দেখি নাই। এই রমণী দেবী না মানবী? রমণী আবার এই বটবৃক্ষেই লুক্কায়িত হইল। আচ্ছা দেখি, এই তরুর অভ্যন্তরে পুনরায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি না! এইরূপ স্থির করিয়া সে দ্বিধাভূত বটবৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, একটি দিব্য মণিময় গৃহ, তন্মধ্যে একটি রমণীদাকৃতি রমণী। রমণী নানা আভরণে ভূষিতা হইয়া পর্যঙ্কোপরি শয়ানা—তাঁহার রূপের ছটায় যেন মণিময় মন্দির হীমপ্রভ হইয়াছে। দেবদত্ত বিস্ময়ে বিভোর হইয়া মনে মনে নানা প্রকার আলোচনার পর পর্যঙ্ক-শায়িনী রমণীকেই তথাকার অধিস্বামিনী বলিয়া স্থির করিল এবং নির্নিমেষ নয়নে কেবল সেই রমণীর অলৌকিক সৌন্দর্যরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই রমণী ঈষৎ হাস্যপূর্বক দেবদত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—মহাশয়। আপনি বোধ-হয়, এই সকল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন। আমাকে হয় ত কোন দেবাঙ্গনা বলিয়া মনে হইয়াছে। যাহা হউক, আপনি এক্ষণে বিস্ময় পরিত্যাগ করুন। আমি দেবী নহি, আমি যক্ষী, আমার নাম বিদ্যুৎপ্রভা। আমি যক্ষপতি রত্নবর্ষের কন্যা। সন্ন্যাসী জালপাদ আমারই প্রসন্নতার জন্য প্রতিনিয়ত আমাকে স্মরণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার উপদেশে আপনিও এতকাল আমারই আরাধনা করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার আরাধনায় আমি বিশেষরূপে প্রীত

হইয়াছি এবং আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে। আমার একান্ত অভিপ্রায় যে, আপনিই আমার পাণিগ্রহণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করুন।

দেবদত্ত যক্ষকন্যা বিদ্যুৎপ্রভার বাক্যশ্রবণ করিয়া, অমৃতধারায় অভিষিক্ত হইয়া মনে মনে কত সুখের কল্পনা করিতে লাগিল,—অহো, আমার এতদিনে আশালতায় ফল ধরিয়াছে। যে সুখ আমি কখনও কল্পনায় ভাবি নাই, অদ্য আমার তাই উপস্থিত।

দেবদত্ত এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, অবশেষে যক্ষকন্যার আগ্রহে সেই দিবসেই পাণিগ্রহণপূর্বক কিছুকাল মহাসুখে তৎসমভিব্যাহারে তথায় বাস করিতে লাগিল। অনন্তর কিয়ৎদিন পরেই বিদ্যুৎপ্রভা গর্ভবতী হইলেন।

এই সময় সহসা একদিন দেবদত্তের মনে মহাব্রতী জালপাদের কথা উদিত হইল। আর সে স্থির থাকিতে পারিল না। বিদ্যুৎপ্রভা দেবদত্তকে উৎকণ্ঠিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নাথ! আপনি এরূপ বিচলিত হইতেছেন কেন? দেবদত্ত উত্তর করিল,—প্রিয়ে। আমি তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছি। সেই মহাব্রতী জালপাদের কথা আমার মনে পড়িয়াছে। তুমি ত জান, তিনিই আমার সুখ-সম্ভোগের হেতু। অদ্য আমি তাঁহার চরণসন্দর্শনার্থে গমন করিব বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না। আমি সত্বরই তোমার সহিত পুনরায় মিলিত হইব।

দেবদত্ত বিদ্যুৎপ্রভাকে এইরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণান্তে বহির্গত হইল।······

সাধু জালপাদ দেবদত্তের নিকট আনুপূর্বিক ঘটনা শুনিয়া বিরক্ত হইলেন না। তাঁহার অভীপ্সিত পথের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি আনন্দে বলিলেন বৎস! তুমি উত্তম কাজ করিয়াছ। তোমার এরূপ রমণীলাভে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই, আমি আহ্লাদিত হইয়াছি। কিন্তু এইবার আর একটি আদেশ পালন করিতে হইবে। দেবদত্ত আপন কৃতকর্মে গুরুর প্রসন্নতা জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল এবং ভক্তি সহকারে জালপাদকে বলিল—গুরুদেব! আপনি আদেশ করুন। আমি অবশ্যই পালন করিব।

তখন জালপাদ দেবদত্তকে বলিলেন,—বৎস! তুমি আমার আজ্ঞায় শীঘ্র সেই যক্ষতনয়া বিদ্যুৎপ্রভার গৃহে গমনপূর্বক তাহার গর্ভ বিদারণ করিয়া এই

স্থানে আনয়ণ কর। সেই গর্ভ দ্বারা আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। দেবদত্ত গুরুর কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হওয়ায়, তাহার বাক্য নিঃসরণ হইল না এবং গুরুদেবের কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া দুঃখিত মনে তথা হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে যক্ষতনয়া বিদ্যুৎপ্রভার আলয়ে গমনপূর্বক একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগান্তে ভূতলে উপবেশন করিল। যক্ষতনয়া দেবদত্তের বিষাদকারণ পূর্বেই জানিতে পারায়, কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া ধীর ভাবে বলিলেন,—নাথ! আপনি যে জন্য বিষণ্ণ হইয়াছেন, তাহা পূর্বেই অবগত হইয়াছি। জালপাদ যে আজ্ঞা পালনার্থে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমার অবিদিত নাই. অতএব এই দণ্ডেই আমার উদর বিদারণ করিয়া আপনার গুরুর আদেশ রক্ষা করুন।

যক্ষতনয়া এ-বিষয়ে দেবদত্তকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু দেবদত্ত এই বীভৎস কার্য করিতে সম্মত হইল না। তখন বিদ্যুৎপ্রভা স্বয়ংই ছুরিকা দ্বারা স্বীয় উদর বিদারণপূর্বক গর্ভস্থ শিশুকে তাহার সম্মুখে ধরিলেন। দেবদত্ত এই ভীষণ ব্যাপারে চমকিয়া উঠিল। সে আর সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারিল না। তখন যক্ষতনয়া দেবদত্তকে ধীরভাবে বলিলেন,—নাথ! আপনি এ কার্যে বিরক্ত হইবেন না। আমি কোন অভিশাপ বশতই এইরূপ গুরুতর কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলি, শ্রবণ করুন।

আমি পূর্বে এক বিদ্যাধরী ছিলাম। কোন মহাপুরুষের শাপে যক্ষীরূপে জন্মিবার পর আমি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াছিলাম। অভিশাপদাতা মহাপুরুষ আমায় যেরূপ শাপান্ত নির্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই আমার এই গর্ভচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়া নিজহস্তে এই নিষ্ঠুর কার্য সম্পন্ন করিয়াছি। সুতরাং এই ব্যাপারে আমার প্রতি ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইবেন না। সম্প্রতি আমার শাপান্ত হইয়াছে। আমি আবার বিদ্যাধরীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যথাস্থানে চলিলাম। আমার বিচ্ছেদে আপনি অধীর হইবেন না। সত্বরই আমাদিগের মিলন হইবে। এই বলিয়া দেবদত্তকে নানারূপ আশ্বস্ত করিয়া বিদ্যুৎপ্রভা বিদ্যুতের ন্যায় হঠাৎ অদৃশ্যা হইলেন।”

আমাদের আধুনিক মনের জাগ্রত বাস্তববুদ্ধির কাছে এ-কাহিনী দু'টি উৎকল্পনার সৃষ্টি, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-সব কাহিনী পাঠকমনে হাসির কণামাত্র সৃষ্টি করে না। তার কারণ, স্রষ্টার মনের গভীর একাগ্র স্তর থেকে ভক্তি

বিশ্বাসের নতি ও সমর্পণকে আশ্রয় করে এ-কাহিনী যেমন জন্ম নিয়েছে, বহুযুগ ধরে পাঠকের মনে ভক্তিবিশ্বাস সংস্কারভয় জাগ্রত করে, তা অলৌকিকতায় পরিণত হয়েছে। ফলে আধুনিক মনের সংস্কারমুক্তি নিয়ে এই অলৌকিক বিশ্বাসের কাহিনীকে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্যসৃষ্টি ব'লে হাসতে চেষ্টা করলেই যেমন উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বাদ পাওয়া যাবে না, তেমনি এ-সব কাহিনীর সরলবিশ্বাসের অলৌকিক স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

এই অলৌকিক কাহিনীর পাশে বাংলার সাহিত্যজগৎ থেকে উৎকল্পনার হাস্যরসের একটি কাহিনী রেখে দেখা যেতে পারে।

॥ ডমরুচরিত ॥

ডমরুচরিত-এর চতুর্থ পরিচ্ছেদের গল্প। ৩

[ডমরু তপস্যায় দেবী দুর্গাকে সন্তুষ্ট করে কার্তিকঠাকুরের ময়ূরটির পিঠে চড়ে আকাশ ভ্রমণে চলেছেন। কিন্তু দেবী ডমরুকে ময়ূরটি দেবার সময় দুটি মন্ত্র শিখিয়ে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "সন্ধ্যা হইলেই ময়ূরকে তুমি ছাড়িয়া দিবে। না ছাড়িয়া দিলে, সে তোমাকে লবণ, ইক্ষুরস, সুরা, ঘৃত, ক্ষীর দধির স্বাদু সমুদ্রে লইয়া ফেলিবে। সে সমুদ্রে তুমি হাবুডুবু খাইয়া মরিবে।...বাসার উপর আসিয়া এই মন্ত্রপাঠ না করিলে ময়ূর তোমাকে সপ্তদ্বীপ সাতসমুদ্র তের নদী পারে লোকালোক পর্বতের ওধারে সূর্যের অগম্য-তিমির পূর্ণ গভীর গহ্বরে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে।" ডমরু দেবীর উপদেশ ও সতর্কবাণী শুনে, মন্ত্র আউড়ে, ময়ূরের পিঠে উড়ে চললেন। নানা ঘটনার পর, ডমরুর ময়ূর পৃথিবীমুখী হল।]

—"সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আমি সমুদ্রের উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সুন্দর বনের উপর আসিলাম। ময়ূর আমার বাসার দিকে ধাবিত হইল। তখনও ভূমি হইতে প্রায় এক ক্রোশ উচ্চে শূন্যপথে ময়ূর উড়িতেছিল। আমি ভাবিলাম, এ-স্থান হইতে আমার বাসা প্রায় আর দুই-ক্রোশ আছে। বাসার ঠিক উপরে যাইলেই সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটি পড়িব।

কিন্তু সেই দ্বিতীয় মন্ত্রটি কি ? সর্বনাশ। আমি যে মন্ত্রটি ভুলিয়া গিয়াছি। একথা নয় সে কথা, সে কথা নয় এ কথা—ক্রমাগত ভাবিয়া মন্ত্রটি স্মরণ করিতে

৩. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—ডমরুচরিত

চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাহার একটি বর্ণও আমার মনে উদয় হইল না। এমন কি, হতভম্ব হইয়া আমি দুর্গা নামটি পর্যন্ত মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম যে, যাঃ ডমরুধর! এইবার তোমার সব লীলা-খেলা ফুরাইল। যাহা হউক, অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে আমার মনে হইল যে, মন্ত্রটিতে 'জ' আছে 'ল' আছে আর 'ক' আছে। তাহার পর সেই অক্ষর কয়টি যোড়তাড় করিয়া স্থির করিলাম যে, মন্ত্রটি বোধহয় এইরূপ হইবে—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?"

ডমরুধর পুনরায় বলিলেন, "জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।"

লম্বোদর বলিলেন,—"এতও তুমি জান। এ কোন ভাষা?"

ডমরুধর উত্তর করিলেন, "তা জানি না ভাই, এ ভিন্ন আমার আর কিছু তখন মনে হইল না।"

মন্ত্রটি এইরূপ ঠিক করিয়া আমি ভাবিলাম, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি; উচ্চৈঃস্বরে আমি বলিলাম,—

জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।

সেই কিচ-মিচ শব্দ শুনিয়া ময়ূর ভাবিল,—

কৈলাস পর্বতে ভূত প্রেত দানা দৈত্যের সহিত আমার বাস। অনেক তন্ত্রমন্ত্র শুনিয়াছি। এরূপ বিদঘুটে কখনও শুনি নাই। এ লোকটার ভাব-গতিক ভাল নহে। বাসায় লইয়া গিয়া আমাকে হয়তো এইরূপ ভীষণ পালক-হর্ষণ মন্ত্রবলে খাঁচায় পুরিয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে। আগে থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল। এইরূপ ভাবিয়া গাঝাড়া দিয়া ময়ূর আমাকে শূন্যদেশে ফেলিয়া দিল। ...আমি হু হু শব্দে শিলার ন্যায় নীচে পড়িতে লাগিলাম। হু হু, হু হু, হু হু, কানে আমার বাতাস লাগিতে লাগিল। আমি ভাবিলাম যে, এইবার আমার দফারফা হইল। হু হু হু হু শব্দে পড়িতে লাগিলাম। অবশেষে থপ করিয়া কাদার ন্যায় কি একটা কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম।

কোমল বস্তুর উপর পড়িলাম, সেজন্য আমার অস্থিমাংস চূর্ণ হইয়া গেল না, সেজন্য আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না। যখন আমার হৃদয়ের ধড়ফড়ানি কিছু স্থির হইল, তখন আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম। তাহাতে আমার

চক্ষু স্থির। আমি দেখিলাম যে, পর্বতপ্রমাণ প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে আমি পতিত হইয়াছি। ব্যাঘ্রটি বৃদ্ধ হইয়াছিল। সেজন্য তাহার দন্ত ছিল না। দাঁত থাকিলে শূলসদৃশ দন্তে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার মৃত্যু হইত। আমার সকল কথা মনে হইল। পীর গোরাচাঁদের ফকীরদিগের অভিশাপে আমি পড়িয়াছি। এ সেই পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র। যে ব্যাঘ্রে চড়িয়া তিনি দেশ-ভ্রমণ করিতেন। তোমার যে-সে ব্যাঘ্র নহে। এ রয়েল টাইগারের বাবা। এ মহারাজ ব্যাঘ্র।

লোকে বলে যে, ঘুমন্ত সিংহ হাঁ করিয়া থাকিলে, তাহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে না। সে ঠিক কথা নহে। রাজসাপ নামে এক প্রকার সর্প আছে। সে সাপ হাঁ করিয়া থাকিলে তাহার মুখে অন্যান্য সাপ প্রবেশ করে। এ বৃদ্ধ ব্যাঘ্র তাহাই করে। আকাশ পাতাল জুড়িয়া হাঁ করিয়া থাকে। আর ইহার মুখে মৃগ প্রবেশ করে। আমি বসিয়া থাকিতে থাকিতে একটা বন্য মহিষ, চারিটা হরিণ ও দুইটা বরাহ ইহার মুখের ভিতর প্রবেশ করিল। তখন ব্যাঘ্র একেবারে কোৎ করিয়া আমাদের সকলকে গিলিয়া ফেলিল।

ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ঘোর অন্ধকার। আমি বিরস বদনে তাহার এক কোণে গিয়া বসিলাম। বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—'এখন করি কি? আর রক্ষা নাই। এখনি হজম হইয়া যাইব।...

নিতান্ত সঙ্কটে পড়িলে মানুষের অনেক বুদ্ধি যোগায়। একবার কোন ডাক্তারের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, জীবের উদর হইতে এক প্রকার অম্লরস বাহির হয়; তাহাতেই খাদ্য গলিয়া পরিপাক পায়। তোমরা জান যে, আমার অম্বলের রোগ আছে। আর সেজন্য আমি সর্বদা কাঁচা সোডা ব্যবহার করি। ভাগ্যক্রমে আমার পকেটে কাগজে মোড়া খানিকটা কাঁচা সোডা ছিল। সেই সোডা উত্তমরূপে আমি গায়ে মাখিয়া বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রের পেট হইতে অম্লরস বাহির হইয়া মহিষ হরিণ শূকর সব গলিয়া পরিপাক হইয়া গেল, কিন্তু সোডার প্রভাবে আমার শরীর গলিয়া গেল না। আপাততঃ আমার প্রাণ বাঁচিয়া গেল।

তা যেন হইল। কিন্তু সে আর কয়দিন? ব্যাঘ্রের উদর হইতে বাহির না হইতে পারিলে মৃত্যু নিশ্চয়। আজ হউক, কাল হউক, মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু কি করিয়া বাহির হইব? মা দুর্গার নাম এখন আমার মনে হইল। একান্ত

মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলাম। পীর গোরাচাঁদকে অনেক সিন্নি মানিলাম। মা ভগবতী ও পীর সাহেবের আমার প্রতি কৃপা হইল। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর এক কোণে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলিয়া দিল,—তোমার পকেটে কাগজ ও পেন্‌সিল রহিয়াছে, আবাদের কর্মচারীকে পত্র লেখ না কেন ?

আমার তখন ভরসা হইল। পকেট হইতে কাগজ পেন্‌সিল বাহির করিয়া আমি আমার কর্মচারীকে এইরূপ এক চিঠি লিখিলাম। "পীর গোরাচাঁদের কোপে আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ব্যাঘ্র আমায় গ্রাস করিয়াছে। সেই ব্যাঘ্রের উদরে আমি আছি। যদি কোনরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।"

আমার কর্মচারী বুদ্ধিমান লোক। আমার চিঠি পাইবামাত্র সে দুই জোয়ারের পথে যেস্থানে ডাক্তারখানা আছে, সেস্থানে চলিয়া গেল। ডাক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহাতে বমন হয়, এইরূপ একসের ক্রয় করিল। ইংরেজীতে ইহাকে টারটার এসিটিক বলে। আবাদে ফিরিয়া সেই ঔষধ কাপড়ে রাখিয়া এক ছাগলের গলায় বাঁধিয়া দিল। তারপর যে স্থানে পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্র বাস করে, সেইস্থানে ছাগল ছাড়িয়া দিল। বলা বাহুল্য যে, ভ্যা ভ্যা করিতে করিতে ছাগল আপনা আপনি ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করিল।

প্রায় দুইঘণ্টা পরে ঔষধের ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

প্রথমে ব্যাঘ্রের পেট কামড়াইতে লাগিল। পেটের কামড়ে ব্যাঘ্র অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।…ব্যথা যখন কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না, তখন যেদিকে তাহার দুই চক্ষু গেল, সেই দিকে ঘোড়-দৌড়ের অশ্ববেগে সে ছুটিয়া চলিল। ছোট ছোট গাং লাফ দিয়া ও বড় বড় গাং সাঁতার দিয়া পার হইতে লাগিল। ক্রমাগত দৌড়িতে লাগিল। হাঁ করিয়া দৌড়িতেছিল, সেজন্য পেটের ভিতর বসিয়া আমি কতক কতক দেখিতে পাইতেছিলাম। বন পার হইল, নদী নালা খাল বিল অনেক পার হইয়া গেল। পেটের কামড়ে সমস্ত রাত্রি দৌড়িল, সমস্ত দিন দৌড়িল, পুনরায় আর এক রাত্রি দৌড়িল। সুন্দরবনের এলাকা পার হইয়া গ্রামসমূহের নিকট মাঠ দিয়া ধাবিত হইল। অবশেষে দ্বিতীয় দিনের বেলা তিনটার সময় বমন করিতে আরম্ভ করিল। শৈশবকালে মাংসপ্রাশনের সময় হইতে যত মহিষ হরিণ শূকর

প্রভৃতি খাইয়াছিল, তাহাদের হাড়গোড় সমুদয় বমন করিয়া ফেলিল। উদ্গারের সহিত আমাকে সে বাহির করিয়া ফেলিল।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া আমার দিকে সে দুই একবার কট্‌মট্ করিয়া চাহিল। মনে মনে ভাবিল, "এ লোকটাকে গিলিয়া ভাল কুকর্ম করিয়াছিলাম। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, না আছে রস না আছে কষ। কালচামড়া মোড়া কেবল খানকতক হাড়। এর চেয়ে যদি দশ মণ পাথুরে কয়লা গিলিতাম তাহা হইলে কাজ হইত।"

এই প্রকার চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্র দ্রুতবেগে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। পশু! সে আমার রূপের মহিমা কি বুঝিবে।

লম্বোদর বলিলেন, "তা সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে?"

কিয়ৎক্ষণ নিমিত্ত নীরব থাকিয়া ডমরু উত্তর করিলেন, "দেখ লম্বোদর, সকল কথার খোঁচ ধরিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর ডাকঘর নেই, সেস্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না। সেস্থানে মনি-অর্ডার হয় না।"

একটি বালকের উদরে প্রবেশ ক'রে মার্কণ্ডেয় মুনির নগর-রাষ্ট্র-পর্বত-চন্দ্র-সূর্য দর্শন এবং বালকের বিবৃতমুখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হওয়ার ঘটনা, দেবদত্তের বটগাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে মণিময় গৃহে সুন্দরী রমণীকে নানা আভরণে সজ্জিত হয়ে পালঙ্কে শয়ান দেখে মুগ্ধ হওয়া এবং তাকে গ্রহণ করার ঘটনা, আর ডমরুর পীর গোরাচাঁদের ব্যাঘ্রের উদরে প্রবেশ করে এক কোণে ঘোর অন্ধকারে বিরস বদনে বসে 'একটা বন্য মহিষ, চারিটা হরিণ ও দুইটা বরাহ'কে বাঘের পেটে ঢুকতে দেখা এবং গায়ে সোডা মেখে ডমরুর জীর্ণ না হয়ে কৌশলে বেরিয়ে আসা,—তিনটি কাহিনীতেই অদ্ভুত কাল্পনিকতা রয়েছে।

কিন্তু মহাভারত ও কথাসরিৎসাগরের কাহিনীর স্রষ্টা পাঠকের অন্তরের আবাল্যসুপ্ত ভক্তি ও বিস্ময়ের বিহ্বলতাকে, সংস্কার ও বিশ্বাসকে সচেতনভাবে জাগিয়ে তুলে উৎকেন্দ্রিক কাহিনীকে অলৌকিক কাহিনীতে পর্যবসিত করেছেন। ডমরুচরিতের কাহিনী মন থেকে সকল রকম বিশ্বাস, ভয়-ভক্তির সংস্কার মুছে দিয়ে মন তীব্র অসঙ্গতিতে ভরিয়ে তুলে উৎকল্পনার হাসির কাহিনী হয়ে উঠেছে।

উৎকল্পনার এই হাসির জগতের সঙ্গে রূপকথার জগতেরও পার্থক্য রয়েছে। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য, বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্যের সীমারেখা ছাড়িয়ে রূপকথারও রথ চলে। কিন্তু রূপকথার অবয়বে উৎকেন্দ্রিকতা এসেছে ছদ্মবেশ হয়ে। তলে রয়েছে প্রতীকধর্মিতা, সনাতন নীতির আধিপত্য। সুয়োরাণীর সুখ, দুয়োরাণীর দুঃখ, এবং শেষ পর্যন্ত সুয়োরাণীর সকল ষড়যন্ত্রের প্রতিফল লাভ, দুয়োরাণীর দুঃখশেষে সুখলাভ—এই যে কাহিনী, এর অন্তরে একটা বড় গভীর নীতিকথা রয়েছে, প্রতীকী গুরুত্ব রয়েছে। লোভ-পাপ-ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংসা-অপ্রেমের প্রতিফলের কথা, ধর্ম-দান-ধ্যান-সততা-উদারতা-সহনশীলতার প্রতিফলের কথা, সুখসম্পদ শক্তি ঐশ্বর্যলাভের আদিম ইচ্ছার কথা,—রূপকথার কল্পনার কেন্দ্রে স্থান পেয়েছে। সকল দেশের রূপকথা সম্পর্কে এ-কথা সত্য।

দ্বিতীয়তঃ, রূপকথার অন্তর-বাহির একটা মোহজালে আবৃত। রাজপুত্র, রাজকন্যা, বেঙ্গমাবেঙ্গমী, পক্ষীরাজ, সোনার কাঠি রূপার কাঠি, সাপের মাথার মণি, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, এরা এক বিচিত্র রহস্য ও সৌন্দর্যের জাল রচনা করে, এক 'রহস্যঘন মাধুর্য' একটা 'ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোর' সৃষ্টি করে। রূপকথার আনন্দ অফুরন্ত হয়ে যুগযুগান্ত সে অম্লান হয়ে রয়েছে, তার কারণ এই ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোরের সৃষ্টি, এই রহস্যঘন মাধুর্যের বিরচন। মানুষের ভেতরে যে একটি চিরকালের শিশু রয়েছে, এই মায়াঘোরের সোনার কাঠির স্পর্শে সে-শিশু আয়ত ঢলঢল চোখের অতলান্ত দৃষ্টি নিয়ে রূপকথার মায়ালোকের কথা শোনে, পড়ে। সকল রকম উৎকেন্দ্রিকতা সেইক্ষণে রূপকথার যাদুস্পর্শে বাস্তব জগতের মত বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। সেই বিশ্বাস্য মায়ার জগতে হাসির উচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যরসের জগতে অভাব এই ঐন্দ্রজালিক মায়াঘোরের, বিস্ময়ের আবিষ্টতা ও মুগ্ধ বিহ্বলতার।

উপকথার (Fables) পশুপাখি রাক্ষস-খোক্কসের ভিড় এবং তাদের মুখে মানুষের কথা তুলে দেওয়ার মধ্যে কল্পনার উদ্ভটতা লক্ষ্য করা যেতে পারে। কিন্তু উপকথা যে আমাদের হাসায় না তার কারণ উৎকাল্পনিকতা সেখানে রূপক হয়ে এসেছে। কাহিনীর তলায় রয়েছে নীতিকথার ভার, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য-সচেতনতা। প্রসন্ন হাসি এ-মাটির ওপর দাঁড়াতে পারে না।

ছড়ার মধ্যে কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতা ছড়িয়ে আছে। যত অদ্ভুত আজব বস্তু ও প্রাণীর সঙ্গে ছড়ার রাজ্যে শিশুমনের সাক্ষাৎ।

"হাট্টিমা টিম্ টিম্
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম্ টিম্।"

অথবা

"খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা বলে পাখি কোন বিলে চরে
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।"

—এমন অসম্ভবতা ছড়ার ডালিতে বিকীর্ণ। কিন্তু ছড়া যে আমাদের হাসিয়ে তোলে না, তার কারণ রূপকথার মত মোহাবেশ রচনা করে ছড়া। ছড়ার রাজ্য অসঙ্গতির, অসংলগ্নতার আজব রাজ্য সত্য। কিন্তু সে অসঙ্গতি দিয়ে হাসি সৃষ্টি করা লক্ষ্য নয়। এলোমেলো কল্পনা দিয়ে ছেলে ভুলিয়ে তার ছোট্ট চোখের পাতায় কাঁঠালগাছের পিঁড়ি পেতে ঘুমের মাসিকে বসিয়ে দিয়ে মা'র মুক্তি উদ্দেশ্য। ছড়ার সুরে ঘুমের ঢুলুনি এমন ধীরে ধীরে আসতে থাকে যে, তন্দ্রালোভাতুর চোখ ও মন হাসতে পারে না। খোকা যখন জগৎটাকে চিনে ও জেনে একদিন খোকার পিতা, পিতামহ হয়ে পড়ে, তখনও ছড়া শুনে চোখের পাতায় ঘুমের মাসি, ঘুমের পিসির কাঁঠাল-পিঁড়ির স্পর্শ বোধ করে। ছড়ার স্থায়ী মূল্যমান এখানেই। ছড়ার এই নিদ্রালু ঢলের ওপর হাসি স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

অলৌকিকতা ও রূপকথার মত ব্রতকথাতেও উৎকেন্দ্রিক কল্পনাপ্রসূত ঘটনা কাহিনী রয়েছে। ঘরের কালো বিড়ালটির ওপর বধূ দুধ ক্ষীর চুরির মিথ্যা দোষারোপ করলে বিড়াল রাগ করে বধূর সদ্যোজাত সন্তান চুরি করছে (অরণ্য-ষষ্ঠীব্রত); লাউগাছ কেটে দিলেও ছিন্নমূল গাছে দ্বিগুণ ফলফুল হচ্ছে, ভাগাড়ের মরাহাতি জড়িয়ে ধরলে সে বেঁচে উঠছে (হরিষ মঙ্গলবার ব্রত); গোমাংস ফলমূলে পরিণত হচ্ছে (বিপত্তারিণীব্রত);—এ ধরণের অসম্ভব কল্পনা ব্রতকথায় রয়েছে। কিন্তু ব্রতকথার এই উৎকেন্দ্রিক চিন্তা যে আমাদের হাসায় না, তার কারণ হাতে ফুল ধরে ভক্তিপূর্ণ মনে ব্রতকথা যাঁরা শুনছেন, তাঁদের কাছে এ-সব ঘটনা দৈবলীলা। দেবদেবীর ওপর বিশ্বাসভক্তি রাখলে, তেমন ক'রে তাঁদের

ডাকলে, সব কিছু সম্ভব। দৈবকৃপায় মরা হাতি বেঁচে ওঠে, গোমাংস ফুলফল হয়ে বিপত্তারণ করে। দেবতার সন্তোষে হাতিশালে হাতি হয়, ঘোড়াশালে ঘোড়া হয়, গোয়াল ভরা গোরু হয়, মরাই ভরা ধান হয়, দরবার-আলো পুত্র হয়, সভা-আলো জামাই হয়, স্বামীর সম্পদ সোহাগ আয়ু শতগুণ হয়, দশাবিপর্যয় ভয় দূর হয়। কিন্তু দেবদেবীকে অবিশ্বাস করলে তাদের রোষদৃষ্টিতে গৃহস্থ ছারেখারে যায়, কপাল পুড়ে খাক হয়। এই তীব্র বিশ্বাস ভক্তি, তীব্র ভয়ের স্পর্শে ব্রতকথায় সমস্ত রকম অসম্ভবতা সম্ভব হয়ে উঠেছে। একটা পরিবারের, পরিবারকেন্দ্রিক একটা সমাজের, একটা জাতির কামনাবাসনা, মেয়েদের ভক্তি-বিশ্বাসকল্যাণ বোধপূর্ণ হৃদয়-অর্ঘ্যে রূপ পেয়েছে ব্রতকথায়। আধুনিক মন ব্রতকথার এই অন্তরধর্মটুকু অস্বীকার ক'রে তার উৎকেন্দ্রিকতা নিয়ে হাসতে চাইলে, ব্রতকথার স্নেহ প্রেম ভক্তির পারিবারিক ও সামাজিক মৃদুকোমল সবুজ দেহখানির লাবণ্য হারিয়ে ফেলবে। সে অপচয় হাসিকে বিকৃত করে তুলবে।

উৎকল্পনার এই হাস্যধারার আলোচনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের সৃষ্টি উদ্ভট নাটকের (absurd drama) প্রসঙ্গ স্বাভাবিকভাবেই আসতে পারে। কারণ সঙ্গতি, অর্থময়তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ নিয়ে 'অ্যাবসার্ড' নাট্যকারগণও অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁদের নাটকে অ্যাবসার্ড কল্পনার বিচিত্র খেলা রয়েছে। আয়োনেস্কো-র রচিত 'আমিদি' নাটকে আমিদি ও তার স্ত্রী দেখলেন, তাদের ঘরে রক্ষিত মৃতদেহটি ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে ; এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তার দেহ ছড়িয়ে পড়ছে। পা দু'টি বাড়তে বাড়তে জানালা দিয়ে বাহিরে ঝুলে পড়ছে। নাটকের শেষ দিকে আমিদি হঠাৎ আকাশে উড়ে গেছে এবং অপস্রিয়মাণ আমিদিকে ধরার জন্য সকলে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। উক্ত নাট্যকারের 'রাইনোসিরাস' নাটকে দলে দলে মানুষ গণ্ডারের চেহারা ও স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে গণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকে মৃত সীতানাথ জীবন্ত শরদিন্দুকে মৃত্যুর গল্প শোনাচ্ছে—এ-সবই উৎকেন্দ্রিক কল্পনার নিদর্শন। স্যামুয়েল বেকেট (ওয়েটিং ফর গোডো, এণ্ড গেম, হ্যাপি ডেজ্‌ ইত্যাদি নাটক) ; আয়োনেস্কো (রাইনোসিরাস, দি চেয়ার্স, দি লেসন, আমিদি, বল্ড প্রিম্যাডোনা, দি কিলার ইত্যাদি নাটক) ; আদামভ (প্রফেসর তারানে, পিংপং ইত্যাদি নাটক) ; আরাবল (দি টু একজিকিউসনার্স, দি অটোমোবাইল, গ্রেভইয়ার্ড ইত্যাদি নাটক) ; এলবি (দি জু স্টোরি, দি আমেরিকান ড্রিম,

হু ইজ অ্যাফ্রেড্‌ অফ্‌ ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ ইত্যাদি নাটক) ; জ'। জেঁনে (দি মেড্‌স, দি ব্যালকনি, দি ব্ল্যাক্‌স ইত্যাদি নাটক) ; পিণ্টার (দি কালেকসন) ; বাদল সরকার (বাকি ইতিহাস, এবং ইন্দ্রজিত ইত্যাদি নাটক), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (মৃত্যুসংবাদ, নীল রংয়ের ঘোড়া, সিংহাসনের ক্ষয়রোগ ইত্যাদি নাটক) প্রমুখ ওদেশ এবং এদেশের অ্যাবসার্ড নাট্যরচয়িতাদের নাটকে কল্পনার উদ্ভটতা লক্ষণীয়। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যরসের সাহিত্যের সঙ্গে অ্যাবসার্ড নাটকের পার্থক্য মৌলিক। প্রথমত, হাস্যরস সৃষ্টি অ্যাবসার্ড নাটকের উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত, মানুষের গণ্ডারাকৃতি লাভের ইচ্ছা, মৃতদেহের ক্রমবর্ধমান আয়তন লাভ—এ-জাতীয় ঘটনাকে নাটকের মূল বক্তব্য ও কাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেই কল্পনার পাগলামোতে হাসি পাবে। কিন্তু নাট্যবস্তুতে এই জাতীয় উদ্ভটতা প্রতীকীমূল্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। অ্যাবসার্ড নাট্যকারগণ তাঁদের নাটকে জীবন ও জগতের প্রতি একটা আস্থাহীনতার দর্শন প্রচার করেছেন। এ-জগতে সব কিছুই মূল্যহীন। আমরা অর্থহীনতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যহীনতা, হতাশা ও অনস্তিত্বই হচ্ছে জীবনের একমাত্র সারকথা। অ্যাবসার্ড তত্ত্বের মৌল চিন্তাটি যাঁর সেই ফরাসী সাহিত্যিক আলবেয়র কামুর মতে..."Carrying this absurd logic to its conclusion I must admit that the struggle implies a total absence of hope, a continual rejection, a conscious dissatisfaction." এবং "It is that divorce between the mind that desires and world disappoints, my nostalgia for unity, this fragmented universe and the contradiction that binds them together."[৪] সুতরাং অ্যাবসার্ড মানুষ সব সময়েই নিজেকে বন্দী ভাবে। সে ভাবে সে গতানুগতিকতার পোষাপ্রাণী। তাই একই সঙ্গে বিদ্রোহ, মুক্তি ও প্রবৃত্তির মতই হচ্ছে অর্থহীনতা এবং এই তিনটিই অর্থহীনতার ফলাফল বলে কামু ঘোষণা করেন। সঙ্গতি, সামঞ্জস্য, অর্থময়তার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ থেকেই অ্যাবসার্ড নাটকের ঘটনা, কাহিনী, চরিত্র-আচরণে উদ্ভটতা আসে। কিন্তু তা এমন একটা দার্শনিক জটিলতার সঙ্গে জড়িত থাকে, এবং এই জীবন সম্বন্ধে এমন একটা হতাশাবাদ ও শূন্যতাময়তায় পাঠক ও শ্রোতৃমনকে বিভ্রান্ত করে যে

(৪) Albert Camus "The Meaning of Unmeaning."

ঘটনা কাহিনীর উৎকেন্দ্রিকতা কোথাও হাস্যসৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না, নাট্যকারগণের তা লক্ষ্যও নয়।

উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টারা হাসি সৃষ্টি করেন জীবনের গতানুগতিকতার, অতি সঙ্গতির ওপর আঘাত হেনে। কিন্তু তাঁদের বিদ্রোহের মধ্যে রয়েছে জীবন সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা, একটা ইতিবাচক দৃষ্টি। তাঁরা "Nothingness that is man, that was man, that will be man hereafter—" বলে রিচার্ড এন. কো'র মত হতাশাবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন না। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা নিজেকে স্বাধীন মুক্ত ভাবেন। তাই জীবনের সঙ্গতি, নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেই বার বার তাকে বিপর্যস্ত করে তিনি হাসি দিয়ে জীবনকে আরও প্রিয় করে তোলেন। সেইজন্যই ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় দুঃখ-কষ্টের কঠিন পীড়নের মধ্যেও, Carroll ইংলণ্ডের যন্ত্রযুগের কঠিন রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও কোথাও 'a total absence of hope' দেখেন নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে জীবনের মূল্যবোধে যেখানে আঘাত লেগেছে, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বিবর্ণ হয়ে উঠেছে এবং স্বাদহীন প্রাচীন গতানুগতিকতায় আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে—সেই পটভূমিতে ওদেশে বিশেষ করে ফরাসীদেশে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক জীবন্ত সাহিত্যবস্তুর সন্ধান না পেয়ে সাহিত্যভঙ্গীর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। অ্যাবসার্ড নাটক তারই ফল। এইজন্যই উৎকল্পনার হাস্যরস সেখানে জীবন্ত সাহিত্যবস্তু, উদ্ভট নাটক সেখানে নূতনত্ব ও চমৎকারিত্বময় একটা সাহিত্যভঙ্গী মাত্র। উৎকল্পনার হাস্য যেখানে জীবনবাদে স্পন্দিত, উদ্ভট নাট্য সেখানে হতাশাবাদের প্রচারক। সুতরাং কল্পনার উদ্ভটতার সূত্রে উৎকল্পনার হাস্য এবং উদ্ভট নাটক বহির্সাদৃশ্যযুক্ত হলেও দুয়ের মধ্যে প্রভেদ গভীর ও মৌলিক।

উৎকল্পনার এই হাস্যসৃষ্টির শিল্পরূপটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। উৎকাল্পনিক হাস্যসৃষ্টির সাহিত্যরূপের ক্ষেত্রে এ-কথা বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, এ-রাজ্য যতই না কেন আজগুবি, অসম্ভব, খাপছাড়ার রাজ্য হোক, তার সৃষ্টিতে স্রষ্টামনের সচেতন একাগ্রতা ক্রিয়াশীল। কবির মনে উর্বশীর জন্মভূমি আর 'কান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ীদের' জন্মভূমি এক না হলেও, স্রষ্টা কিন্তু দুয়ের সৃষ্টিতেই একাগ্র সচেতন। কারণ তাঁর অভিপ্রেত হচ্ছে সৃষ্টিকে একটা পূর্ণাঙ্গ নিটোলতা দান করা। সাহিত্যের হয়ে-ওঠার মূলে রয়েছে একটা সামগ্রিক পূর্ণতার সৃষ্টি

কৌশল। আর তার সম্পাদনে শিল্পিমনের ঐকান্তিক সচেতনতা চাই-ই। লেখকের সৃষ্ট চরিত্র বা কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমি থেকে বিভিন্ন রূপে জন্ম নিতে পারে। স্রষ্টার মধ্যে গভীর গম্ভীর প্রকৃতি এবং লঘু হাস্যমুখর প্রকৃতি, দুয়ের সহাবস্থান সম্ভব। কিন্তু যে-প্রকৃতিরই সৃষ্টি হোক না কেন, স্রষ্টার শিল্পিসুলভ সচেতনতা কারও ওপর কম নয়। স্রষ্টা এখানে মায়ের মত। মা তার স্তন্য-রসধারার যত্নে যেমন তার ধীরগম্ভীর স্বভাবের সন্তানটিকে পুষ্ট করছেন, তার চেয়ে কম যত্নে কম স্নেহে দুরন্ত দামাল ছেলেটিকে পুষ্ট করেছেন, তা নয়। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে একদিকে রয়েছে উদ্ভাবনী শক্তির ত্রিলোক ত্রিকাল বিস্তার, সেই কল্পনশক্তির সহযোগী হয়ে রয়েছে হাস্যমুখর, লঘুগতি, আনন্দোচ্ছল এক নৈর্ব্যক্তিক মনের প্রসন্ন উত্তাপ। হাতে রয়েছে গল্পকথন চাতুর্যের একটি লেখনী। তবেই উৎকল্পনার হাসির ফুল ফুটেছে। নয়তো এলোমেলো অসম্ভব কথা যে-সে বানাতে পারত।

রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব কথার এই কারিগরির কথাটা বোঝাতে গিয়ে তাঁর 'সে'-র মুখ দিয়ে একটি অসম্ভব গল্পের হাসির নমুনা দিয়েছেন,—

"স্মৃতিরত্নমশায় মোহনবাগানের গোলকীপারি ক'রে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অকৃটর্লনি মন্যুমেণ্ট। নীচ থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ হাঁ করে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিষটাকে এঁটো করে দিলেন।

'তোবা তোবা' বলে তিনবার মন্যুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞাসাহেব দৌড়ে গেল স্টেট্‌সম্যান অপিসে খবর দিতে।

স্মৃতিরত্নমশায়ের হঠাৎ চৈতন্য হল, মুখটা তাঁর অশুদ্ধ হয়েছে। গেলেন ম্যুজিয়মের দারোয়ানের কাছে। বললেন, পাঁড়েজি, তুমিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ, একটা অনুরোধ রাখতে হবে।

পাঁড়েজি দাড়ি চম্‌রিয়ে নিয়ে সেলাম ক'রে বললে, কোমা ভূ পোর্তে ভূ সি ভূ প্ল ?

পণ্ডিতমশায় একটু চিন্তা ক'রে বললেন, বড়ো শক্ত প্রশ্ন, সাংখ্যকারিকা মিলিয়ে দেখে কাল জবাব দিয়ে যাব। বিশেষ আজ আমার মুখ অশুদ্ধ, আমি

মন্যুমেণ্ট চেটেছি। পাঁড়েজি দেশলাই দিয়ে বর্মা চুরুট ধরালো। দুটান টেনে বললে, তা হলে এক্ষুনি খুলুন ওয়েব্‌স্টার ডিকসনারি. দেখুন বিধান কী।

স্মৃতিরত্ন বললেন. তা হলে তো ভাটপাড়ায় যেতে হয়। সে পরে হবে, আপাতত তোমার ঐ পিতল বাঁধানো ডাণ্ডাখানা চাই।

পাঁড়ে বললে, কেন, কী করবেন, চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছে বুঝি ?

স্মৃতিরত্ন বললেন, তুমি খবর পেলে কেমন করে? সে তো পড়েছিল পরশুদিন। ছুটতে হল উল্টোডিঙ্গিতে যকৃত বিকৃতির বড়ো ডাক্তার ম্যাকার্টানি সাহেবের কাছে। তিনি নারকেলডাঙা থেকে সাবান আনিয়ে সাফ করে দিলেন।

পাঁড়েজি বললেন,—তবে ডাণ্ডায় তোমার কী প্রয়োজন ?

পণ্ডিতমশায় বললে দাঁতন করতে হবে।

পাঁড়েজি বললেন, ওঃ তাই বলো, আমি বলি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচবে বুঝি, তা হলে আবার গঙ্গাজল দিয়ে শোধন করতে হতো।[৫]

এ গল্পের কথনে যেটাকে যেরকম জানি সেটাকে অন্য রকম ক'রে দেওয়ার চালাকি মাত্র আছে। কিন্তু কারিগরি নেই। হাসাবার শক্তি যতটুকু আছে এখানে ততটুকু হাসি। কারিগরির হাসি অনুপস্থিত। 'সে' নিজে তার নিজের গল্পের সমালোচনা করে বলছে—'এ যেন আঙুল দিয়ে না লিখে গণেশের শুঁড় দিয়ে লম্বা চালে বাড়িয়ে লেখা। 'সে'-র এ-সমালোচনা উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির মাত্রার প্রতিও ইঙ্গিত করেছে। যে অবিশ্বাস্য অসম্ভব কল্পনা হাসি সৃষ্টি ক'রবে তারও একটা মাত্রা রয়েছে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই অবিশ্বাস্য উদ্ভাবনা স্থূল হয়ে রসভঙ্গ করে। যদি কেউ বলে—অতিথিকে খাওয়াতে গিয়ে জিরাফের মুড়িঘণ্ট খাইয়েছে, সর্ষেবাটা দিয়ে তিমি মাছ ভাজা আর পোলাওয়ের সঙ্গে পাঁক থেকে টাটকা ধরে আনা জলহস্তী, আর তাঁর সঙ্গে তালের গুঁড়ির ডাঁটা চচ্চড়ি খাইয়েছে'—আতিথ্যের এই অবিশ্বাস্য খাদ্য আয়োজন শুনে শরীরে একটা মৃদু ঘিনঘিন ভাব জাগে। সেই সূত্রে গল্পে স্থূলতা এসে রসভঙ্গ করে। আতিথ্যের এই আয়োজনে তাই হাসি জাগে না। 'সে' যে গল্প বলেছে, সেখানে এ-ধরণের স্থূলতা নেই। কিন্তু গল্প কথনের ক্ষেত্রে মাত্রার অভাবটা বেশ বোধ করা যায়। কয়েকটা অসম্ভব কথা লাফিয়ে লাফিয়ে

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'সে'

জড়ো হয়ে হাসাবার চেষ্টা করেছে। এখানে বিসদৃশের সমাবেশ কৌশল আয়ত্ত হয় নি। ফলে হাসিও জমে নি, জমাট গল্পও হয় নি। 'সে' একেই বলেছে লম্বা চালের বাড়িয়ে বলা গল্প। পূর্বকথিত ডমরুধরের গল্পটার সঙ্গে এর প্রভেদ হল, আগের রচনা মাত্রা সচেতনতার ওস্তাদী হাতের আঙুলের লেখা। এই নিপুণ আঙুলটি বিসদৃশের সমাবেশ কৌশলটি আয়ত্ত করেছে। উদ্ভট চমক হেনে হেনে পাঠকমনকে পরিচালিত করেছে অনিয়ন্ত্রিত হাসির পথে। উৎকল্পনা সেরেফ পাগলামো মনে হলেও, সে পাগলামো যখনই সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হবে তখনই তার মধ্যে সৃষ্টির নিয়মজাত একটা সুমিত শৃঙ্খলা এসে পড়বে। শেলী যে harmonious madness কথাটা বলেছেন, ত্রৈলোক্যনাথ উদ্ধৃত রচনার কাল্পনিকতার হাস্যসৃষ্টিতে সেই সুশৃঙ্খল পাগলামোকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। ফলে এলোমেলো অসম্ভব কথা উঁচু চালের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা হয়ে উঠেছে। 'সে'-র উল্লিখিত গল্পে এই উঁচু চালটা, পূর্বকথিত কৌশলটা অনুপস্থিত।

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির এই কারিগরির কথা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সে'-র মুখ থেকে আরেকটা অসম্ভবের গল্প শুনিয়েছেন,—

"তাসমানিয়াতে তাসখেলার নেমন্তন্ন ছিল, যাকে বলে,—দেখা-বিন্তি। সেখানে কোজুমাচুকু ছিলেন বাড়ির কর্তা, তাঁর গিন্নির নাম ছিল শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরুঙ্কুনা। তাঁদের বড়ো মেয়ের নাম পাম্‌কুনি দেবী, স্বহস্তে রেঁধে ছিলেন কিন্টিনাবুর মেরি-উনামু, তার গন্ধ যায় সাত পাড়া পেরিয়ে। গন্ধে শেয়ালগুলো পর্যন্ত দিনের বেলা হাঁক ছেড়ে ডাকতে আরম্ভ করে নির্ভয়ে, লোভে কি ক্ষোভে জানি নে, কাকগুলো জমির উপর ঠোঁট গুঁজে দিয়ে মরিয়া হয়ে পাখা ঝাপটায় তিনঘণ্টা ধরে। এ তো গেল তরকারি। আর জালা জালা ভর্তি ছিল কাঙচুটোর সাঙচানি। সে দেশের পাকা পাকা আঁকস্টুটো ফলের ছোবড়া-চোঁয়ানো। এই সঙ্গে মিষ্টান্ন ছিল ইকৃটিকুটির ভিকৃটিমাই, ঝুড়িভর্তি। প্রথমে ওদের পোষা হাতি এসে পা দিয়ে সেগুলো দলে দিল; তার পরে ওদের দেশের সব চেয়ে বড়ো জানোয়ার, মানুষে গোরুতে সিঙ্গিতে মিশোল, তাকে ওরা বলে গাণ্ডিসাঙডুং, তারা কাঁটাওয়ালা জিব দিয়ে চেটে চেটে কতকটা নরম করে আনলে। তারপরে তিনশো লোকের পাতের সামনে দমাদ্দম হামানদিস্তার শব্দ উঠতে লাগলো। ওরা বলে, এই ভীষণ শব্দ শুনলেই ওদের জিবে জল আসে; দূর পাড়া থেকে শুনতে পেয়ে ভিখারি আসে দলে দলে। খেতে খেতে

যাদের দাঁত ভেঙে যায় তারা সেই ভাঙা দাঁত দান করে যায় বাড়ির কর্তাকে। তিনি সেই ভাঙা দাঁত ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেন জমা করে রাখতে, উইল করে দিয়ে যান ছেলেদের। যার তবিলে যত দাঁত তার তত নাম। অনেকে লুকিয়ে অন্যের সঞ্চিত দাঁত কিনে নিয়ে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। এই নিয়ে বড় বড় মকদ্দমা হয়ে গেছে। হাঁজার-দাঁতিরা পঞ্চাশদাঁতির ঘরে মেয়ে দেয় না। একজন সামান্য পনেরোদাঁতি ওদের কেটকু নাড়ু খেতে গিয়ে হঠাৎ দম আটকিয়ে মারা গেল, হাজারদাঁতির পাড়ায় তাকে পোড়াবার লোক পাওয়াই গেল না। তাকে লুকিয়ে ভাসিয়ে দিলে চৌচঙ্গি নদীর জলে। তাই নিয়ে নদীর দুই ধারের লোকেরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করেছিল, লড়েছিল প্রিভি কৌন্সিল পর্যন্ত।"

এখানে 'সে' যত বিদ্‌খুটে নামের ইটের ফাঁকে ফাঁকে একটু অসম্ভব কল্পনা চোলাই করে দিয়ে উৎকল্পনার হাসি সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কিন্তু নামের রুক্ষতার ওপর অসম্ভব কল্পনার গল্পের রসখানা বলতে গিয়ে এতবার হোঁচট খেয়েছে যে পাঠক হাঁপিয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ তো 'সে-'র এই গল্প শুনে হাঁপিয়ে উঠে বললেন, "থামো, থামো!"

এক্ষেত্রেও উৎকল্পনার হাসি সৃষ্টির কারিগরির দিকটা ব্যঞ্জিত। এলোমেলো অসম্ভব কথা বানাতে পারলেই যে উৎকল্পনার হাসির গল্প জমে না, সে কথাই সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

এই স্খলন থেকে উৎকল্পনার হাস্যরসকে সার্থকতায় উত্তীর্ণ করতে পারে শিল্পীর বিজ্ঞানী মন। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, দেখা যাবে তাঁরা অনেকেই বিজ্ঞানের যশস্বী ছাত্র। The Story of the Late Mr. Elvesham ; The Palttner Story প্রমুখ কাল্পনিক হাস্যের গল্পস্রষ্টা H. G. Wells বিজ্ঞানের জগতে এক স্মরণীয় মনীষী। Alice's Adventure in Wonderland-এর রচয়িতা Carroll ছিলেন সুপরিচিত অঙ্কবিদ্। 'ডমরুচরিত' রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক মন উল্লেখযোগ্য। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে তাঁর গবেষণা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ এবং উৎকল্পনার হাস্যরসের সৃষ্টি 'সে', 'খাপছাড়া' সমসাময়িক রচনা। বাংলা সাহিত্যে কল্পনার অসম্ভবতার হাস্যরসিক রাজশেখর বসু বা পরশুরাম ছিলেন উল্লেখযোগ্য রসায়নবিদ্। 'আবোল-তাবোল'-এর খেয়ালরসের

কবি সুকুমার রায় পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের ছাত্র ছিলেন এবং বিলেত থেকে ফটোগ্রাফি ও ব্লক তৈরির পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যাঁরা বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ ছাত্র নন, তাঁদের সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানীমন উল্লেখযোগ্য।

এই বিজ্ঞান-নিষ্ঠা একদিকে যেমন স্রষ্টাকে অলৌকিকতা ও ভৌতিকতার বিশ্বাস থেকে দূরে রেখে, সমস্ত রকম কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে সাহায্য করে, অপরদিকে বিজ্ঞানরীতির আয়ত্তে সহায়তা করে। বিজ্ঞানরীতির অর্থ Mathematical precisions। এই রীতি রচনার ক্ষেত্রে স্রষ্টার পরিমিতিবোধ, ব্যবহৃত উপকরণের অত্যাবশ্যকতা, কাল্পনিক কাহিনী বিন্যাসের সুনিপুণ দক্ষতা সম্পাদন ক'রে। অসম্ভব কল্পনাসন্নিবেশের বাঁধনের কাজ করে। এরই অভাবে উৎকল্পনার হাস্যরস কিভাবে ব্যর্থ হয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থে তা-ই দেখিয়েছেন। সংসারে যেমন বাজে কথা বলে আনন্দ দেবার লোক খুবই কম, স্বর্গে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে পাগল ভোলানাথ যেমন একক, সাহিত্যে জগতেও উৎকল্পনার হাস্যরসস্রষ্টা খুব সুলভ নন।

আগুনের সঙ্গে বাতাস যুক্ত হয়ে আগ্নেয় প্রলয় সৃষ্টি করে। পুষ্পধন্বার সঙ্গে বসন্ত এক হয়ে শিবের তপস্যা ভঙ্গ করে। উৎকল্পনার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত বেপরোয়া হাসি যুক্ত হয়ে পাঠক ও শ্রোতার রসবোধে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এই আলোড়নের একটি ধারা-প্রবাহ বাংলা সাহিত্যে সার্দ্ধশতকের ওপর ধরে গড়ে উঠেছে।

॥ তৃতীয় অধ্যায় ॥

প্রাক্ আধুনিক যুগে কল্পনার অসম্ভবতা নিয়ে অলৌকিকতা, রূপকথা বিরচিত হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে প্রসন্ন হাস্যের সৃষ্টি প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে কোথাও নেই। তার কারণ সকল দেশের প্রাচীন মধ্যযুগের সাহিত্যস্রষ্টারা জাতীয় জীবনের বীরত্বকথাকে, ধর্মবিশ্বাসের কথাকে, অলৌকিকতার বিশ্বাস-আস্থাকে সাহিত্যাধারে রূপ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। সেখানে দর্শন এসেছে, তত্ত্ব এসেছে, কাব্যরস উদ্ভিন্ন হয়েছে এবং তারই মধ্যে যৌথপরিবারের অন্তর্ভুক্তির মত হাসি এসেছে। কিন্তু হাসির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া সুলভ

ছিল না। হাস্যকে স্বতন্ত্র করে, তার বৈচিত্র্য সন্ধান করে কবি-সাহিত্যিকগণ হাসিসৃষ্টিতে উৎসুক ছিলেন না। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের অনেক কথা কাহিনী আজকের বুদ্ধি ও বোধের নিকট উৎকাল্পনিক। গ্রীক রোমান পুরাকাহিনীর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। Aristophanes, Sterne উৎকল্পনার ঘটনা চরিত্র বহু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু স্রষ্টারা তাঁদের উদ্দিষ্ট বক্তব্যকে, কহতব্য সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য কখনও এ-সমস্তকে রূপকরূপে এনেছেন, কখনও পাঠকমনে অলৌকিকতার রসাবেদন সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কখনও প্রতীকী-মূল্যের প্রয়োজনে এ-সমস্তর অবতারণা করেছেন। G. K. Chesterton-এর ভাষায় উৎকল্পনা এদের রচনা ছিল 'a kind of exuberant capering round a discovered truth'-রূপে আর মানুষ যুগযুগান্ত ধরে এই সকল উৎকেন্দ্রিকতাকে সরল মনের বিশ্বাসেই গ্রহণ করে আসছিল। এদের প্রতীকী-মূল্যকে বা মাধ্যম রহস্যকে সূক্ষ্ম বিচার করে তারা কাহিনী চরিত্রের উদ্ভটতা নিয়ে হেসে ওঠে নি। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, দেব-দৈত্য-দানব, পাহাড়-মাটি-জল, গাছপালা-তৃণ-পুষ্পর সঙ্গে মানুষ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সরল বিশ্বাসের পথ ধরে। বিশ্বাসেরই পথে দেবতা মাটিতে নেমে এসেছেন। মানুষ স্বর্গলোকে দেবতার আহ্বানে গিয়েছেন। দেবী অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। স্বর্গের পরীরা তাঁদের রূপালী ডানা গুটিয়ে মর্ত্যের পাহাড়ী হ্রদে স্নান করতে এসেছেন। মানুষে দেবতায়, দেবতায় মানুষে, প্রকৃতে অপ্রাকৃতে, বাস্তবে অবাস্তবে মিলন ঘটেছে বিশ্বাসের এই সরল পথে। একদিকে এই সরল বিশ্বাস, আরেকদিকে ধর্মচিন্তা—এই দুয়ের মোটা রঙিন আস্তরণে সেযুগের যুক্তি, বুদ্ধি ও মানবিক সামূহিক অনুভূতি ঢাকা থাকত। জেকব বুর্খার্ট তাঁর 'The Civilization of the Renaissance in Intlay' গ্রন্থে বলেছন, "In the Middle Ages both the sides of human consciousness—that which was turned within as that which was turned without lay dreaming or half-wake beneath a common veil. The veil was woven of faith, illusion, and childish prepossession through which the world and history were seen clad in strange hues." ফলে উৎকল্পনার যে সব গল্প, কথা গড়ে উঠেছে তারা প্রসন্ন হাসি কোথাও সৃষ্টি করতে পারে নি। জীবনের নানা অসঙ্গতি, খেয়াল-খুশি, নানা

উদ্ভট ভাব-ভাবনা নিয়ে হাসবার মন, এবং দেবতা-দৈত্য-ভূতপ্রেত নিয়ে হাসাবার সাহস মানুষ পেয়েছে আরও পরে। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি তাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যে অনুপস্থিত।

মানুষ যত সমাজবিপ্লবের নব নব গতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল, বিজ্ঞানের আলোকময়তার দিকে অগ্রসর হল, ততই তার ভক্তি সংস্কার এবং বিশ্বাস বুদ্ধিশুদ্ধি বিচার বিবেচনায় কষিত হতে লাগল। মানুষ হল নূতন যুগের, নূতন চিন্তার মূলকেন্দ্র। যুক্তিবুদ্ধি মানবপ্রধান চিন্তা হাতিয়ার। ফলে অ-স্বাভাবিক, অ-সম্ভব, অ-প্রাকৃতের প্রতি দৃষ্টি ও মনোভাব অনাবিল হল। বিশ্বাস-সংস্কার-ভক্তির অন্ধবায়ুচাপ নিম্নমুখী হতে লাগল। সমাজ বিবর্তনের এই গতিপথে মানুষের দৃষ্টি জীবনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, ভালোলাগা, মন্দলাগা, খেয়ালখুশির প্রতি আকৃষ্ট হল। সাহিত্যসৃষ্টির উপাদান হল বিচিত্র, সাহিত্যের জগৎ হল বিস্তৃত। এই যুগেই সম্ভব হল স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে উদ্ভট নানা চরিত্র কাহিনী ঘটনা পরিবেশ উদ্ভাবন করে প্রসন্ন মনের উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টি করা। উৎকল্পনার সচেতন হাসি তাই আধুনিক ফসল।

আধুনিক যুগে উৎকল্পনার হাসি দেখা দিল দুই রূপে। উৎকল্পনা কখনও সাহিত্য আচারের বহিরঙ্গে অবস্থান করে হাসিয়েছে; আবার অন্তরে বাইরে উৎকেন্দ্রিতা সঞ্চারিত হয়ে প্রসন্ন হাসির আনন্দ সৃষ্টি ক'রেছে। প্রথম ক্ষেত্রে কল্পনার অসম্ভবতা এসেছে রূপক হয়ে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রূপ হয়ে।

নতুন যুগের আরম্ভে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে গঠন মনস্কতা সকল দেশেই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আত্মসমালোচনায়, সমাজ ও জাতির বিকার বিকৃতির সমালোচনায়, সংস্কার উদ্দেশ্যে দৃষ্টি হল গহন গম্ভীর। এই প্রবণতাকেই ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন 'high seriousness'। এই প্রবণতা থেকে ব্যক্তি ও সমাজকে আঘাত করে সংস্কার করতে গিয়ে একশ্রেণীর সাহিত্যিক হাসির অস্ত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরা হাসির ছদ্মবেশে আঘাত করলেন, ব্যঙ্গবিদ্রূপ করলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে গিয়েই তাদের মধ্যে কেহ কেহ উৎকল্পনার কাঠামো রচনা করলেন। সে কাঠামো আশ্রয় ক'রে বাইরে হাসি উচ্ছ্বসিত হল। কিন্তু অন্তরালে রইল তীক্ষ্ণ তীব্র শ্লেষ, বিদ্রূপের হুল। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্যবৃহল্লাঙ্গুল', swift-এর 'Gulliver's Travels'। কল্পনার অসম্ভবতা দিয়ে হাসি সৃষ্টি করা এখানে লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল সমাজ ও মানুষের বিকার

বিকৃতিকে আঘাত করে সংশোধন করা। উৎকল্পনা এ-সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হয়ে এসেছে। ফলে যে হাসির সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রসন্ন বেপরোয়া নয়।

আঘাতে সংঘাতে, আত্মবিচারণায়, আত্মসমালোচনায় সমাজ যখন কিছুটা স্থিতিস্থাপক হয়ে এল, তখন একশ্রেণীর স্রষ্টা দেখা দিলেন উৎকল্পনার আঘাত-দাহহীন সামঞ্জস্যের হাসি নিয়ে। এই জগৎ অন্তরে বাইরে হাসিতে ভরা। প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টি করাই এখানে লক্ষ্য।

সাহিত্যে উৎকল্পনার এই হাসি বর্তমান কালের সৃষ্টি। এর সচেতন বিকাশ ঘটেছে উনিশ শতকে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু নয়, সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যেও উনিশ শতকের পূর্বে এই স্বতন্ত্র হাস্যধারাটির সৃষ্টি হয় নি।

উৎকল্পনার হাস্যরসের আবেদন যে আধুনিক কালের সৃষ্টি এবং যন্ত্রযুগের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে, সমস্যা জটিল জীবনযাত্রার মধ্যেই যে এর সচেতন স্ফূর্তি ঘটেছে—এই সত্যটি পরিষ্কার করে দেখাবার উদ্দেশ্যে বাংলা সাহিত্যের এই হাস্যধারাটির আলোচনাসূত্রে ইংরেজী সাহিত্যের প্রসঙ্গাবতারণা সম্ভবতঃ অবান্তর হবে না। অধিকন্তু উৎকল্পনার হাস্যরসের প্রতি ওদেশের লেখকদের কৌতূহল দেখান সম্ভব হবে।

ইংরেজী সাহিত্যে প্রাক্ উনিশ শতক থেকে grotesque কথাটা চলে এসেছে। যে কোন খেয়ালী পাঁচমেশালী কল্পনা আচরণের ক্ষেত্রে, যে কোন অবিশ্বাস্য উদ্ভট চরিত্রের ক্ষেত্রে grotesque কথাটা প্রয়োগ করা হ'ত। "Grotesque has come to be applied to any fanciful combination of ideas, or to any extravagant and absurd representation or appearance."[৬] অবশ্য উৎস-ক্ষেত্রে grotesque ছিল আর্টের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। Grotesque ছিল "Style of painting found in anct crypts, crypte or grotto, in art a capricious and incongruous style of decoration, in which human figures, animals, flowers and fruits are all fantastically mingled in wild confusion.

The style was used in the 13th century and rediscovered during excavations made in the bath's of Titus."[৭]

৬. Everyman's Encyclopaedia ; 6th volume.

৭. Everyman's Encyclopaedia ; 6th volume.

Painting-এর এই grotesque-style ইংরেজী সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়েছিল রেনেশাঁসের যুগে; এবং ইংরেজী সাহিত্যের লেখকগণের হাতে সাহিত্যের একটা বহিরঙ্গ-শৈলী হিসেবেই তা ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা এর সাহায্যে কখনও রচনায় ভীতি বিস্ময় জাগিয়েছেন; কখনও রূপকথার মোহাবেশ সৃষ্টি করেছেন; কখনও বা grotesque কাজ করেছে রূপকের কাজ। আবার কখনও বহিরঙ্গে লেখক grotesque কল্পনা এনেছেন ছদ্মবেশ করে, অন্তরঙ্গে প্রকাশ করেছেন তীব্র আঘাত-ব্যঙ্গকে. গভীর বক্তব্যকে। grotesque কল্পনা দিয়ে একটা স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত হাস্যধারা সৃষ্টিতে প্রাক্ উনিশ শতকের ইংরেজ লেখকগণ সচেতন উৎসাহে কলম ধরেন নি।

সেক্সপীয়র grotesque-style গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কোন কোন চরিত্র কল্পনায়, কোন কোন চরিত্রের আচরণে 'grotesque-composition' রয়েছে। যেমন "The Tempest"-এর Caliban চরিত্র। কিন্তু Caliban পাঠককে বিন্দুমাত্র হাসায় না। সে প্রাকৃতিক শক্তির রূপক। 'As You Like It'-এর Touchstone-এর মধ্যে grotesque আচরণ রয়েছে। তার আচরণ আমাদের হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু পরমুহূর্তে তা গভীরতম ভাবনায় লীন হয়েছে। Touchstone বাইরে লঘু, অন্তরে গভীর। সেক্সপীয়রের সাহিত্যজগতে উচ্চ হাসি আছে, কিন্তু অবিমিশ্র প্রসন্ন হাসি নেই। 'A Midsummer Night's Dream'-এর পরীরা মাটিতে অবতীর্ণ হয়ে যে হাসি সৃষ্টি করেছে সেখানেও grotesque ভাবনা এসেছে বহিরঙ্গে। 'A Midsummer Night's Dream'-এর ফলশ্রুতি puckish হাসির ফলশ্রুতি। একটু অনিষ্ট করে, একটু পীড়ন করে, স্বাভাবিক সুখী জীবনটাতে এক ফোঁটা অনিষ্টের রস ঢেলে দিয়ে তাকে ওলটপালট ক'রে, এ-হাসির সৃষ্টি। 'mischieous delight' হচ্ছে puckish হাসির প্রাণশক্তি।

সপ্তদশ শতকে Dryden, Pope তাদের satire-এর যে 'allegorical framework' সৃষ্টি করেছেন, সেই রূপাঙ্গিকে grotesque ভাবনা লক্ষ্য করতে চাইলে লক্ষ্য করা যায়। এবং তা স্মিতহাস্য সৃষ্টি করে। কিন্তু কি Dryden-এর 'Hind and the Panther' অথবা Pope-এর 'Town Mouse and the Country Mouse'—এদের grotesque-style-এর নীচে তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষ, তীক্ষ্ণ কটাক্ষ স্পষ্ট। তাঁরা নাগরিক জীবনের ওপর,

সমকালীন রাজনীতি ও সমাজের ওপর মর্মান্তিক তির্যকতায় বুদ্ধিমিশ্রিত ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত হেনেছেন। grotesque কল্পনা দিয়ে প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টি তাঁদের স্বভাববিরুদ্ধ।

Swift এই grotesque-কে সাহিত্যের বহিরঙ্গ style করে প্রয়োগ করেছেন। 'Gulliver's Travels'-এর হাসি আনন্দকর। কিন্তু অন্তরে যে এ-গ্রন্থ বিদ্রূপ ও শ্লেষে বিষাক্ত, তা সর্বজনস্বীকৃত। সমগ্র মানবজাতিকে অপমান করবার জন্য Swift grotesque কল্পনার এই কাহিনী রচনা করেছেন।

বস্তুত উনিশ শতকের পূর্বে ইংরেজী সাহিত্যে grotesque কল্পনা দিয়ে অবিমিশ্র হাস্যসৃষ্টির কোন সচেতন প্রয়াস ও উৎসাহ দেখা যায় নি। তবে সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে অনেকেই যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা থেকে প্রমাণিত হয় যে উদ্ভট বা খেয়ালী কল্পনা-আচরণের প্রতি আমাদের দৃঢ়মূল ও স্বাস্থ্যকর একটা কৌতূহল রয়েছে।

উনিশ শতকেই ইংরেজী সাহিত্যে Edward Lear (1822—1888), Charles Lutwidgs Dodgson (Lewis Carroll 1833—1898) সচেতন ভাবে grotesque কল্পনাকে সাহিত্যের বহিরঙ্গ অবস্থান থেকে নামিয়ে অন্তরঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন এবং তার সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্যে হাস্যরসের নতুন একটা ধারা সৃষ্টি করলেন। অবশ্য উনিশ শতকেই Robert Browning-এর (1812—1889) মধ্যেও grotesque কল্পনা উল্লেখযোগ্য ভাবে এসেছে। কিন্তু সচেতন কোন হাস্যধারা রচনায় তিনি যে উৎসাহী ছিলেন, তা নয়। তাঁর কবিধর্মের বৈশিষ্ট্যই হল, যেখানে সৃজনশক্তির প্রকাশ দেখেছেন, সেখান থেকেই তিনি অশেষ ঔৎসুক্যে আনন্দ আহরণ করতে তৎপর হয়েছেন। সে Caliban-এর grotesque-structure হোক, অথবা "his own plaster cast in Florence (smashed to atoms as soon as finished)" হোক, কিংবা "The swiftly emerging conception in Fra Lippo's mind" হোক। এই ঔৎসুক্যের পথেই grotesque-style তাঁর মধ্যে এসেছে। এবং সেই সূত্রেই 'The Pied Piper of Hamelin'-এর মত উদ্ভট কল্পনার 'wild infectious gaiety' সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই রচনায় Mayor এবং Corporation-এর ওপর যদি কোন ইঙ্গিত বা আসক্তি এসে থাকে, তা কিছুই প্রমাণ করে না। কিন্তু Browning-এর পূর্বকথিত শিল্পিস্বভাব

grotesque কল্পনা দিয়ে স্বতন্ত্র একটি হাস্যধারা সৃষ্টির উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হয় নি।

Lear এবং Carroll-ই ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম সচেতন ভাবে grotesque ভাবনা দিয়ে স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট একটি হাস্যধারা রচনা করলেন। উনিশ শতকের গভীর গূঢ় চিন্তাভাবনার মধ্যে, উপদেশ-নীতি-যুক্তিতর্কের মধ্যে এবং উনিশ শতকের যন্ত্রযুগের মধ্যে ইংরেজ পাঠককে এঁরাই অদ্ভুত অসম্ভব কল্পনার রাজ্যে নিয়ে এসেছেন অনাবিল হাসির বেপরোয়া আনন্দ দিতে। Lear এবং Carroll-এর কথা বলতে গিয়ে Legouis এবং Cazamian মন্তব্য করেছেন, —ইংরেজ পাঠকদের কাছে "delightful relief of the absurd" নিয়ে এলেন Lear এবং তাঁর সঙ্গে Carroll।[৮]

Edward Lear-এর Nonsense Verse থেকে একটি উদাহরণ,

—There was an old Man who said, "How
Shall I flee from that horrible cow ?
I will sit on this stile, and continue to smile
Which may soften the heart of that cow."

গোরুর গুঁতো থেকে বাঁচবার জন্য মুচকি মুচকি হাসতে থাকা—এ এক অভিনব অদ্ভুত উপায়। ছয় থেকে ষাট বছরের পাঠক কল্পনার এই উৎকেন্দ্রিকতার হাসি উপভোগ করবেন। Carroll-এর 'Alice's Adventures in Wonderland'-এর হাসি ইতস্তত বিকীর্ণ সমাজচেতনা ও ইঙ্গিত কটাক্ষকে কল্পনার উদ্ভটতার মধ্যে সামঞ্জস্যে বিধৃত করে grotesque-এর যে এক স্বতন্ত্র হাস্যধারা রচনা করেছে, সাহিত্যের জগতে তা অম্লান আনন্দের সম্পদ।

ইংরেজী সাহিত্যে যেমন, বাংলা সাহিত্যেও উৎকল্পনার হাসি উনিশ শতকের সৃষ্টি এবং বলা যাবে উনিশ শতকের শেষ দশকের। প্রাক্ উনিশ শতক প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যেও উৎকল্পনার বিস্তার ছিল। কিন্তু তা কোথাও শিল্পিমনের সচেতন হাস্যসৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে বা রূপকের বাইরে রূপ হয়ে দেখা দেয় নি। অতিরিক্ত তা পাঠক ও শ্রোতার মনে কখনও আবাল্য সংস্কারকে, কখনও ভয়-ভক্তি-বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলে অলৌকিক হয়ে পড়েছে।

প্রথম বাংলা রচনা চর্যাপদে সিদ্ধাচার্যগণের ধর্মতত্ত্বের একনিষ্ঠার মধ্যে হাসি

৮. History of English Literature—(New Edition) P 1159

সৃষ্টির অবসর ছিল না। তবে চর্যার দেহে কোন কোন উপমারূপকে আপাত-দৃষ্টিতে উৎকেন্দ্রিকতা রয়েছে। যেমন — 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খা-অ।"

"বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে।"

এ ধরণের উদ্ভট কথা অধরোষ্ঠে হাসির বঙ্কিম রেখা সৃষ্টি করে। কিন্তু এই উৎকেন্দ্রিকতা অন্তরে ঢেকে রেখেছে গভীর কথাকে। অন্তর-কপাট খুলে গেলে দেখা যায়, উৎকেন্দ্রিকতা গভীর ধর্মতত্ত্বের কথায় প্রবেশের দ্বার। যেমন 'রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খা-অ'—এই অসম্ভব কথা ব'লে কবি বোঝাতে চান যে গুরুর উপদেশে কুম্ভক সমাধির সাহায্যে দেহতরুর ফলস্বরূপ চিত্তকে নিঃস্বভাব করা যেতে পারে। অথবা "বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে" ;—এখানে বলদ বলতে বোধিচিত্ত ; নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা গাভী বলা হয়েছে। সক্রিয় মন থেকে রূপজগতের সৃষ্টি হয় বলে বোধিচিত্তকে বলদ বলা হয়েছে। 'বলদ প্রসব করে' অর্থে রূপজগতের সৃষ্টি করে। আর এই চিত্তই যখন অচিত্ততায় লীন হয়ে নৈরাত্মতা লাভ করে তখন দৃশ্যাদির জ্ঞানও তিরোহিত হয় ব'লে নৈরাত্মাকে বন্ধ্যা গাভী বলা হয়েছে।

এই তত্ত্ব ব্যাখ্যার পর পূর্বের স্মিত হাস্যরেখা ধর্মীয় চেতনার গভীরতায় মিলে গম্ভীর হয়ে ওঠে। চর্যাপদে উৎকল্পনার হাসি কোথাও দেখা গেল না।

কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতার হাসিসৃষ্টি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও সম্ভব ছিল না। চণ্ডীমঙ্গলে বাঙ্গালদের নিয়ে, সতীন সমস্যা নিয়ে, মুরারি শীল ও ভুবলার আচরণ নিয়ে কৌতুক হাসি লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু উৎকল্পনার হাসি কোথাও নেই। মনসামঙ্গলের 'দেবখণ্ডে' দেবতার নীচতা, কোন্দল, দুর্বলতা হাসি জাগিয়েছে। 'নরখণ্ডে' মনসার হাতে চাঁদের এবং চাঁদের হেথালের কাছে চ্যাঙমুড়ী কাণী মনসার যে বিপর্যয়, তা কৌতুকের মুহূর্তপ্রকাশ ঘটিয়ে পরমুহূর্তে তাকে দৈবশক্তির ভীতি, এবং মানুষের দৈববিরোধিতার বিস্ময়-ভয় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। এর মধ্যে উৎকল্পনার হাসি দাঁড়াতে পারে নি। ভারতচন্দ্রে শিবের কামমত্ত চিত্রে, কিংবা হীরা মালিনীর চরিত্রে, অথবা চোরধরার ঘটনায় কৌতুক-হাস্য দেখা গেছে ; wit-এর পরিচয় রয়েছে ; কিন্তু উৎকল্পনার হাসি কোথাও নেই। ধর্মমঙ্গলে, মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বৈষ্ণবপদাবলীতে, শাক্তপদাবলীতে, জীবনীসাহিত্যে, গীতিকায় হাস্যরস উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা রামায়ণ মহাভারত-গ্রন্থে কুম্ভকর্ণ, হনুমান, শূর্পনখা, কীচক, ঘটোৎকচ, ভীমের

আচরণে হাসির অবসর রয়েছে। এদের আচরণ আধুনিক বুদ্ধির বিচারে অসম্ভব উদ্ভট মনে হতে পারে। কিন্তু এই দুই কাব্যের পাঠক তাকে উদ্ভট বলে কোথাও যে উচ্চহাসি হেসে উঠতে পারে নি, তার কারণ এসব ক্ষেত্রে সচেতন হাসি সৃষ্টির কোন চেষ্টাই স্রষ্টার ছিল না। বরং এরা প্রতীকী গুরুত্ব নিয়ে, মূর্তিমান শক্তিরূপে বিস্ময় ও আনন্দ সৃষ্টি করেছে। অতীতের পাঠকের ন্যায় বর্তমানের পাঠকের মনেও এদের আচরণ অলৌকিকতা, বিশ্বাস ও ভক্তি জাগ্রত করে মনে স্থান করে নিয়েছে। মধ্যযুগের রাজসভা ও জমিদারের বিলাস বৈঠকে বৈঠকীরসগল্পের একটি মৌখিক ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। সে ধারায় গোপাল ভাঁড়ের হাস্যরসিকতা বহু জনপ্রিয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের হাসিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'প্রগল্‌ভ বিদূষকের স্থূলতা ও অশ্লীলতা। মাঝে মধ্যে তা বুদ্ধি ও কৌতুকে উপভোগ্য'। মধ্যযুগের কি লিখিত ধারায় বা মৌখিক ধারায় হাস্যরস ইতস্তত বিকীর্ণ থাকলেও, কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতাজাত হাসি পাওয়া কঠিন।

তবে 'শিবায়নে' বিবাহ আসরে বর শিবের আচরণে হাসির যে প্রকাশ দেখা গেছে, তার মধ্যে উৎকল্পনার হাস্যের একটি উচ্ছল তরঙ্গ সফেন হয়ে উঠেছে। শিব বিয়ের আসরে উলঙ্গ হয়ে যে উদ্ভট রঙ্গ করলেন, কোন কালে, কোন দেশে কোন বর বিয়ের আসরে তা করেন নি, করতে পারেন না। উলঙ্গ শিবকে ও তাঁর ভূতদের বিয়ের আসরে নাচিয়ে শিবায়নকারগণ উচ্চহাসির রোল সৃষ্টি করেছেন। বহু পরে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'-য় শিবস্বভাবের উদ্ভট রঙ্গপ্রিয় এক বর বাংলাদেশে এসেছেন—

বর এসেছে বীরের ছাঁদে,
  বিয়ের লগ্ন আটটা,—
পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে,
  গালেতে গাল পাট্টা।
শ্যালীর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে
  আলাপ যখন উঠল জমে
রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে
  মাথায় মারলে গাঁট্টা।
শ্বশুর কাঁদে মেয়ের শোকে,
  বর হেসে কয় "ঠাট্টা"।

আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় মানুষটিকে আমাদেরই মত আচরণ করতে দেখলে আমরা তাকে নিকটের ভেবে এক উদ্গত আনন্দ বোধ করি! কিন্তু নৈকট্যের সেই আনন্দ আমাদের মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর অতিউচ্চ আসনখানি। তাঁর এই সাধারণ মানবসুলভ আচরণ দেখে আমরা আনন্দিত হই। শিবায়নের এই হাসির মধ্যেও কৃতাঞ্জলি ভক্তমনের এই অন্তরশায়িত ক্রিয়াটি লক্ষ্য করা যায়। ভগবান শিব কৈলাস থেকে আমাদের দুঃখসুখের সংসারে নেমে এসে মানবায়িত হয়ে উঠলেও তিনি যে ভগবান দেবাদিদেব, এ-কথাটি তাঁর এক একটি মানবীয় আচরণের তলে স্মরণ করতে আমরা আনন্দ পাই! বরং এই ভাবনাটুকু তাঁর মানবীয় আচরণকে দেখবার একটা বিশেষ দৃষ্টি এনে দিয়েছে। শিবের পাগলামো দেশের মনে এক সপ্রেম, সশ্রদ্ধ ভক্তিনত হাসিতে স্বীকৃতি পেয়েছে। সেই পাগল ভোলানাথের বিয়ের আসরে এই উদ্ভট রঙ্গ দেখে হাসতে গিয়ে মনে পড়ছে, এ রঙ্গ করছেন সর্বশক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেব। সেক্ষণে আমাদের হাসির মধ্য দিয়ে ভগবানের চরণে আমাদের প্রেম ও ভক্তি একখানি নিবেদনের অঞ্জলিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সমগ্র মঙ্গলকাব্যেই মানবীয় আচরণের ওপর দৈবভাবনার ছায়াখানির কম্পন রয়েছে। তার থেকে আলাদা করে মঙ্গলকাব্যকে দেখা যায় না। 'শিবায়নে' শিল্পীর সচেতন মন থেকে উৎকল্পনার হাসি সৃষ্টি তাই ছিল অসম্ভব। সমগ্র গ্রন্থের মঙ্গল ভাবাবহে একটি বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মত এই উদ্ভট কল্পনার হাসিটি জেগে উঠেই ফেটে গেছে।

মধ্যযুগের পরিবেশে ইতিহাসের নির্দেশেই স্রষ্টামনের সচেতনতা থেকে উৎকল্পনার হাসি কোথাও উৎসারিত হয়নি ; তার উপস্থিতি ছিল অসম্ভব।

তুর্কী ও মুসলমান আক্রমণে বিপর্যস্ত মধ্যযুগের ভীত, আত্মশক্তিতে আস্থাহীন, পাণ্ডুর সমাজপটে সামাজিক মানুষ অলৌকিকতার দৈবময়তায় প্রবল বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। তাদের মন ছিল দৈবাশ্রয়ের আকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পিত। তুর্কী আক্রমণের প্রথম পর্যায়ের আঘাতে ও অগ্নিদাহে বাঙালী জীবন প্রাণভয়ে, ধর্মসংস্কারের বিলোপের ভয়ে, নীরক্ত পাণ্ডুর ও আতঙ্কগ্রস্ত হল। সমাজ-মনে এই যে গভীর আতঙ্ক দেখা দিল, তার রেশ ইলিয়াসশাহী, হুসেনশাহী শাসনব্যবস্থার সুস্থিরতার মধ্যেও মন থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেল না। আত্মশক্তিতে আস্থাহীন, স্বধর্ম ও স্বপ্রাণ রক্ষায় অপারগ বাংলা সমাজ ও মন দৈবশক্তির আশ্রয়ে সকল রকম নিরাপত্তা চাইল। পাঠান শাসনের পর

মোঘল শাসনাধীনের বাংলা থেকে এই আতঙ্ক এবং আত্মশক্তিতে এই আস্থাহীনতা দূর হবার তেমন সুযোগ ছিল না। মোঘল শাসনাধীনে বাংলার সমাজ ও জীবন রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে পড়েছিল। পাঠান শাসকেরা ক্রমশঃ মনেপ্রাণে বাঙালী হয়ে উঠলেও, মোঘল শাসকেরা বাঙালীর কাছে বিজাতীয়ই রয়ে গিয়েছিলেন। এই শাসনব্যবস্থায় পূর্বের দৈবাশ্রয়াকাঙ্ক্ষী বাঙালী সমাজ ও মন দৈবশক্তির কাছেই জীবনের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলবিধানের প্রার্থনায় আত্মসমর্পণ করেছে। এই তীব্র দৈবনির্ভরতা থেকে ধর্মে ও অলৌকিকতায় বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের তৃপ্তি মধ্যযুগে প্রবল হয়ে উঠেছে।

উৎকল্পনার হাস্যরস, বিশ্বাস ও সমর্পণের এই উদ্বেলিত পরিবেশে সম্ভব নয়। উৎকল্পনার হাসির মূলে রয়েছে তীব্র আত্মপ্রত্যয়। অলৌকিক বিশ্বাস ও দৈবময়তার ছায়া না ফেলে, সংস্কারের দোরদালানে মাথা নত না করে, অথচ দেবতা, অপদেবতাকে সম্ভব-অসম্ভবকে উৎকেন্দ্রিকতার আকাশে তুলে নিয়ে হাসি দিয়ে তাকে যা খুশি করে তোলেন হাস্যস্রষ্টা। একটা অদম্য আত্মপ্রিয়তা ও আত্মগৌরব নিয়ে, কল্পনা ভাবনার স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে, সকল রকম বিশ্বাস-সংস্কারের আকর্ষণ অস্বীকার করে উৎকল্পনার হাস্যরসের রথ চলে। মধ্যযুগের বাংলার এই সমাজভূমিতে স্রষ্টার এই আত্মগৌরব, এই স্বেচ্ছাচারিতা, বিশ্বাসকে অবিশ্বাস দিয়ে নাকচ করবার এই শক্তি ছিল অসম্ভব। ফলে কল্পনার অসম্ভবতার হাস্যরস সৃষ্টি মধ্যযুগে অনুপস্থিত। 'কমলে কামিনী'র অসম্ভবতাকে স্বয়ং সিংহলরাজ বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসাতীত ঘটনাকে বিশ্বাস ও ভক্তির অনুলেপে অলৌকিক সত্য করে তুলেছেন। সিংহলরাজ তখন শুধু বিশ্বাস করলেন, তা নয়; পূর্বের অবিশ্বাসের শাস্তি মেনে নিলেন ধনপতিকে মুক্তি দিয়ে এবং কন্যাকে শ্রীমন্তের হাতে সমর্পণ করে।

মধ্যযুগের সমস্ত রকম অসম্ভব কাহিনী-কল্পনা. এবং কাহিনী-চরিত্রের অবিশ্বাস্যতা ও অসংগতি এইভাবে ভক্ত-মনের সমর্পণ ও নতি আশ্রয় করে অলৌকিক সত্য হয়ে উঠেছে। ফলে উৎকল্পনার হাসি মধ্যযুগে কোথাও উদ্ভিন্ন হতে পারে নি।

শিবায়নের মত 'গোপীচন্দ্রের গানে' উৎকল্পনার হাসির আরেকবার স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। বুড়ী ময়না ও গোদাযমের আচরণে এই হাসি উদ্ভিন্ন।

গোদাযম এসেছে রাজার আত্মা নেবে বলে। ময়না যমের উপস্থিতি বুঝতে পেরে তার হাতে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিয়ে বলল—

"পাঁচশ টাকা দিলাম বেটা তোকে নাড়ু খাইবার।"

যম চাকুরিজীবী। পাঁচশ টাকার প্রলোভন সে এড়াতে পারল না। টাকা খেয়ে যম পড়ল উভয় সঙ্কটে। একদিকে তার চাকুরী বজায় থাকে না, যদি রাজার প্রাণ না নেয়। অপরদিকে টাকা খেয়ে রাজার প্রাণ নিলে বুড়ি ময়না ধরে। গোদাযম এই উভয়সঙ্কটে বিষণ্ণ—

"কি চাকরি দিলে বিধাতা ভোলা মহেশ্বর।"

গোদাযম রাজার 'জীউ' নিতে আবার এলো। ক্রুদ্ধ ময়না হুঙ্কার দিয়ে উঠল—

"এক জীবের বদল কত জীব দিলাম সাজেয়া
তবুও আমার সোয়ামির জীউ আনছিস বান্ধিয়া॥
ক্রুদ্ধ হইয়া বুড়ী ময়না ডাঙ্গাইতে লাগিল।"

ময়নার মার খেয়ে গোদা যম ময়নাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে কবুল করল। সর্বশক্তিমান যমদেবতাও চাকুরিজীবী, এই কল্পনাই প্রচণ্ড হাস্য-উদ্রেককারী। তার ওপর যমের এই অসহায় অবস্থা দেখে হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

হাসি উচ্চগ্রামে উঠল যখন ময়না ও যমের লড়াইটা আরও তীব্র হ'ল। যম কবুল করলেও চাকুরি বজায় রাখতে কবুল ভাঙল। রাজার 'জীউ' নিতে যম এল। 'ধেয়ানে' যমের উপস্থিতি জানতে পেরে বুড়ী ময়না গোদা যমকে তাড়া করল। গোদাযম 'ইন্দুর' হ'ল। ময়না 'লক্ষ গোণ্ডাবার বিলাই' হয়ে ইন্দুর গিলল। ময়নার 'বাম গাল্সি দিয়া বেটা পড়িল হস্কিয়া', এবং সঙ্গে সঙ্গে 'কইতর' হয়ে গোদাযম সগ্গে উড়ে গেল। ময়না হাড়িয়া বাজ হয়ে যমকে তাড়া করল। যম হল 'সর্প'; ময়না ঘুঘু-কইতর হল। এমনি করে বুড়ী ময়না গোদাকে একসময় বাগে আনল। এবং বাগে পেয়ে,

"চামের দড়ি দিয়া বেটাকে ভিড়িয়া বান্দিল
নোয়ার মুদগর দিয়া বেটাক ডাঙ্গাইতে লাগিল।
ঘোড়ার লাগাম দিলে বেটার মুখ্খে তুলিয়া
এক লম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িলা।

লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে লাগিল।
এক ডাঙ্গ, দুই ডাঙ্গ, তিন ডাঙ্গ দিল।
মাও দাও দিয়া গোদা কান্দিতে লাগিল।"

মর্ত্যের বুড়ী ময়নার হাতে স্বর্গের সর্বশক্তিমান যমের এই নাকাল ও কান্নার মধ্যে কল্পনার যে উদ্ভটতা আছে, তা হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তোলে।

যম ময়নার হাত থেকে পালিয়ে যমরাণীর আশ্রয় নিয়ে কেঁদে পড়ল,

'হাত ধরি যমরাণী পাও ধরি তোর
তোমার ধর্মের দোহাই লাগে আমার প্রাণ রক্ষা কর।"

যমরাণী গোদাযমের নাকালে মনে মনে তুষ্ট। মুখে স্পষ্ট বলল—

"কেনে যম কান্দিস জংলামি করিয়া।
বিলাদ হইতে যদি আচ্ছিস চলিয়া॥
এক কলকি তামু যদি আমি নাই দেই সাজোয়া
তার জন্যে মারছিস আমাক লোহার মুদ্গর দিয়া।"

যমরাণী তার এতদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ প্রকাশ করল। তবু যমরাণী যে গোদাযমের রাণী। শেষে দয়া হল। তখন "বিছানার খেড় দিয়া যমকে কোনো বাড়িতে ঢাকিয়া রাখিল"।

সমগ্র মধ্যযুগে এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে উচ্ছ্বসিত হাস্যরস দেখা গেছে এই কাহিনীতে। গোপীচন্দ্রের গানে যমকে নিয়ে এই কাহিনীর কল্পনা দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' এবং ত্রৈলোক্যনাথের 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'র উদ্ভট কাহিনীর উচ্ছ্বসিত হাসিকে মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু তাঁদের সঙ্গে গোপীচন্দের গানের প্রভেদ এই যে দীনবন্ধু ও ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিক কল্পনা দিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রাঞ্জল হাসি সৃষ্টি করবার জন্যই সচেতন ভাবে কলম ধরেছেন। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গানে হাস্যসৃষ্টির সেই সচেতন প্রয়াস নেই। ময়নার মন্ত্র-তন্ত্র-শক্তি তথা গুরুর অলৌকিক শক্তির ক্ষমতা কত তীব্র, লোকমানসে তা প্রতিষ্ঠিত করাই কবির সচেতন উদ্দেশ্য। গুরুবাদের সে-উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ময়নার শক্তির কাছে যমকে খর্বশক্তি করেছেন কবি। সেদিনকার আসরের শ্রোতাদের মধ্যে গুরুর শক্তির ওপর বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল ; এবং তা ছিল বলেই গোপীচন্দ্রের গানের কবি গুরুশক্তির কাছে দেবশক্তিকে হাস্যাস্পদ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। শ্রোতৃগণও গুরুশক্তির কাছে দেবশক্তির লাঞ্ছনা

দেখে গুরুবাদে গভীর বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছে। গুরুবাদী কবির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। যে যম মানুষকে বিচ্ছেদ বেদনা এনে দেয় তার লাঞ্ছনা দেখে মানুষ যে খুশী হবে তা সহজ মনস্তত্ত্বসম্মত। এবং গুরুর শক্তি যখন যমের ক্রোধ থেকেও রক্ষা করতে পারে, তখন তার খুশি নির্ভয় হাস্যে প্রকাশ পেতে দ্বিধা করে না। গোপীচন্দ্রের গানে দেবতার ওপর বিশ্বাস খর্ব হয়েছে, কিন্তু গুরুর শক্তির ওপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে। গুরু দেবতা হয়ে উঠেছে। গুরুবাদের অঞ্চলখানা অপসারিত করে দেখলে বলা যায়—বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার উৎস 'গোপীচন্দ্রের গান' থেকেই চিহ্নিত। কিন্তু গোপীচন্দ্রের গানে কবির কল্পনার সঙ্গে গুরুবাদের অঞ্চলখানা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে এক থেকে অন্যকে পৃথক করা যায় না। আর সে কারণেই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গোপীচন্দ্রের গানের হাসির মধ্যেও উৎকল্পনার হাস্যরসের সচেতন স্ফূর্তি নেই।

বাংলা সাহিত্যে এই হাসি উনিশ শতকের শেষার্ধের ফসল। শেষার্ধ বলতেও নবম দশকের পূর্বে সম্ভব নয়। প্রাক্ ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই হাসির অনুপস্থিতির যেমন কারণ দেখাবার চেষ্টা করা গেছে, উনিশ শতকের নবম দশকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাসির সম্ভাবনা না থাকার কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে উনিশ শতকের যুগ কর্মমুখর গুরুত্ব গভীরতার যুগ। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে জাতি আত্মসন্ধানে রত। আত্মবিচারণা ও আত্মচৈতন্যলাভের চেষ্টা জাতীয় মানসে। অবশ্য এই কর্মমুখরতা বাংলার সমাজ বলতে নগর কলকাতাকেই প্রধানতঃ কেন্দ্র করে ঘনিয়ে উঠেছিল। নবযুগের এই সঙ্কীর্ণ নগরকেন্দ্রিকতা বৈশিষ্ট্য। রামমোহনে এই নবজাগরণের দীক্ষার অরুণাভ উষালগ্ন। এই বিরাট ব্যক্তিত্ব অগ্রসর হয়েছেন ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়ে জাতির বলিষ্ঠ সংহতি সৃষ্টির জন্য। রামমোহনে কর্মমত্ততার যে প্রভাতারম্ভ, বিদ্যাসাগরের হৃদয় ও বুদ্ধির ভারসাম্যে তার ক্রম-তীব্ররূপ। এই দুই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে অনুকূলে প্রতিকূলে বহু গ্রহ উপগ্রহ উনিশ শতকের বাংলাকে আলোড়িত করে তুলেছিল। রামমোহনের ১৮১৫তে আত্মীয়সভার স্থাপনা, ১৮১৭তে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮২৮এ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, সতীদাহ ও সহমরণ প্রথার নিবারণে রামমোহনের চেষ্টা, এবং তার প্রতিবাদ, ১৮২৯এর ডিসেম্বরে সরকারের এই প্রথার অবৈধতা ঘোষণা এবং এই

সরকারী ঘোষণার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ, প্রগতিশীল হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ, ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্ভব, ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে ১৮৩০এর ধর্ম-সভার সংস্থাপনা, নারীশিক্ষার প্রবর্তন—সব কিছুর মধ্য দিয়ে বাঙালীর সমাজ ও জীবনে নতুন গতিশক্তি, নব জীবনবাসনা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে এই আন্দোলনের আবেগ প্রবল হয়ে দেখা দিলেও চতুর্থ দশক থেকে আন্দোলন সুচিন্তিত ও ধীর কর্মময় পথে অগ্রসর হয়েছে। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই কর্মমুখর গুরুত্ব গভীরতার ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি ঘোষণা করে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, 'বলিতে কি, ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটনি, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ ও ব্রাহ্মসমাজে নবশক্তির সঞ্চার ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাজকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিল" [৯]।

এই 'প্রবলরূপ আন্দোলিত' সমাজমানস উনিশ শতকের সাহিত্যকে আশ্রয় করে তীব্রমুক্তি পেল। ইউরোপের ইতিহাসে সপ্তদশ শতককে অধ্যাপক হোয়াইটহেড্ যেমন বলেছেন, 'The century of genius', অর্থাৎ 'প্রতিভার যুগ', বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে উনিশ শতক এই প্রতিভার যুগ। সাহিত্যে এই প্রতিভা কর্মমত্ততায়, বুদ্ধির তীব্রতায়, মননশীলতার সংস্কারমুক্ত ঔজ্জ্বল্যে, হৃদয়ের প্রকাশ চেষ্টায়—একটা ব্যাপক গঠনকর্মে ব্রতী হল। সাহিত্যের সকল শাখায় জাতির এই কর্মব্রত এবং জীবনাগ্রহ রূপ পেল।

বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হল এই আত্মচৈতন্যের কর্মরূপ থেকে। রামমোহনের হাতে বাংলা গদ্য পূর্ণাবয়ব না পেলেও কর্মবীরের চেতনার বন্ধুরতা বহন করে বাংলা গদ্য সম্ভাবনাময় পথে যাত্রা শুরু করল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যে স্থূল উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে গঠন মানসিকতার চেষ্টা। বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে হৃদয় ও বুদ্ধির ভারসাম্যে বাংলা গদ্য যে পূর্ণগঠিত হয়ে সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠল, তার মধ্যে জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার শঙ্খনাদ শোনা গেল। সাময়িক সংবাদপত্রে জাগ্রত জাতির আত্মসন্ধান, আত্মবিচারণা ও সমাজচেতনার

[৯] শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ীও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

অভিব্যক্তি দেখা দিল। সব্যসাচী বঙ্কিম তীব্র তীক্ষ্ণ মনন নিয়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কর্মে এগিয়ে এলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনের গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে উনিশ শতকের বাংলার সাহিত্য ও সমাজ মননশীলতার গভীরতায় প্রতিষ্ঠা পেল। উনিশ শতকের বিরাট সাহিত্য-ধনুখানার একদিকে রামমোহন বিদ্যাসাগরে প্রোথিত, আরেকদিক বঙ্কিমচন্দ্রে। এই শতকের সাহিত্যের নানা শাখায় তারই জ্যা-নির্ঘোষ শোনা গেল। জাতীয় জীবনসংগঠনের সচেতন আকাঙ্ক্ষা থেকে নাটক এল। ইতিহাস চেতনায়, ভক্তিরসের সচেতন পরিবেশনায়, সমাজ সংস্কারের ও সামাজিক সমস্যা উপস্থাপনার বাসনায় নাটক গভীর গূঢ় হয়ে উঠল। আরেক দিকে প্রহসনের হাস্যরসের আড়ালে ব্যঙ্গের দহনে সমাজ সমস্যা উপস্থাপনা ও তার সংস্কার বাসনা দেখা দিল। এ-যুগের কাব্যও এই জাতীয়-সচেতনতার গভীরতা থেকেই রূপ পেল। রঙ্গলালের কাব্যের জাতীয়তাবোধে, মধু-হেম-নবীনের কাব্যের বুদ্ধিদীপ্ত জীবনবাসনায় এই গভীর গূঢ়তা স্পষ্ট। বিহারীলাল এবং ওই ধারার গীতি-কবিদের কবিতার গুঞ্জনে শোনা গেল হৃদয়গভীরতার স্থির আত্মময় নানামুখী ঝঙ্কার। উপন্যাসে ইতিহাসচেতনা এবং সমাজ সমস্যার উপস্থাপনায় ও সংস্কার সাধনে নবীন জীবনবাসনারই সচেতন গভীরতা প্রতিচ্ছবিত হল।

স্পষ্টতই উনিশ শতকের জীবনে, সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগ্রত জাতির এই আকাঙ্ক্ষিত আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যস্ততা, গভীরতা। সকল সৃজনশীল প্রতিভাই কর্মে দীক্ষা নিয়ে কর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের এই সচেতন কর্মব্রতের মধ্যে উৎকল্পনার ভারহীন উচ্ছল স্ফূর্তি সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য নির্মল হাসির কোলাহল উনিশ শতকের আকাশে বাতাসে ছিল না, তা নয়। কিন্তু সে হাসির পেছনে, শিল্পীর grave spirit, কর্মব্রতের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট। এই উদ্দেশ্য প্রকাশ করবার জন্য ইংরেজী সাহিত্যের grotesque-style-এর মতই উৎকল্পনা বহিরঙ্গ শিল্পকৌশল হয়ে এসেছে। তার তলায় কর্মব্রতই সুবিন্যস্ত, সমাজজীবনের অবুদ্ধি-দুর্বুদ্ধিকে আঘাত করে শোধন করার উদ্দেশ্যই স্পষ্ট প্রতিফলিত।

ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, মধুসূদন, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, বঙ্কিম, ইন্দ্রনাথ প্রমুখের যে হাসির কবিতা বা প্রহসন বা হাস্যরসাত্মক রচনা, তার মধ্যে হাসির কোলাহল তীব্র ও সরব। কিন্তু সমাজদেহের ও ব্যক্তিমনের সমকালীন

নানামুখী রোগের উপস্থাপনা, রঙ্গ-বিদ্রূপ-পীড়নে সে-রোগের চিকিৎসা করে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবার গভীর সচেতন চেষ্টা এদের হাসির আড়ালে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। উৎকল্পনা এদের হাসির বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গে কোথাও নেই।

বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে যে নির্মল হাস্যরস এনে দিলেন, তার সৃষ্টিতে তিনি মাঝে মাঝে উৎকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন, লোকরহস্যের 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল', 'হনূমদ্বাবুসংবাদ', 'স্বর্ণ গোলক'। কিন্তু লোকরহস্যের এই রহস্যে উৎকেন্দ্রিকতা এসেছে রচনার বহিরাঙ্গ কৌশল হয়ে—যেমন এসেছে Swift-এর ক্ষেত্রে। অন্তরভূমিতে বঙ্কিমের সমাজ সংস্কারক কর্মব্রতী মনন সমাজকে ও শ্রেণীবিশেষ মানুষকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ কটাক্ষে জর্জরিত করেছে।

সুন্দরবনে ভীমাকৃতি সব বাঘ মিলে, লেজে ভর দিয়ে বসে, মনুষ্যচরিত সম্পর্কে সভা করছে। সভাপতির প্রস্তাবকে হাউ মাউ করে অনুমোদন করছে, লাঙ্গুল চট্‌চটায় প্রশংসা করছে ও সভ্যরা ব্যাকরণ-শুদ্ধ অলঙ্কারবিশিষ্ট বিশুদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করছে এবং প্রবন্ধ পাঠের মাঝখানে স্বয়ং সভাপতি হরিণের গন্ধ পেয়ে বিষয়কর্ম উপলক্ষে চেয়ার ফেলে দৌড়চ্ছে—এরকম উদ্ভট কাহিনীর কল্পনা অবারিত হাসি সৃষ্টি করে। কিন্তু এই আপাত উৎকেন্দ্রিকতার তলে মানব-সমাজনীতির প্রতি যে বিদ্রূপবান নিক্ষিপ্ত হয়েছে, তার জ্বালা স্পষ্ট। লোকরহস্যের ভূমিকায় বঙ্কিম নিজেই স্বীকার করেছেন, সামাজিক দোষের প্রতি, শ্রেণীবিশেষ এবং সাধারণ মানুষের প্রতি ইঙ্গিত লোকরহস্যের রচনায় রয়েছে। 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এ এই ইঙ্গিত উৎকেন্দ্রিক কাঠামোর তলে লক্ষণীয়।

'হনূমদ্বাবুসংবাদ'-এ উৎকল্পনা এনেছেন বক্তব্যকে প্রকাশ করবার বহিরঙ্গ কৌশল হিসেবে, অন্তরে রয়েছে শ্রেণীবিশেষের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ কশাঘাত। বঙ্গদেশীয় মহিলার গর্ভে জন্ম নিয়ে যে বাবুশ্রেণী কোট টুপী পরিকৃত মোহন মূর্তি সেজে ইংরেজ বুলির তোড়ে ভেসে চলেন, তাদের গলদেশে বঙ্কিম হনুমানের লেজের পেঁচ কষিয়ে দিয়েছেন। বঙ্গদেশের এক বাবুর প্রতি গাছের এক হনুমানের এই সরস আচরণের উদ্ভাবনায় উৎকেন্দ্রিকতা রয়েছে। কিন্তু হনুমানের এই লেজের পেঁচ তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পেঁচ। বাবুশ্রেণীর গলদেশে এই পেঁচ কষিয়ে, বঙ্কিম তাদের টুপি-চশমা চাবুক ঘড়ি খুলে দিয়ে তাদের মুখ দিয়ে মাতৃভাষা বার করিয়ে শ্রেণীবিশেষের খোলসটাই খুলে দিয়েছেন।

'স্বর্ণগোলক' উচ্ছ্বসিত হাসির এক অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু 'স্বর্ণগোলকে'র

হাসিকে ঠিক উৎকল্পনার হাসি বলা যায় না। সেক্সপীয়রের 'Midsummer Night's Dream'-এর Puckish হাসির অনুরূপ হাসি 'সুবর্ণগোলকে'র হাসি। কালীকান্ত বসুর খুশির যাত্রাপথে সুবর্ণগোলকটাকে গড়িয়ে দিয়ে বঙ্কিম এক দারুণ ওলটপালট ঘটিয়ে দিলেন। গোলকের গুণ চিত্তবিনিময়। কালীকান্ত বসু গোলক হাতে নিয়ে ভাবছে—আমি রামা। খানসামা রামাকে ভাবছে কালীকান্ত বসু। রামা গোলক হাতে নিযে ভাবছে, আমি কালীকান্ত বসু, কালীকান্তকে ভাবছে রামা চাকর। গোলকের গুণে কালীকান্তবাবুর শ্বশুর বাড়িতে এক উদ্ভট কাণ্ড ঘটে গেল। যতক্ষণ গোলক গড়ালো ততক্ষণ হাসি উচ্ছ্বসিত। এই অঘটন ঘটনপটীয়ান শিবের গোলক যখন সংবৃত হল, সব কিছু শান্ত। আনন্দ সুখের পথে, খুশী মিলনের পথে এই যে অঘটন ঘটিয়ে হাস্যসৃষ্টি করা, একে ঠিক উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাসি বলা যায় না। 'সুবর্ণগোলকে'র অন্তরে বাহিরে উৎকেন্দ্রিকতার স্পর্শ রয়েছে, কিন্তু অন্তর বাহির উৎকেন্দ্রিকতার হাসিতে মুখরিত হয় নি। তার আরেকটি কারণ হাসির আড়ালে বঙ্কিমের ব্যঙ্গপ্রবণ, সংস্কারপ্রবণ মনটি উঁকি মেরে গেছে। 'সুবর্ণগোলকে'র উপসংহারে বঙ্কিম দুর্নিবার হাস্যকে রাশ টেনে থামাতে গিয়ে, এই হাসি সৃষ্টির উদ্দেশ্য যে সামাজিক দোষ দেখিয়ে দেওয়া, তা স্পষ্ট করে বলে দিলেন। মহাদেবের জবানীতে বঙ্কিম সামাজিক মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—"মহাদেব কহিলেন, 'হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ-কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ-সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।"

বঙ্কিমের হাস্যরসে উৎকেন্দ্রিকতার আবহ সৃষ্টি হলেও তা বহিরঙ্গ ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। তার কারণ বঙ্কিমের সমাজ-সংস্কারক কর্মব্রতী মন। সিরিয়স মনের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় উদ্ভিন্ন হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সূত্র ধরে লক্ষ্য করা যাবে, উনিশ শতকের

বাংলা সাহিত্য স্বেচ্ছায় যে কর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিল, তার রূপায়ণের ব্যস্ততার মধ্যেও কোন কোন লেখক একটু বিনোদন চেয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক প্রহসনের কর্মসাধনার মধ্যেও প্রসন্ন উচ্চহাসি সৃষ্টির ক্ষণিক আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। এই আকর্ষণ থেকে উৎকল্পনার এক কাহিনী তিনি রচনা করলেন। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ'—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দীনবন্ধুর চেতনা থেকে কল্পনার পাগলামো স্ফুলিঙ্গের মত একবার জেগে উঠে মিলিয়ে গেছে, আর তা জাগে নি।

দীনবন্ধুর সাহিত্যসৃষ্টির বিপুলতায় এই রচনাটি আয়তনে অতি ছোট। তা ছাড়া উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির ভাষাকে বিশেষ প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা লাভ করতে হয়। দীনবন্ধু তা আয়ত্ত করতে পারেন নি। 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ'-এর ভাষা সমাসবহুল, তৎসম শব্দসমৃদ্ধ, সন্ধিজটিল। ফলে হাস্যকর প্রতিবেশ গড়ে উঠলেও এবং কল্পনা ও হাসি স্থানে স্থানে বেশ দানা বেঁধে উঠলেও, গোটা রচনাটিতে উৎকেন্দ্রিকতার আনন্দ হাসি তেমন প্রাঞ্জল হয়ে প্রকাশিত হতে পারে নি। তথাপি এ-রচনা উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির দাবী রাখে। উৎকেন্দ্রিক কাঠামোর আড়ালে ব্যঙ্গবিদ্রূপের শূল ও শল্য নিক্ষিপ্ত হয় নি। হাসির তলে আঘাত বা বুদ্ধির দীপ্তি প্রকাশ করা লেখকের লক্ষ্য নয়। আঘাত থাকলেও তা উদ্ভট কল্পনার প্রসন্ন হাসিতে ম্লান হয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস সম্পর্কে যাঁরা আলোচনার পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের সন্ধানী ও রসজ্ঞ দৃষ্টি থেকে দীনবন্ধুর এই রচনাটি কেন বাদ পড়েছে, জানি না। এই রচনাটি অনেকের কাছে অপরিচিত বলেই এর কিছুটা পরিচয় দেবার প্রলোভন স্বাভাবিক এবং উৎকল্পনার হাস্যরসের ধারালোচনায় এই উদ্ধৃতি অবান্তর হবে না—

"একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য পর্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারী আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময় ; ফরাসী প্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্বে ক্রীতবিস্তীর্ণ ফরাসী গালিচা বিস্তারিত ; দেওয়ালে নৈপুণ্যকুশল শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব বিনির্মিত ঘুঘু ঘুড়ি। অশীতিহস্ত পরিমাণ আশীবিষসদৃশ বক্র নলসঙ্কুল আলবোলায় ধূম্রপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন—"অদ্যকার বিশেষ কার্য কি ?" প্রধান মুন্সী চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া জরুরী শব্দাঙ্কিত, বঙ্গদেশ হইতে

প্রেরিত দুইখানি সরকারী চিঠিপ্রাপ্তির সংবাদ দিলেন। চিঠি দুখানির একখানি লিখিয়াছেন শ্রীডেঙ্গুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা। তিনি লিপিতে সংহারনিবিড়-মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজকে জ্ঞাপন করাইয়াছেন যে কলিকাতার প্রায় সমুদয় লোক, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী, দীন, শিশু, স্থবির, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান তাহাকে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্যআর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেণ্ট তাহার অমিত তেজে অভিভূত। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই তিনি অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিতেছেন এবং সকল স্থানেই তিনি কৃতকার্য হইবেন।

লিপির মর্ম অবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেঙ্গুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে, তাঁহার বীরকীর্তিতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উপযুক্ত পুরস্কার প্রেরিত হইবে।"

তদনন্তর মুন্সীপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন। তাহার মর্মার্থ এই—লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমিদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদনগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁড়িদা মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গায় চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুয্যে একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির দ্বারা মাথাটি দোফাঁক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ এমত গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত হইল যে, যমরাজের দূতেরা এবং যমরাজের প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিশ ইন্সপেক্টরের লোকেরা তাহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারীবাড়ীর বড় আটচলার পশ্চিম পার্শ্বের কামরায় একখানি দড়ী দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত একখানি একপাটায় ঢাকা আছে, যদি পত্রপাঠ যমদূত প্রেরিত হয়, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা।

যমরাজ পত্রপাঠ উৎকলিকাকুল হইয়া চিত্রগুপ্তের সহিত পরামর্শ করনান্তর আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারীর বড় আটচলার পার্শ্বস্থ কক্ষে নায়েবের মৃতদেহ রক্ষিত হওনের পর, পতনবাবুর কর্মকারকেরা জানিতে পারিলেন, তৎ-সংবাদ পুলিসের সব-ইন্সপেক্টার জ্ঞাত হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটি স্থানান্তরিত করিল, চারপায়া খালি পড়িয়া রহিল।

লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের গোমস্তা কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুইটি তাম্র-মাদুলী। চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতিহীন নহে, নাসিকাটি লম্বা, নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর। গলায় স্বর্ণ তারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বীচিসদৃশ অক্ষমালা। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। রমানাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওয়নের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তিদূরমানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটিতে কালি, কলম, দোয়াত, চশমা, ছুরী, কাঁচি সকল রহিয়াছে। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটেখুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকাল মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; তাললয় বিশুদ্ধ ফরর-ফরর-ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজ প্রেরিত বাহকগণ এমন সময়ে আটচলায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণদ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চারপায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনানন্তর পুনর্বার চারপায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্বাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। কুড়রাম দেখিলেন আটজন জীর্ণ বাহক তাহাকে ঘেরিয়া আছে। তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জন গর্জন সহকারে কহিলেন, 'ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস্ না, আমি পতনবাবুর প্রধান পাটোয়ারী! এই দণ্ডে তোদের কাছারীবাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডবদাহন করিয়া যাইব। আমার প্রতাপে বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের মুনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আটজন বেহারার মধ্যে তিনজন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে

ঘুরিতে বৈতরণী-নদীগর্ভে পড়িয়া গেল, তিনজন কায়-পরিবর্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল। একজন উর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, একজন খট্বাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "এ কি ভীষণ ব্যাপার! কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল, "মশাই গো, এটা যমপুরী। মোরা নবঠাকুরকে আন্‌তি গিয়েছিলাম, তা ভুল ক'রে তোমাকে এনে ফেলিচি, মারামারি কর্‌বেন না, আর মোরে যা বলবেন, তাই করব।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগজ বাহির করিয়া একখানা পরোয়ানা লিখিলেন এবং দুইবার তিনবার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, "আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল।" বেহারা, "যে আজ্ঞা" বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

কুড়রাম তাঁহার বাক্সবাহক সমভিব্যহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন; যথা—

ইজ্যতছার শ্রীযমালয়াধিপতি কৃতান্ত,

মালব করি বা

শ্রীসদাশিব।

অপ্রকাশ নাই যে, ইতিপূর্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্বতন অপূর্ব কর্মদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ; গুণ্ডামী, ভণ্ডামী, ষণ্ডামী তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে; তোমার দ্বারা রাজকার্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্মণ্য, জমীদারের কয়েকজন অল্পবেতনভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়ে তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তিমাত্র অশেষ গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।"

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম অবগত হইয়া 'হা হতোঽস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দত্তজ মশায়, কখন চার্য লইবেন?' দত্তজ উত্তর দিলেন, "এই দণ্ডেই।" চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্যের কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া

উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্বক পারিষদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন।”

এর পরের কাহিনী; বিষণ্ণ যমদেব কি ক'রে লক্ষ্মীঠাকরুণের মধ্যস্থতায় নারায়ণ ও ব্রহ্মার স্নেহে সদাশিবের বাসকক্ষে উপস্থিত হলেন। যমরাণীর নবযম অভ্যর্থনার বেশবাস, কুড়রামের হৃৎকম্পন, লক্ষ্মী-নারায়ণের রসিকতা, ব্রহ্মার বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ সংশোধন, ইত্যাদি নানা ঘটনা কল্পনার চরম উৎকেন্দ্রিকতায় হাস্যস্পন্দিত হয়েছে।

“ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যমসমভিব্যাহারে সদাশিবের বাসকক্ষে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রাতঃকাল, সময় আটটা। মহাদেবের পূর্বরাত্রে ষাঁড়ের ঘরের ঝুলসহ সিদ্ধিবাটা খাইয়া ঘোরতর নেশা হয়। নেশার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ ‘ব্রেভো নন্দী’ বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। দ্বিতীয়োদ্যমে অম্বিকার অঙ্গে ঢ'লে পড়িয়া বমনপ্রবাহে শয্যা ভাসাইলেন। পতিপ্রাণা পার্বতী খিড়কীর পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি ধৌত করিয়া, গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। প্রাতঃকালে পার্বতী পূর্বরাত্রের বৃত্তান্ত মহাদেবকে হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন। মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, “প্রেয়সি আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, অপরাধ মার্জনা কর।” মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু যম সমভিব্যাহারে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সদাশিব প্রসন্নমনে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যম, এমন ম্রিয়মান কেন?” ব্রহ্মা কহিলেন, “আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত। উঁহাকে আপনার মার্জনা করিতে হইবে। আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। হে বদান্যতা-বীরাংনিধি, বগলাবল্লভ অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।” ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধহয় গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে।

আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয় মাত্র সমদ্ভূত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা এবং প্রস্রাব হয়। কিন্তু অদ্য জানিলাম চতুর্থ উপসর্গ হয়. সেইটি প্রলাপ।” ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ সদাশিব স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, “এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরট আমার স্বাক্ষর নহে।” যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি চার্য বুঝাইয়া দিয়াছ?” যম উত্তর দিলেন, “আজ্ঞা হাঁ।” বিষ্ণু কহিলেন, “কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদারকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে।” কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতুক জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেশিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত কুড়রাম সিংহাসন আসীন হইয়া তখন অকালমৃত্যু বেটাকে শৃঙ্খলদ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখিবার হুকুম দিতেছিলেন। এমন সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণ পূর্বক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘বাপু তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?” কুডরাম উত্তর দিলেন, “প্রভো, আমি লোচনপুর কাছারীর আটচালায় শয়ন করিয়াছিলাম। যমপ্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি অপরিচিত দেশে সহায় সম্পত্তিহীন হইয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম অবশেষে কাগজ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানাদ্বারা যমকে পদচ্যুত করিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জনা করিতে হইবে, বিশেষ ধ্যায়োন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখর নীলকণ্ঠ দক্ষযজ্ঞবিনাশন, মার্জনা করুন।” মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তরস্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারী বাড়িতে পৌছাইয়া দিই।”

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব

গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকী করিতে। একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কাণ্ডখানাটা দেখিলে তো? নাকে কানে খত দাও, আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না।" যমকে ভৎ‍র্সনা করিয়া ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারীবাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চারপায়ার উপর শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

এখানে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা স্বীকার্য। চরিত্র এবং ঘটনা হাস্যকর প্রতিবেশে লীন। "ব্রেভো নন্দী" বলিয়া মহাদেব হাসিয়া উঠিলেন—এই চিত্র বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্বাস্বাদিত চিত্র। হাস্যসৃষ্টির এই মেজাজ ও কল্পনা-শক্তি পরবর্তীকালে রাজশেখর বসুর মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। কাহিনীতে কল্পনার যে স্বর্গমর্ত্য উড্ডয়ন রয়েছে তা পাঠকমনে খুশির হাওয়া সৃষ্টি করেছে সহজেই; এবং তা হাসি-তাড়িত হযেছে। মহাদেবের নেশা, যমের অকর্মণ্যতার মধ্যে যদি ইঙ্গিত কিছু থেকে থাকে, তার ভার অনুল্লেখ্য। উৎকল্পনার হাসির উচ্ছ্বাসে তা ভেসে গেছে। কিন্তু উৎকল্পনার হাসির হাল্কা রথখানা ভাষার ওপর হোঁচট খেয়ে খেয়ে স্থানে স্থানে উচ্ছ্বসিত হাসি ও রসভোগ্যতাকে প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে যে বাধা দিয়েছে, তাও অস্বীকার করা যায় না। হয় তো এই ভাষা সৃষ্টি অনেকটা দীনবন্ধুর ইচ্ছাকৃত। সেদিনকার বাংলা সাহিত্যের কর্মব্যস্ততার মধ্যে ভারহীন ভাব নিয়ে হাসি সৃষ্টি করতে গিয়ে হয়তো তিনি গুরুগম্ভীর ভাষার প্রয়োজন বোধ করেছেন। আরেকদিকে প্রহসনের উদ্দেশ্য সচেতনতা থেকে দীনবন্ধু কল্পনার পাগলামোর বেপরোয়া হাসির মধ্যে যে কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন, সে মুক্তিক্ষেত্র তাঁর প্রতিভার অনায়াস ভূমি ছিল না বলেই এই ত্রুটি। উৎকেন্দ্রিক হাস্যসৃষ্টির চালটাও এইজন্য উঁচুদরের হয় নি। তথাপি বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসধারার প্রথম উল্লেখযোগ্য চরণপাত যে দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' রচনায় লক্ষ্য করা গেছে, তা অনস্বীকার্য। দীনবন্ধুর 'কুড়রাম' পরবর্তী ত্রৈলোক্যনাথের 'মিত্তিরজা'র পূর্বপুরুষ; দীনবন্ধুর 'যমরাজ' ত্রৈলোক্যনাথের কিঞ্চিৎকর্মণ্য যমরাজেরই বাবা-ঠাকুরদা।

দীনবন্ধুর বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক চেষ্টা বাংলা হাস্যরসে উৎকল্পনার উৎস সন্ধান দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে উৎকল্পনা হাস্যসৃষ্টির বহিরঙ্গ কৌশল হয়ে এসেছে, দীনবন্ধুর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য তা অন্তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেমন

পড়েছিল Edward Lear এবং Carroll-এর পূর্বে ইংরেজী সাহিত্যের grotesque হাসি কবি Browning-এর 'The Pied Piper of Hamelin'-এর মধ্যে।

কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের বিচারে উৎকল্পনার এই হাস্যরস সচেতনভাবে অন্তরে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে একটি স্বতন্ত্র ধারাপ্রবাহ নির্মাণের জন্য অপেক্ষা করছিল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের।

শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সমাজ আন্দোলন যে ধীর সুচিন্তিত কর্মের পথে চলেছিল, শতকের শেষের দিকে এই কর্মপথ সমাজ মানসে ধাতস্থ হয়ে এল। বাঙালীর জীবনাগ্রহ ও আত্মচৈতন্য সংহতি পেল। সমাজ ও সাহিত্যে অনেকাংশে এই সংহতি দান করে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কর্মবীর বিদ্যাসাগর তিরোহিত হলেন, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যকর্মী বঙ্কিমচন্দ্র তিরোহিত হলেন; মধুসূদন, রঙ্গলাল আরও পূর্বে তিরোহিত হয়েছেন। শতকের নবম দশকে হেম-নবীন আত্মস্থ হয়েছেন।

এই অপেক্ষাকৃত ধীর সংহত বাংলার সাহিত্যভূমিতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে খেয়ালী অসম্ভব কল্পনার প্রসন্ন হাস্যখচিত একখানা উচ্ছল, উজ্জ্বল রথ এসে দাঁড়াল। বাঙালীপাঠক দেখলেন, 'কঙ্কাবতীর রথে মানুষের সঙ্গে ভূতপ্রেত, পশুপক্ষী, রাক্ষস-খোক্কস; সমাজকথার সঙ্গে রূপকথা ইতিহাস-কথা, ভূগোল-কথা—এক অসম্ভব কাল্পনিকতার উজ্জ্বলরশিতে একত্রে বাঁধা পড়েছে।

এই রথখানি চালিয়ে নিয়ে এসেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের শেষ দশকের জীবন-সমস্যার উপস্থাপনার ও সমস্যার বিচার বিশ্লেষণের একটি সংহত ধীরবাহী ধারার পাশেই সম্ভব-অসম্ভবের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সীমারেখা-বিধ্বংসী উৎকল্পনার সচেতন হাসি নিয়ে এলেন প্রথম ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'র একই দেহে সমাজমনের এই দুইদিকের প্রতিফলন।

'কঙ্কাবতী'র পরিপূর্ণ গল্প দেহেরই প্রথম অংশ ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক বোধ ও বাস্তবচেতনার দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রথম অংশ সামাজিক উপন্যাস। দ্বিতীয় অংশে উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসি উচ্ছ্বসিত। 'কঙ্কাবতী'র প্রথম অংশের সামাজিক উপন্যাসের সুপরিচিত গল্প চরিত্রের পাশে দ্বিতীয় অংশে এসে বাঙালী পাঠক ভূতে-মানুষে, দেবতা-রাক্ষসে, মাটিতে-আকাশে, সমাজকথায়-রূপকথায়

একাকার উৎকল্পনার আনন্দ হাসি আস্বাদন করলেন। পাঠকের মধ্যে যে একটি উৎকল্পনাপ্রিয় মন আছে, ত্রৈলোক্যনাথ প্রথম সচেতনভাবে সেই মনটি জাগিয়ে দিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'কঙ্কাবতী' থেকেই বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের এক সচেতন ধারার সৃষ্টি হল।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

[ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়]

(১৮৪৭-১৯১১)

আলোচনার প্রাঞ্জলতার জন্য উৎকল্পনার হাস্যরসকে দুটি শাখায় বিভক্ত ক'রে দেখা যেতে পারে—গদ্যমাধ্যম প্রথম শাখা এবং কবিতামাধ্যম দ্বিতীয় শাখা।

কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা দিয়ে একটি হাস্যময় প্রতিবেশ রচনা করে কখনও পরিণত বোধবুদ্ধির মানুষকে, কখনও শিশুকে সে-প্রতিবেশের নায়ক-নায়িকা করে গদ্যমাধ্যম কাহিনী শাখার সৃষ্টি। এই নায়ক বা নায়িকাকে কেন্দ্রে রেখে বেপরোয়া কল্পনা খেলেছে; বিভিন্ন চরিত্রে দেবতা-মানুষ ভূতপ্রেত পশুপক্ষী সমাজকথা-রূপকথা ইতিহাস-কথা অসম্ভবের ছন্দে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজশেখর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ স্রষ্টা প্রবীণ জগৎটার ও নবীন সমাজটার রহস্য ও সমস্যা-জালের মধ্যে বসে উৎকল্পনার হাসি হাসিয়ে এই কাহিনীশাখাটির পুষ্টিবিধান করেছেন।

কবিতামাধ্যম দ্বিতীয় শাখাটি কখনও উৎকাল্পনিক ভাবকে আশ্রয় করে, কখনও কোন চরিত্র আচরণ অবলম্বন করে, কখনও কল্পনার খেয়ালখুশির প্রতিবেশ রচনা করে অসম্ভবের হাস্যছন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় প্রমুখের প্রসন্ন হাস্যমুখর মন এই শাখায় বিচরণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে গদ্যমাধ্যম শাখার চ্যাম্পিয়ান ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম সচেতন স্রষ্টা যিনি ব্যক্তিগত জীবনের তীব্র ভাঙচুরের মধ্যে বসেও অন্তরে নিহিত নবীন সরস মনটিকে প্রসন্ন উচ্চহাসিতে খুঁজে পেয়েছেন এবং

তিনিই প্রথম বাঙালী পাঠককে এই নূতন ধরণের, এই অসূয়ামুক্ত কল্পনার হাসি হাসতে শিখিয়ে সরস মনের ঠিকানা দিয়েছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ ত্রৈলোক্যনাথের জন্মকাল।[১] কিন্তু তাঁর প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ 'কঙ্কাবতী'র রচনাকাল ১৮৯২ (১২৯৯, ১৪ নভেম্বর)। মাঝখানে সুদীর্ঘ ৪৪ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথের কোন পরিচয় নেই। উনিশ শতকের বাংলায় সুদীর্ঘ ৪৪ বছরের এই সময়সীমায় খ্যাত অখ্যাত সকল সাহিত্য-প্রতিভা যুগোপযোগী কর্মব্রতে দীক্ষা নিয়ে সাহিত্যের নানাধারায় পরিচয় দিচ্ছিলেন। অথচ সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ নীরব।

এই নীরবতার কারণ উনিশ শতকের প্রবলরূপে আন্দোলিত সমাজের মত ত্রৈলোক্যনাথের প্রবলরূপে আন্দোলিত ব্যক্তিজীবন। তাঁর এই ব্যক্তিজীবন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের পটভূমি হয়ে কাজ করেছে। ১৫ বছর বয়স থেকে দুঃখকষ্টের দারিদ্র্যের মুখোমুখি হয়ে তাঁর জীবনের দীর্ঘতম সময় কেটেছে। নিজে তিনি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে তাঁর এই জীবনের কথা বলেছেন।—১৮৬২ সালে কিশোর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর মা-বাবাকে হারান। এই মানসিক আঘাতের দু'বছর পরেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পৈতৃক সম্পত্তির বাগান বাগিচা ঝড়ে নির্মূল হয়ে যায়। অভাব-রোগ-দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে নিরুদ্দেশ হলেন। মানভূম-পুরুলিয়ায় আত্মীয় শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যান। রাণীগঞ্জ পর্যন্ত ট্রেনে গেলেন। তার পরের পথ যাবার পয়সা নেই। বন জল পাহাড়পথে কিশোর ত্রৈলোক্যনাথ হেঁটে চললেন। পথে একটি হিন্দুস্থানী চাপরাসীর সঙ্গে পরিচয় হল। চাপরাসী চাকরির লোভ দেখিয়ে তাঁকে রাণীগঞ্জ নিয়ে এলো। চাপরাসীর উদ্দেশ্য ছিল ত্রৈলোক্যনাথকে কুলি-চালান দেবে। কিন্তু চাপরাসীর রক্ষিতা একটি বাঙালী মহিলার দয়ায় ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষা পান। রাণীগঞ্জ থেকে তিনি হাঁটাপথে মানভূম ফিরে চললেন। পথে কুল খেয়ে খিদে দূর করতে হত। ত্রৈলোক্যনাথ মানভূম পৌছলেন।

কিন্তু মানভূমে কিছুদিন থাকার পর বাড়ীর জন্য মন পাগল হল। ত্রৈলোক্যনাথ লিখছেন, "বাড়ীর কষ্ট সর্বদাই মনে জাগিত। পুনরায় দেশে

১. "২৪-পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুত্যগ্রাম জন্মস্থান। ইনি ১২৫৪ সালে ৬ই শ্রাবণ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন।"—সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ৩য় খণ্ড, ৩য় সংস্করণ।

প্রত্যাগমন করিলাম। অল্পদিনের জন্য ইছাপুর গ্রামে 'একটিনী' করিলাম। চারি মাস পরে সে কাজ গেল। গ্রামের জনৈক আত্মীয় যশোহর জেলায় কনট্রাক্টরের কাজ করিতেন। যশোহর-কোটচাঁদপুরে যাইতে পারিলে, দু'পয়সা হইতে পারে, তিনি এইরূপ ভরসা দেন। কোটচাঁদপুরে গেলাম। কনট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটী আসিলাম। আমার একটি আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ে বৰ্দ্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটী ইন্স্পেক্টর অব-স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাষ্টারির প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন, সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন ; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফল মনোরথ হইলাম। একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমনকালে কপর্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম। আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন ; কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।······ রামপুরহাট হইতে পদব্রজে শিউড়ী ফিরিয়া আসিয়া····· ···বৰ্দ্ধমানের দিকে চলিলাম। ৫।৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। অতিকষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চূন হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাটীতে কোনরূপ শুভকার্য হইয়াছে ; ইহাদের বাটীতে খাইতে পাইব।···বাটীর কর্তা অতি সমাদর করিয়া আমাকে মুড়ি, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জীবিত হইল। পুনরায় বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম।···"

বৰ্দ্ধমান ফিরে এসে শুনলেন তাঁর 'পিতামহী' অত্যন্ত পীড়িত। ত্রৈলোক্যনাথ শূন্যহাতে, অনাহার-ক্লিষ্ট দেহ নিয়ে তৎক্ষণাৎ দেশের দিকে চললেন। 'পিতামহী' সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। ত্রৈলোক্যনাথ আবার বেরিয়ে পড়লেন। অর্থাভাব তাকে চাকরির সন্ধানে বার করল।

"কিছুদিন পরে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাষ্টারি করিলাম।··· অল্পদিনের মধ্যে রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায় বদলি হইলাম। এ-স্থানের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইলাম। বেতন ১৮ টাকা। এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ।··· বাড়িতে শিশু ভাইগণ—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া

বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রারম্ভ—অতিশয় ক্ষুধা। এক একদিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। এরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম।...

ইতিপূর্বে কলিকাতার মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি পরিচিত হই। উখড়াই থাকিতে তাঁহার নিকট হইতে সহসা পত্র পাই যে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুরে তাঁহার জমিদারীতে স্কুল-মাষ্টারির পদ খালি আছে—বেতন ২৫ টাকা। আমি সেস্থানে গমন করিলাম।"

পূজার ছুটির পর সাহাজাদপুরে ফিরে যাবার পথে ত্রৈলোক্যনাথ একবার কুমীরের কবলে এবং আরেকবার নৌকাডুবিতে পড়েন। কুমীরের কবল থেকে সতর্কতায় রক্ষা পেলেও, পদ্মার বুকে ঝড় ও নৌকাডুবিতে তিনি জ্বর-বিকার নিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। সাহাজাদপুরে স্কুলশিক্ষকতায় তিনি আর ফিরে গেলেন না।

"বর্দ্ধমানের হরকালীবাবু তখন কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।...তাঁহার নিকট যাইবার বাসনায় বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম।...যৎসামান্য খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিড়া, নুন আর লঙ্কা খাইয়া দিনযাত্রা করিতে লাগিলাম। শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়া গেল। সেদিন খণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একবারে ১৯ ক্রোশ রাস্তা চলিলাম। মহানদী সাঁতার দিয়া পার হইলাম। হরকালীবাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইলাম, অল্প আরোগ্য-লাভ করিলে তিনি আমাকে পুলিশের সাব ইন্‌স্পেক্টরী করিয়া দিলেন।...অল্পদিন পরে কেঁউঝরের লড়াই উপস্থিত হইল। আমাকে তথায় যাইতে আদেশ হইল। কিন্তু প্লীহা জ্বর হওয়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়।...আরোগ্যলাভ করার পর আমি থানার দারোগা হইলাম। কখন বা কোর্টে কাজ করিতে লাগিলাম। এই সময় জাজপুর, ওলাবগ, কেঁদারাপাড়া প্রভৃতি স্থানে দারোগাগিরি করিয়া ভ্রমণ করিলাম।"

উড়িষ্যায় থাকাকালীন তিনি চাকরীজীবনের বাইরে সাংস্কৃতিক চিন্তা ও কর্মের জীবনে আসতে চেষ্টা করেছিলেন। "উৎকল শুভকরী" নামে এক মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদন করেন। ভাষাগত দিক থেকে ভারতবর্ষের মানুষকে

একতাবদ্ধ করবার চিন্তা তাঁর মধ্যে আসে। তাঁর আর্থিক অনটনের জীবন এই উড়িষ্যায় বসে একটা আকস্মিক ঘটনায় সচ্ছলতায় উত্তীর্ণ হল।

"একদিন কটকের কাছারির বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় একটি সাহেব উপস্থিত হইলেন। নানা কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন। সে স্থান হইতে আমরা দুজনে রোমান কাথালিক গির্জায় একটি বিবাহ দেখিতে যাইলাম। পরস্পরে সদ্ভাব হইল।... তাঁহার নাম সার উইলিয়ম হণ্টার।...হণ্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। ১২৫ টাকা বেতনে একটি চাকরি দিয়া কলিকাতা আসিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে হণ্টার সাহেবের আফিসে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"

এরপর হণ্টার সাহেব বিলাত ফিরে যান। ত্রৈলোক্যনাথ সার এডওয়ার্ড বক্-এর সহৃদয়তায় এবং 'দরিদ্রের দুঃখমোচন' ইচ্ছায় ব্রতী হয়ে উত্তর-পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য আফিসে 'হেড্‌ক্লার্কের' চাকরি নিয়ে যান। এখানে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর শ্রম ও জনহিত কল্যাণবোধ নিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ থেকে মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যাপক গাজরের চাষ করার পরামর্শ সরকারকে দেন। সরকার সসম্মানে এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ১৮৮১ সালে ভারত-গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে ত্রৈলোক্যনাথ চাকরি পান। এবার তিনি তাঁর চেষ্টা ও মেধা প্রয়োগ করেন সমগ্র ভারতের শিল্পকার্যের উন্নতির জন্য। এ-বিষয়ে তিনি একখানি বই প্রকাশ করলেন। তার এই প্রচেষ্টার ফলে ইউরোপ ও আমেরিকা লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করল। ১৮৮৬ সালে বিলাতের এক প্রদর্শনীতে তাঁকে গভর্ণমেণ্ট পাঠান। ইংলণ্ড থেকে তিনি স্কটল্যাণ্ডে যান। স্কটল্যাণ্ড থেকে তিনি ইংলণ্ড এসে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, জর্মানী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী গিয়ে ভারতে ফিরে আসেন।

১৮৮৬ সালে রাজস্ব-বিভাগের চাকরি ত্যাগ করে তিনি কলকাতা মিউজিয়মে চাকরি নেন। ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে ভগ্নস্বাস্থ্যে তিনি পেন্সন নিয়ে পুরীর সমুদ্রতীরে বাস করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর।

গোটা জীবনটাই প্রবলরূপে আন্দোলিত জীবন।—দারিদ্র্যপীড়িত. দারিদ্র্যজয়ী, কর্মমুখর জীবন ত্রৈলোক্যনাথের। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের

বাংলার সাহিত্যস্রষ্টাগণ যখন নব অভিঘাতে উন্মথিত দেশকে একটা স্থিত পথে চালনার চেষ্টা করছেন, কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে-সমালোচনায়-গল্পে যখন বাংলার সাহিত্যভূমি বিচিত্র পুষ্পিত; ত্রৈলোক্যনাথ তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য, অনাহারক্লিষ্ট ভাইদের বাঁচাবার জন্য, লোটাভর্তি জল খেয়ে, নদী সাঁতরে, ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে চাকরির সন্ধান করছেন। যখন একটু আথিক স্থিতি পেলেন, ভারতের মানুষকে একতাবদ্ধ করবার চেষ্টায়, কৃষির উন্নতি বিধান করে দেশের দুর্ভিক্ষ দূর করবার বাসনায়, সমস্ত শক্তি ও চিন্তা নিয়োগ করলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতা মিউজিয়মে চাকরি নেবার আগ পর্যন্ত তিনি এই চেষ্টাই করেছেন—কখনও কায়িক শ্রম দিয়ে, কখনও কৃষির বিভিন্ন গ্রন্থ-রচনার মধ্যদিয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিরবচ্ছিন্ন কষ্টদুঃখশ্রমের এই অস্থির দীর্ঘ সময়টায় সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথকে বাঙালীপাঠক তাই দেখতে পান নি। শৈশবে তাঁর মধ্যে উদ্ভাবনীশক্তির যে প্রতিজ্ঞা দেখা গিয়েছিল,[২] দুঃখদারিদ্র্যের রূঢ় পেষণের মধ্যে তা সাহিত্যে পুষ্টির কোন পথ খুঁজে পায় নি। দীর্ঘ ৪৪ বছর সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ তাই নীরব। দুঃখকষ্টের ওপর যেদিন তিনি জয়ী হয়ে আসন পেতে বসলেন, শৈশবের বিশীর্ণ প্রতিজ্ঞা দুঃখনিষ্কাশিত পরিণত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে ত্রৈলোক্যনাথকে সাহিত্যিক করে তুলল। কিন্তু সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথের কলম সার্থক হল উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসি সৃষ্টিতে। অবশ্য সামাজিক উপন্যাস রচনায়ও তিনি ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু কালের সীমা পেরিয়ে তা কোন গ্রহণীয় আবেদন সৃষ্টি করতে পারে নি। সামাজিক গল্প-উপন্যাস যে তিনি রচনা করেছেন, তা যুগ-হাওয়ার প্রভাবে। যেমন বাতাসের তলে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে বাতাসের চাপকে অস্বীকার করা যায় না, সামাজিক মানুষ হয়ে বাস করতে গিয়ে সমাজের গতি ও

২. "বাল্যকাল হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনীশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নূতনতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। কাষ্ঠফলকে ও মাটির চাক্তিতে সেই বর্ণমালা সংযোজিত করিয়া বালক ত্রৈলোক্যনাথ আপন মনে নানাবিধ অস্ফুটগান, হেঁয়ালি, শ্লোক প্রভৃতি রচনা করিয়া কোন রকমে তাহা ছাপিতে লাগিলেন। ইহার বয়স তখন অনুমান নয় বৎসর। সেই সব বর্ণমালা—পিটম্যানের' সংক্ষিপ্ত লেখার' সহিত অনেক মিলিয়া যায়।"—সাহিত্যসাধক চরিতমালা (ত্রৈলোক্যনাথ মুখো:)—৩য় খণ্ড ; ৩য় সংস্করণ।

চাপের বিরুদ্ধতা করা সম্ভব নয়, শিল্পীর সত্তায় তা চুইয়ে প্রবেশ করে। এ-কথা সমাজবিজ্ঞানের দিক থেকে সত্য বলেই ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিসত্তায় এই যুগ-হাওয়ার প্রভাব পড়েছে।

উনিশ শতকের বাংলার যে সমাজে ত্রৈলোক্যনাথ লালিত, তা একদিকে নীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টায়, সমাজ-সংস্কারে ব্যঙ্গবিদ্রূপে এবং আদর্শে ও প্রেরণায় অত্যন্ত গহন গম্ভীর। চারপাশে সমাজপটে বিচরণ করতে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ মানুষের শঠতা ভণ্ডামি, মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা দেখেছেন ; সংস্কার-বদ্ধতা, নির্মমতা দেখেছেন ; দেখেছেন নব্যসমাজের বিকার বিকৃতি কৃত্রিমতা, প্রাচীন সমাজের গোঁড়ামি, স্বার্থান্ধতা। ত্রৈলোক্যনাথের ভেতরের মানুষটি ক্ষুব্ধ, ব্যথিত, আদর্শান্বেষী হয়ে উঠেছে। এই সমাজবোধ ও বাস্তবচেতনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সামাজিক গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। এই সব রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ আদর্শে, নিষ্ঠায়, ব্যঙ্গে, ইঙ্গিতে গভীর গম্ভীর। সমাজের বিকার বিকৃতির চেহারাটাকে তিনি আঘাত করেছেন। মানবতার প্রতি তীব্র আস্থা নিয়ে জীবন ও সমাজটাকে ধৌত করে একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেখানে ত্রৈলোক্যনাথ অকৃত্রিম। "মানুষ কেন আরেকটু হৃদয়বান হয় না"—এই ব্যাকুল প্রশ্নে তিনি উৎকণ্ঠিত ; মানুষের প্রতি মানুষের সহৃদয়তায় পৃথিবীটা সমাজটা বাসোপযোগী হয়ে উঠতে পারে—এ তাঁর ব্যাকুল হৃদয়ের অকৃত্রিম কথা। সামাজিক উপন্যাস ও গল্পে এই একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলেছে। 'বাঙাল নিধিরাম', ফোকলা দিগম্বর', 'পাপের পরিণাম' তারই উদাহরণ। আদর্শ প্রতিষ্ঠাবাসনার তীব্রতায় শিল্পকর্ম আহত হয়ে শিথিল হয়ে পড়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের এই সুতীব্র সমাজচেতনা ও চিন্তাশীলতার পাশাপাশি লঘুউচ্ছল হাস্যমুখের আরেকটি মানসসত্তা সৃজনশীলতায় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিধাতা তার চতুর্মুখের তিনমুখে যেমন দর্শন বেদকাব্য শাস্ত্রচর্চা করেন এবং তারই পাশে চতুর্থ মুখে হো হো রবে বেড়াভাঙা পাগলামোর হাসি উচ্ছ্বসিত করে তোলেন, ত্রৈলোক্যনাথও তাঁর গভীর গম্ভীর মানসিকতার পাশে উৎকল্পনার উচ্ছ্বসিত হাসির একটি প্রফুল্ল সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছেন। নানারূপ অবিশ্বাস্য অসম্ভব চরিত্র ঘটনা পরিবেশ উদ্ভাবন করে হাস্যময় অসঙ্গতির প্রসন্ন উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছে এই মন। সমাজ ও জীবনের যে বিকার বিকৃতিকে

পূর্বেকার কলমে আঘাত করেছেন, এক্ষেত্রে উদ্দাম অনাবিল হাসি সৃষ্টি করে সেই রুগ্ন আহত সমাজ ও জীবনের সেবার ভার নিয়েছেন। এই ভূমিই তাঁর স্ব-ভূমি। সন্তানদেহে মায়ের প্রহারের চেয়ে আদরটা চোখে পড়ে এবং সেটাই স্থায়ী হয়। ত্রৈলোক্যনাথও সমাজ ও জীবনটাকে আঘাত করে পরমুহূর্তে অবিমিশ্র উচ্চহাস্য দিয়ে সেবা করেছেন। এবং সেটাই স্থায়ী হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের রচনার ক্রমটি লক্ষ্য করলে এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

প্রথম উপন্যাস যে 'কঙ্কাবতী' তাঁর একই দেহে এই দুটি দিক প্রকাশিত। 'কঙ্কাবতী'র দুটি ভাগ। প্রথম ভাগ সামাজিক উপন্যাস। সেখানে ত্রৈলোক্য-নাথের সামাজিক বোধ ও বাস্তবচেতনা আঘাতে ইঙ্গিতে রূপ পেয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে তাদের উদার মনুষ্যত্বে ও হাসির উদারতায় ক্ষমা করেছেন। 'কঙ্কাবতী'র পর 'ভূত ও মানুষ' গ্রন্থ। রচনাকাল ১৮৯৬ খৃঃ। 'কঙ্কাবতী'র রচনাকাল ১৮৯২ খৃঃ। 'ভূত ও মানুষে'র অন্তর্গত প্রথম রচনা 'বাঙ্গাল নিধিরাম'। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' ত্রৈলোক্যনাথের প্রেমচেতনার আদর্শায়িত রূপ। তারপরই রচিত হল 'বীরবালা'. 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। আদর্শ প্রেমের যে গভীর চিন্তায় লেখক আবিষ্ট ছিলেন, এই তিনখানা গ্রন্থের বেপরোয়া কল্পনার হাসিতে তাকে উচ্ছল করে তুললেন। এই মেজাজ থেকে ফিরে গেলেন 'ভূত ও মানুষ'-এর পরবর্তী রচনা 'ফোকলা দিগম্বর'-এ। রচনাকাল ১৯০১ খৃষ্টাব্দ। পূর্ববর্তী রচনার উৎকল্পনার হাস্য এখানে সমাজবোধ ও সমাজচেতনায় গভীর হয়ে উঠল। 'ফোকলা দিগম্বর' আদর্শ প্রেমের উপন্যাস। মানুষের চরিত্রের কু ও সু-দিকের উপস্থাপনা এখানে। এর পরই 'মুক্তমালা'-র (১৯০২) নব-আরব্য উপন্যাসে এই গুরুগম্ভীর মনোভাব উচ্ছলতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছে। উৎকল্পনার হাসি ও অলৌকিকতাকে পাশাপাশি রেখে নূতনত্ব আনলেন 'মুক্তামালা'-য়। পরবর্তী রচনায় ফিরে গেলেন মনের গভীর গূঢ় স্তরে। দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তীব্র সচেতন হয়ে উঠলেন। রচনা করলেন 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' (১৯০৩) এবং বধূনির্যাতনের ও শুচিবায়ুর পরিণতিমূলক উপন্যাস 'ময়না কোথায়' (১৯০৪)। মনের এই গভীর সচেতন স্তর থেকেই আবার ফিরে এলেন রূপকথা ও চমৎকারী ইতিহাস-কথার হাস্যমুখর 'মজার গল্প'-র (১৯০৬) জগতে। এরপর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ফিরে গেলেন সমাজ ও মানুষের জীবন নিয়ে উপদেশাত্মক উপন্যাস রচনার প্রয়াসে। 'পাপের পরিণাম'

সেই চেষ্টাজাত। এই মানসিকতার অবসান হ'ল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পর প্রকাশিত উৎকল্পনার হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ডমরুচরিত' গ্রন্থে।

রচনার এই ক্রমসজ্জা থেকে পূর্ববর্তী মন্তব্যের সারবত্তা স্ব-প্রমাণিত। একদিকে ত্রৈলোক্যনাথ সুতীব্র সমাজবোধ ও বাস্তবচেতনা থেকে সমাজ ও জীবন নিয়ে ব্যঙ্গ আঘাতে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন; অপরদিকে উৎকল্পনার উচ্চহাসি দিয়ে তার সেবা করতে উন্মুখ হলেন। প্রথম প্রকোষ্ঠ ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ ক্রমান্বয়ে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছে বলেই প্রথমটার প্রভাব মাঝে মাঝে দ্বিতীয়টার ওপর পড়েছে। এবং বিপরীতটাও সত্য। সামাজিক উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে কখনও কখনও হাসির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু তা আদর্শ প্রতিষ্ঠার সুতীব্র বাসনার মধ্যে এবং তীব্র সমাজচেতনার প্রতিক্রিয়াজাত আঘাত ইঙ্গিতের উপস্থাপনার মধ্যে দাঁড়াতে পারে নি। আবার উৎকল্পনার হাস্যরসমূলক রচনার মধ্যে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও জীবনের ওপর খোঁচা আছে, ইঙ্গিত এসে পড়েছে। যেমন গুরুবাদের ভণ্ডামি, ধর্মীয় সংস্কার ও গোঁড়ামি, গ্রাম্য দলাদলি ইত্যাদিকে তিনি তীক্ষ্ণ আঘাত করেছেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গাত্মক তাৎপর্যকে উচ্ছ্বসিত হাস্যের মধ্যে জারিত করে দেবার এমন এক উচ্চাঙ্গের শিল্পকুশলতা তিনি আয়ত্ত করেছেন; যার ফলশ্রুতিতে ইঙ্গিত-কটাক্ষ আঘাত বেদনা স্বতন্ত্র বক্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যসৃষ্টির স্বকীয়তা এখানেই।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনার এই দ্বিমুখী ধারাটি লক্ষ্য না করলেই তাঁর সামাজিক উপন্যাসের সুতীব্র বাস্তববোধ, সমাজচেতনা ও আদর্শ নিষ্ঠাকে তাঁর উৎকল্পনার অনাবিল উচ্চহাসির মধ্যে চোলাই করে দেখার ভ্রম দেখা দেবে। সে ভ্রমের অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে মনে হবে ত্রৈলোক্যনাথের উচ্চহাস্যের চরিত্র-ঘটনা-পরিবেশ শ্রেণীবিশেষের এবং সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। মনে হবে ত্রৈলোক্যনাথ একজন প্রধান স্যাটায়ারিস্ট। সে ভ্রম অপনোদনের জন্যই এই অতিরিক্ত উপস্থাপনা। নচেৎ ত্রৈলোক্যনাথের এই প্রথম প্রকোষ্ঠজাত গভীর গম্ভীর সত্তার রচনার উল্লেখ আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

এই দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের উৎকল্পনার উচ্চহাসি সৃষ্টিতেই ত্রৈলোক্যনাথের কৃতিত্ব। সার্ধশতকের কালসীমা অতিক্রম করে এই ধারাই ত্রৈলোক্যনাথকে আধুনিক পাঠকের নিকট প্রিয় ও বিচার্য করে তুলেছে।

জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী যে মানুষটি সমাজ, প্রকৃতি ও সংসারের কাছ থেকে নিদারুণ দুঃখ পেয়ে এসেছেন এবং জীবনে স্থিতির মুহূর্তেই অতীতের অনাহার, অর্ধাহার ও দেহ-মোক্ষণের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমৃত্যু ভগ্নস্বাস্থ্য যাঁর দেখা গেল, সে মানুষটি মুখ্যত প্রসন্ন হাসিতে সমাজ ও সংসারকে আনন্দ দিতে কী করে এগিয়ে এলেন, ভেবে বিস্ময় জাগে।

ত্রৈলোক্যনাথ যদি সমাজটার বিরুদ্ধে অন্তরের রুদ্ধ ক্ষোভ তীব্র ব্যঙ্গ, অশ্রু, হাসিতে মিশিয়ে প্রকাশ করবেন বলেই কেবলমাত্র কলম ধরতেন, ত্রৈলোক্যনাথের কলমে যদি নব 'কমলাকান্ত'কে পেতাম বিস্মিত হতাম না। সংসারটাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-আঘাতে জর্জরিত করে দেবার জন্য, ঈশ্বর, সমাজ ও মানুষকে নির্মম কষাঘাত করবার উদ্দেশ্যে যদি তিনি কলম ধরতেন, ত্রৈলোক্যনাথ যদি Swift-এর ভূমিকা গ্রহণ করতেন বিস্মিত হতাম না। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তীব্র হতাশাবাদের প্রকাশে ত্রৈলোক্যনাথ যদি Schopenhauer হতেন, কিংবা James Thompson (the second)-এর মত ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ জীবনটার ৪০ বছরের সীমায় দাঁড়িয়ে হতাশার সুরে যদি বলতেন—জীবনটা দুঃখকষ্টের একটা নরক, সুখস্বপ্ন অগ্রগতি সব ঝুটা*, তা হলেও বিস্মিত হবার কিছু ছিল না।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ শতবর্ষ পরে বেঁচে রইলেন তাঁর সেই রচনার জন্য, যা বাংলার মানুষকে আঘাত-দাহহীন, প্রসন্ন নির্বেদ মনের উদ্দাম কল্পনার হাসি হাসিয়েছে। তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও বাত্যাহত জীবন তাঁর উৎকল্পনার হাস্য-রসের সৃষ্টিপরিমণ্ডলে তীব্র জ্বালা ও হতাশা, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে শূন্যতাবাদ সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য তাঁর হাস্যসৃষ্টিতে কোথাও একটু রক্তাল্পতা আনে নি। হাসাবার জন্য দেহের সূক্ষ্মস্থূল শিরা উপশিরাব্যাপী রক্তবহতা চাই। ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে প্রচুর পরিস্রুত রক্ত ছিল। তিনি সুস্থ স্বাস্থ্যের রক্ত চলাচল ঘটিয়ে প্রসন্ন হাসির এক উচ্ছ্বসিত ধারা সৃষ্টি করলেন। এই হাসির পিছনে যে কী এক মানসিক গঠনের ও জীবন দর্শনের প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করে বিস্ময় জাগে।

বস্তুত মানুষের প্রতি আস্থাবান ও আপোষহীন সংগ্রামী মনের পক্ষেই বোধ-হয় এইভাবে প্রবল আশাবাদী হওয়া সম্ভব। অভাব পীড়নের, রোগভোগের শিয়াল থাবাটা তাঁর দেহমনের উপর দুঃখকষ্টের কোন অধিকার বিস্তার করতে

৩. James, Thompson (the second)—City of Dreadful Night.

পারল না। দুঃখের উপর এই বিজয়ের ফল বোধহয় আশাবাদী মানুষটির প্রসন্ন মনের উচ্চহাসির আনন্দ সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যসৃষ্টির মূলে রয়েছে একদিকে যেমন শিল্পিসত্তার এই বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে রয়েছে তার উপর সমকালীন বাংলার সাহিত্যজগতের উদ্দাম কল্পনাপ্রিয়তার প্রভাব। সে দিকটা লক্ষণীয়।

১৮৪৭ থেকে ১৯১৯ ত্রৈলোক্যনাথের জীবনকাল, তাঁর প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী'র (১৮৯২) পূর্বে কাব্য-নাটক-কবিতা-উপন্যাস-প্রবন্ধের ভূমি বাংলায় রচিত হয়েছে। ১৮৭২-এ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন "আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত সমাগতো রাজবন্নুন্নত-ধ্বনিঃ এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী নির্ঝরিণী"[৪]-কে যৌবনের আনন্দবেগে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। অপরদিকে ত্রৈলোক্যনাথের শেষ রচনা 'ডমরুচরিতে'র পূর্বে রবীন্দ্রপ্রতিভাস্পর্শে বাংলা সাহিত্য বিচিত্র ও প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হয়ে বিশ্বসভায় স্থান পেয়েছে। ১৯১৩-তে বাংলা সাহিত্য যখন নোবেল পুরস্কারের সম্মানে সম্মানিত, তখনও ত্রৈলোক্যনাথ জীবিত। এই সাহিত্য জগৎ ত্রৈলোক্যনাথকে যে-কোটীতে প্রভাবিত করেছে, সেখানে তিনি সামাজিক উপন্যাসের স্রষ্টা, প্রবন্ধের রচয়িতা। এবং তাঁর ৭২ বছরের আয়ুষ্কালের যে ৫৩ বছর উনিশ শতকের মধ্য কেটেছে, সে উনিশ শতকের সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'স্বর্ণলতা'-প্রভাবিত উপন্যাস রচনার মনোভাবে তাঁর সামাজিক উপন্যাস প্রভাবিত। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ কান্তা সম্মিতিতে যেমন শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর 'কঙ্কাবতী', 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'পাপের পরিণাম', 'ফোকলা দিগম্বর'-এ চোখের জলে মানুষকে উদারতার, ক্ষমার ও আদর্শের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ প্রভাবিত হয়েছেন সমকালীন বাঙালী পাঠকের সংস্কৃত ও ইস্‌লামি সাহিত্যের রোমান্টিক আখ্যানের গল্পরসের পিপাসা দ্বারা। এই সাহিত্যিক প্রভাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত সংস্কৃত-ইসলাম-ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্স-রসের গল্পধারা বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে বাঙালীর গল্পরসপিপাসাকে প্রবল করে তোলে। বত্রিশসিংহাসন, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বৃহৎকথা, আরব্য-পারস্য উপন্যাস, গোলেবকাওলি, সখী সোনার কাহিনী,

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'বঙ্কিমচন্দ্র'

তুতিনামা (শুকসপ্ততি), হাতেমতাই, ইউসুফ জেলেখা, কাদম্বরী, রবিন্‌সন ক্রুশো প্রভৃতির বেপরোয়া কল্পনা সেদিন বাঙালী পাঠককে মাতিয়ে তুলেছিল। অবশ্য এ-সব অনুবাদের মূলে নীতিশিক্ষা কাজ করলেও, গল্পরসের তৃপ্তি ব্যাহত হয় নি। মানব জীবনকেন্দ্রিক কল্পনার এই উদ্দামতাকে সমকালীন বাঙালী-মন যে কী উৎসাহে গ্রহণ করেছিল, তার ঐতিহাসিক সত্যতার পরিচয় রয়েছে বিদ্যাসাগরের 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র জনাদরের মধ্যে। "যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয়, আমার এমন আশা ছিল না, 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' সর্বত্র পরিগৃহীত হইবেক। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনকারী ব্যক্তিমাত্রেই আদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন, এবং এতদ্দেশীয় প্রায় সমুদয় বিদ্যালয়েই প্রচলিত হইয়াছে। ফলতঃ দুই বৎসরের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত সমস্ত পুস্তক নিঃশেষ রূপে পর্যবসিত হয়।"[৫] বেতাল-পঞ্চবিংশতির দ্বিতীয়বার 'মুদ্রিত ও প্রচারিত' করবার মূলে যে 'গ্রাহকমণ্ডলীর আগ্রহাতিশয়দর্শন' রয়েছে সে কথাও এই বিজ্ঞাপনের ভূমিকাতেই বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন। সমকালীন বাঙালী মনের এই রোমান্টিক গল্পপ্রিয়তার সপক্ষে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র রসসার্থকতা গল্প-গৌরবে নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বাণভট্ট যদিচ স্পষ্টত গল্প করিতে বসিয়াছেন, তথাপি ভাষার বিপুল গৌরব লাঘব করিয়া কোথাও গল্পকে দৌড় করান নাই। সংস্কৃত ভাষাকে অনুচরপরিবৃত সম্রাটের মতো অগ্রসর করিয়া দিয়া গল্পটি তাহার পশ্চাতে প্রচ্ছন্নপ্রায়ভাবে ছত্রবহন করিয়া চলিয়াছে মাত্র। ভাষার রাজমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য গল্পটির কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে বলিয়াই সে আছে. কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই।"[৬] কিন্তু অনুবাদ কাদম্বরীর ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে উঠল গল্পরস। মূলে বর্ণনার ভীড়ে যে গল্পটি প্রচ্ছন্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল, তারাশঙ্কর বর্ণনার অনেক অংশ সরিয়ে ফেলে গল্পটিকে উদ্ধার করলেন—"ইহা [অনুবাদ কাদম্বরী] ঐ গ্রন্থের [মূল গ্রন্থের] অবিকল অনুবাদ নহে। গল্পটিমাত্র অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণনার অনেক অংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে।"[৭]

৫. বিজ্ঞাপন—বেতালপঞ্চবিংশতি, ১০ই ফাল্গুন, সংবৎ ১৯০৬

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাদম্বরী [প্রাচীন সাহিত্য]।

৭. কাদম্বরী—প্রথমবারের বিজ্ঞাপন—৩রা আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১

সেদিনের বাংলা সাহিত্যের এই রোমান্সপ্রিয়তার মধ্যেই ত্রৈলোক্যনাথের কিশোর মন বিকশিত হয়েছে।

ষষ্ঠ দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে মধু-হেম-নবীন-বঙ্কিম প্রমুখ'র সাহিত্যকর্ম যুগান্তর এনেছে। কিন্তু এই নবীন রসধারা প্রবাহের মধ্যে যাদুময় প্রাচ্যের উদ্দাম কল্পনার প্রতি পাঠকমনের আকর্ষণ যে লুপ্ত হল, তা নয়। ১৮৪৭ থেকে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দশবার 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত হয়েছে। দশমবার এই গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, ১৯৩৩ সংবৎসরে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঞ্চবিংশতি অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছিল। অষ্টম দশকে উর্দু থেকে আরব্য উপন্যাসের দু'টি পদ্য অনুবাদ হয়েছে 'আলেফ লায়লা' নাম বজায় রেখে। একটি রোশেন আলীর (১৮৮৬) এবং অপরটি সৈয়দ নাসের আলী, হবিবল হোসেন ও আয়জদ্দিন আহম্মদ কৃত এবং কাজী সফীউদ্দিন কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। শতকের নবম দশকে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'আবু হোসেন' নাটকে এবং বিজ্ঞানের ছাত্র ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর 'আলীবাবা' নাটকে এই রোমান্টিক গল্পাগ্রহকেই রূপ দিয়েছেন। সেদিনের মঞ্চে নাট্যগুণান্বিত না হয়েও 'আলীবাবা' যে অসাধারণ জনপ্রিয় ও সমাদৃত হয়েছিল তার কারণ বাঙালীর এই প্রবল গল্পপিপাসা। বিংশ শতকের আরম্ভেও আরব্য, পারস্য, তুরস্কের কাহিনী আশ্রয় করে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক রচনা করেন। তাঁর 'বেদৌরা' (১৯০৩), 'জুলিয়া' (১৯০৪), 'দৌলতে দুনিয়া' (১৩১৫), 'মিডিয়া' (১৯১২), 'কিন্নরী' (১৯১৮)—প্রভৃতি নাটকের গল্পরস আদৃত হয়েছিল। একদিকে নব্যপুরাণ সৃষ্টির বাসনা, ইতিহাসের প্রত্যক্ষতা-নির্ভর রোমান্স, সমাজ-সচেতনতা ও বাস্তব জীবন-সমস্যা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যেমন কাব্য-নাটক-উপন্যাসের আশ্রয়স্থল হয়েছে, তারই সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় সংস্কৃত-ইসলামী ও ইংরেজী রোমান্স রসের এই গল্পধারা পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। উনিশ শতকের এই সাহিত্য-পরিবেশেই ত্রৈলোক্যনাথের কৈশোর উত্তীর্ণ হল যৌবনে। Magic East-এর এই উদ্দাম কল্পনার প্রতি বাঙালীর আকর্ষণই ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহযোগী শক্তিরূপে কাজ করেছে। এই সত্যের পথেই 'বীরবালা' আখ্যানে বোগদাদের উল্লেখ এসেছে, ধনাঢ্য শাহ সুলতান প্রবেশ করেছেন। 'লুল্লু'তে চীনমুল্লুকের মহাপ্রাচীরের সন্নিকটস্থ লিংটিং সহরের কল্পনা উধাও হয়েছে।

আকাশপথে সহজে উড়ে চলার ও সরোবরে প্রবেশের কল্পনার পশ্চাতে এই প্রভাব ক্রিয়াশীল। 'মুক্তামালা'য় গড়গড়ি মশায়ের সমুদ্রাভিযানে নাবিক সিন্দাবাদের দুঃসাহসিক কাহিনী, জুল ভের্ণ-এর 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস্ আণ্ডার দি সী'র চমকপ্রদ কাহিনী প্রবেশ করেছে। 'ডমরুচরিত'-এ ও 'মুক্তামালা'য় আরব্য উপন্যাস ও বেতাল-পঞ্চবিংশতির জিন ও বেতাল কল্পনার দূর প্রান্তর অতিক্রম করে উপস্থিত হয়েছে। 'মুক্তামালা'র আড্ডাখানায় গল্প শোনাবার পূর্বে ঘনশ্যাম নিজেই বলেছে "কিন্তু তাহার (গড়গড়ি মশায়ের) কাহিনী শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ঠিক আরব্য উপন্যাস কি বেতাল-পঁচিশের গল্প।" আড্ডার শেষে শ্রোতারা সকলেই "একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে বেতাল-পঁচিশ বত্রিশসিংহাসন ও আরব্য উপন্যাসের পর এরূপ অদ্ভুত ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটে নাই।"

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে রূপকথার একটি অনতিক্রম্য আকর্ষণ রয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির মূলে সে-প্রভাবও কাজ করেছে। কঙ্কাবতীর ঝিনুকের বাড়ি, গোয়ালিনী মাসীর ঘরে তার অবস্থিতি, ডমরু-চরিত-এ জীন-পরীর প্রসঙ্গ, লুল্লুতে হ্রদের তলে ভূতের বাড়ীর প্রসঙ্গ—এ-সব ক্ষেত্রে রূপকথার প্রভাব রয়েছে। কিন্তু উৎকল্পনার হাসি সামঞ্জস্যের হাসি বলেই আরব্য উপন্যাস কথাসরিৎসাগরের অলৌকিকতাকে এবং রূপকথার মোহাঞ্জনকে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কাল্পনিকতার হাস্যপ্রতিবেশে লীন করে উচ্চ ও প্রসন্ন হাসির ফলশ্রুতি রচনায় সক্ষম হয়েছেন।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এই রোমান্সপ্রিয়তার স্বতঃপ্রভাবের বাইরে ত্রৈলোক্যনাথের এ্যাড্ভেন্চার-ভরা ব্যক্তিজীবনও যে তাঁর উৎকল্পনার হাস্য-সৃষ্টির উৎস-মূলের উপাদানরূপে কাজ করেছে, সে কথাও উল্লেখযোগ্য।

১৫ বছর বয়স থেকে তাঁর জীবনটা যে পাহাড়ে নদীতে, স্বদেশে-বিদেশে, দুঃখবিপদের মধ্যে কেটেছে, সে কথা বলা হয়েছে। তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'কঙ্কাবতী', 'বাঙ্গাল নিধিরাম'-এ যেমন এই জীবনের প্রভাব পড়েছে, তাঁর উৎকল্পনার কাহিনীগ্রন্থে এই এ্যাডভেন্চারসঙ্কুল জীবনের স্মৃতি অন্যতম সহায়ক হয়ে এসেছে। 'কঙ্কাবতী'র উৎকল্পনার অংশের অরণ্য পর্বতের চিত্রাঙ্কনে রাণীগঞ্জ থেকে মানভূম পর্যন্ত তিনদিনের হাঁটাপথের বনজঙ্গলপাহাড়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে বিশ্বাস। কমলা অন্বেষণে বীরবালার যে এ্যাডভেন্চার, স্ত্রী অন্বেষণে

আমীরের নগরগ্রাম ভ্রমণ, পাহাড়স্থিত ভীমজল হ্রদের কল্পনা, 'মুক্তামালা'য় গড়গড়ি মহাশয়ের সমুদ্র-অরণ্য বিচরণ, ডমরুর সুন্দরবন, স্বর্গ-মর্ত্য ভ্রমণ—এ-সব কিছুর পেছনে কৈশোর-যৌবনের পাহাড়-নদী-সমুদ্র-অরণ্য-গ্রাম-নগরচারী ত্রৈলোক্যনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিসম্পন্ন মন সেদিন যে দুঃখদারিদ্রবিপত্তির পেষণে ন্যুব্জ হয়ে চলেছে সেখানে সমুদ্র-পাহাড়-অরণ্য তাঁর কল্পনাশক্তিকে অনুপ্রাণিত করে তুলতে পারে নি। কিন্তু তাঁর শিল্পিমনের মণিকোঠায় স্তব্ধ সম্ভাবনায় এ-সব কিছু সঞ্চিত হয়েছিল। জীবনের সুস্থিরতার মধ্যে এই অতীত স্মৃতি কৈশোর-যৌবনের রোমান্স-রসের গল্পপ্রীতির সঙ্গে মিলে উৎকল্পনার সাহিত্যজগৎ রচনা করল।

ত্রৈলোক্যনাথের ওপর রোমান্সরসের এই গল্পধারার প্রভাবের আরেকটা দিক লক্ষণীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে এই রোমান্সরসের গল্পধারা ছিল মানবজীবন-কেন্দ্রিক। অর্থাৎ বাস্তবজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রোমান্স গড়ে ওঠে নি। কথাসরিৎসাগরে যে অতি-প্রাকৃত বিন্যাস, তার মূল নিহিত রয়েছে সমকালীন সমাজজীবনের মধ্যে। সে-যুগের নৈতিক ব্যভিচার, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে নিষ্ঠার অভাব, রাজনীতির হেরফের, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র অসম্ভব-অলৌকিক কল্পনার মধ্যে স্পষ্ট প্রতিফলিত। কিন্তু অলৌকিক কল্পনাকে বাস্তবতার এই বন্ধন আষ্টেপিষ্টে বাঁধতে পারে নি বলেই কথাসরিৎ-সাগরের মূল স্বাদ অলৌকিক গল্পের স্বাদ। একথা আরব্য উপন্যাস সম্বন্ধেও যথার্থ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বত্রিশসিংহাসন সম্বন্ধেও সত্য। কল্পনার উদ্দামতার সঙ্গে এই মানবজীবনকেন্দ্রিকতা উনিশ শতকের পাঠকসমাজকে আকর্ষণ করেছিল। ত্রৈলোক্যনাথের ওপর তারই যুগসুলভ প্রভাব পড়েছে। এই জন্যই ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার সকল কাহিনীতেই পরিচিত জীবনের ভূমি রয়েছে। পরিচিত গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ ঘরসংসার, শঠতা বঞ্চনা, লোভ ঈর্ষা, প্রেম প্রীতি নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার রাজ্যে সমবেত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথ তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে, শ্রীরামপুর, চন্দননগর শহরের উপকণ্ঠের কোন গ্রামের আটচালা বা পূজার দালানের ছকু, নয়নচাঁদ, ডমরুকে নিয়ে উদ্ভট কল্পনায় হাস্যকর জগতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সমাজসচেতনতার ওপর কল্পনার উদ্ভাবনীশক্তি ছড়িয়ে পড়ে উচ্চহাস্যের ফলশ্রুতি রচনা করেছে।

সাধারণত কবি-সাহিত্যিকগণ যেমন কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন, অলৌকিকতা কিংবা রূপকথা অথবা উৎকল্পনার হাস্যের লেখক তার বিপরীতটা করেন। অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও জীবনটা নিয়ে তাঁরা কল্পনার খেয়ালী জগতে উত্তীর্ণ হন। সেখানে স্বতন্ত্র এক জগৎ রচনা করে অলৌকিক কাহিনীস্রষ্টা আবাল্য সংস্কার-বিশ্বাসের অনুভূতি সৃষ্টি করেন, রূপকথার একটা আবিষ্ট মোহজাল রচনা করেন, আর উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাস্যের সফেন তরঙ্গ তোলেন।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের ওপর Magic East-এর এই প্রভাব যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আরব্য উপন্যাস. পারস্য উপন্যাস, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতির অনুবাদ বা ছায়াবলম্বিত গল্প রচনায় অনুপ্রাণিত না করে উৎকল্পনার প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত হাস্যরসের এক স্বতন্ত্র গল্পরূপ সৃষ্টিতে উৎসাহী করে তুলল, তার কারণ অনুধাবনযোগ্য। এর কারণ, একদিকে তাঁর প্রতিভার স্বোন্মেষণ-ক্ষমতা ও স্বীকরণশক্তি, অন্যদিকে যুগোচিত ও স্বভাবোচিত বৈজ্ঞানিক মনের প্রভাব।

ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিমনের সঙ্গে সমান্তরালে একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন গতিশীল ছিল। তার প্রমাণ, কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের গবেষণা সেদিন ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভাষা বিজ্ঞানে তাঁর পারদর্শিতা 'বিশ্বকোষ' রচনায় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কৈশোরেই তাঁর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানপ্রাণতা পিটম্যানের 'সংক্ষিপ্ত লেখা'র মত এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। স্বভাবোচিত এই বিজ্ঞাননিষ্ঠা যুগোচিত সংস্কারমুক্তির আগন্তুক আলোকপাতকে গ্রহণ করেছিল সহজেই।

ফলে Magic East-এর বন্ধনহীন কল্পনার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথ আকৃষ্ট হলেও, তাকে স্বভাবসুলভ ও যুগসুলভ বিচারবুদ্ধি দিয়ে ও বিজ্ঞানবিচারণা দিয়ে গ্রহণ করলেন। অলৌকিক কাহিনী বা পুরাণ কথায় আমরা আমাদের কল্পনায়ও আমাদের কল্পনাশক্তির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক শক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাই। বিজ্ঞাননিষ্ঠা প্রাকৃতিক শক্তির ওপর মানুষের বিজয়ের রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে। আর এই বিশ্বাসের বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকতা বিলীন হয়।

এই বিজ্ঞাননিষ্ঠার জন্যই কোনপ্রকার অলৌকিক ও ভৌতিক বিশ্বাস ও

সংস্কার ত্রৈলোক্যনাথের রচনার মধ্যে স্থান পায় নি। অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য কল্পনাকে তিনি প্রচলিত আস্থা বিশ্বাসের আবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন না। সেইজন্যই দেবতা মানুষ ভূত প্রেত দৈত্য জিনকে নিয়ে তিনি এক হাস্যকর কল্পনার অতিরঞ্জনের খেলায় মেতে উঠতে পারলেন। বাংলা সাহিত্যে কল্পনার অতিরঞ্জনের এই উচ্ছ্বসিত হাস্যসৃষ্টির সচেতন রূপায়ণ এক নতুন সামগ্রী।

ত্রৈলোক্যনাথের এই কলমগ্রহণের সঙ্গে সমকালীন বাংলার সমাজ মানস যে বিরুদ্ধতা করে নি, সেকথা পূর্বেই বলবার চেষ্টা করা গেছে। 'প্রবলরূপে আন্দোলিত' উনিশ শতকের সমাজ, শতকের শেষের দশকে ধীরসংহত হয়ে আসছিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম প্রমুখ কর্মী ও কর্মীসাহিত্যিক সমাজকে অনেকাংশে সংহত ধীরবাহী করে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। সাহিত্যস্বাদী পাঠক-সমাজও সাহিত্যের কর্মোন্মাদনার মধ্যে ও যুগোচিত মনোভাবের মধ্যে ব্যঙ্গ আঘাত বর্জিত প্রসন্ন হাস্যের জীবনরসকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ ছিল। এই উন্মুখতা এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। ১৮৯২-তে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন রচিত হয়। 'গোড়ায় গলদ' সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যহীন উচ্ছ্বসিত কৌতুকহাস্যের পূর্ণাঙ্গ প্রহসন। এই একই বছরে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ থেকেই আঘাতদাহহীন, সংস্কার উদ্দেশ্যমুক্ত, সরব ও প্রসন্ন হাস্য 'গোড়ায় গলদ'-এর খাত বেয়ে একটি ধারায় এবং 'কঙ্কাবতী'র খাত বেয়ে অপর একটি ধারায় বাংলা সাহিত্যে বাহিত হল। এই দ্বিতীয় ধারার প্রসন্ন অবিমিশ্র উচ্চহাস্যই আমাদের আলোচ্য। 'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয় ভাগ বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম কল্পনার উচ্চহাসি উদ্রিক্ত করেছে।

॥ কঙ্কাবতী[৮] ॥

বাংলাদেশের প্রদীপালোকিত মাটির ঘরে, বিদ্যুতুজ্জ্বল আধুনিক গৃহে কঙ্কাবতীর সুপরিচিত রূপকথা অতীতকাল থেকে যে মোহজাল রচনা করে এসেছে, ত্রৈলোক্যনাথ তাকে নূতন করে রূপ দিলেন। "একটি আঁবের জন্য কেহ কি আপনার ভগিনীকে বিবাহ করিতে চায়? করা সম্ভব নয়। যাহা

৮. প্রথম প্রকাশ ১৪ই নভেম্বর ১৮৯২ খৃঃ ১২৯৯ সাল; পৃষ্ঠা-৩০১

সম্ভব তাহা আমি বলিতেছি।" কঙ্কাবতীর এই রূপকথাকে ত্রৈলোক্যনাথ উৎকল্পনার কথা করে আমাদের শুনিয়েছেন। সে-কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যস্বাদের সূচনা লক্ষ্য করেছেন। সে-কথা শুনে আমাদের ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকমন চঞ্চল হয়েছে।

'কঙ্কাবতী'কে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ এই 'দুই' ভাগে লেখক ভাগ করেছেন। 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগ রূপকথাও নয়, উৎকল্পনার কথাও নয়, একটা সামাজিক উপন্যাসের খসড়া। দ্বিতীয় ভাগে উৎকল্পনার কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা।" প্রথম ভাগ হল দ্বিতীয় ভাগের উদ্ভট আজগুবি রাজ্যে প্রবেশের সামাজিক ধাপ। কঙ্কাবতী কেন জলে ডুবল, প্রথম ভাগ হচ্ছে তার সামাজিক কারণ ব্যাখ্যা। রূপকথার কঙ্কাবতী জলে ডুবেছে বোনকে ভাই বিয়ে করবে এই অসামাজিক ইচ্ছার লজ্জায়। ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতীর জলে ডোবার কাহিনীর পেছনে রয়েছে পল্লীসমাজের দলাদলি, জমিদারের লালসা, বাপ-ভায়ের নির্দয়তা ও অর্থলিপ্সা। এই কারণটা নিয়ে প্রথম ভাগে সামাজিক উপন্যাসের একটা খসড়া রূপাঙ্কণের প্রলোভনে পড়লেন। খেতু ও কঙ্কাবতীর ভালোবাসার প্রতিকূল সমকালীন পল্লীসমাজটার দলাদলি আঁকলেন। পল্লী-ভাগ্যবিধাতা জনার্দন চৌধুরী, অর্থলিপ্সু শঠ তনু রায়, ভক্ত গোবর্ধন শিবোমণি, আবার উদারহৃদয় ব্রাহ্মণ নিরঞ্জন রায় এই বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন বাংলার গ্রাম-সমাজের চেহারাটাকে আঘাত করেছেন। ষাঁড়েশ্বরের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইঙ্গবঙ্গ সহুরে চরিত্রের গালে চড় মেরেছেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের স্বভূমি সামাজিক উপন্যাসের ভূমি নয়। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' যেমন উপন্যাস হিসেবে ব্যর্থ, 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগ সামাজিক উপন্যাস হিসেবে দুর্বল।

'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয় ভাগে ত্রৈলোক্যনাথের স্বতন্ত্র মূর্তি, স্বতন্ত্র কলম। এই ভূমি তাঁর স্বভূমি—এখানে তাঁর স্বকীয়তা। এই কলমের লেখায় রবীন্দ্রনাথসহ ছয় থেকে ষাট বছরের বাঙালী পাঠক হাসিমুখর প্রসন্ন খুশী মনের স্বাদ পেয়েছে।

কঙ্কাবতী সমাজ ও সংসারের কাছ থেকে যে আঘাত পেল, তাতে মানসিক অবসাদে অসুস্থ হল। কঙ্কাবতীর প্রবল জ্বর। কঙ্কাবতীর বড় অন্তরজ্বালা। জল জল করে কঙ্কাবতী নদীর ঘাটে শীতল জলের জন্য গেল। রূপকথার কঙ্কাবতীর শোলার নৌকা পবণের বৈঠা জলে ডুবল, সঙ্গে সঙ্গে নটে গাছটি

মুড়ল। উৎকল্পনার কঙ্কাবতীর জেলের নৌকা যখন ডুবল, তখনই উৎকল্পনার সিংহদরজা ঘর্‌ঘর্‌ করে খুলে গেল। আমরা দেখলাম অভ্যন্তরে মানুষের সঙ্গে ভূতপেত্নী, পশুপাখী, কীট-পতঙ্গ মিলে স্বর্গমর্ত্য একাকার হয়ে অসম্ভব, অমূলক, অদ্ভুত রসসৃষ্টির মহাব্যস্ততা।

কঙ্কাবতী জলে ডুবে মাছের রাজ্যে এল। মাছের রাণী হল কঙ্কাবতী। তার বাস করবার জন্য নির্মিত হল মতিমহল, কাঁকড়া মশাইর তত্ত্বাবধানে তৈরী হল পোষাক। তারপর একদিন গোয়ালিনী পুকুরঘাট থেকে মতিমহল সমেত কঙ্কাবতীকে তুলে আনল মানুষের রাজ্যে। সে স্থান থেকে কঙ্কাবতী পৌছল তার প্রেমিক খেতুর কাছে। খেতু কঙ্কাবতীকে তার পিতা তনু রায়ের বাড়ির দ্বারে রেখে বিয়ের ব্যয়বহনের জন্য অর্থ উপার্জনে চলল।

এরপর থেকে 'কঙ্কাবতী'র কাহিনী উৎকল্পনার নতুন ও প্রশস্ত পথে চলল।

খেতু 'স্কল স্কেলিটন এ্যাণ্ড কোম্পানী'র প্রসন্নতায় শিকড় মাথায় দিয়ে বাঘের রূপ নিয়ে কঙ্কাবতীকে বিয়ে করল। কঙ্কাবতী বাঘের পিঠে চড়ে মহাঅরণ্যে এক বিরাট অট্টালিকায় এসে নামল। খেতু ও কঙ্কাবতী বিপুল অর্থের ভবিষ্যৎ অধিকারী হয়েও কঙ্কাবতীর সামান্য ভ্রমে বিপত্তি ঘটল। কঙ্কাবতী খেতুর মাথার শিকড় কেটে পুড়িয়ে দিল। তৎক্ষণাৎ সম্পত্তির প্রহারিণী নাকেশ্বরী ভূতিনী কঙ্কাবতীকে অট্টালিকার বাইরে অরণ্যে ফেলে দিয়ে খেতুর প্রাণহরণ করল। নাকেশ্বরী খেতুর পরমায়ুটুকু কচুপাতে মুড়ে তালগাছের মাথায় তুলে রেখে মাসীকে ডাকতে গেল—দুজনে মিলে পরমায়ুর চাটনি করে খাবে। এদিকে কঙ্কাবতী স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য অরণ্যময় ঘুরতে লাগল। হ্যাট কোট পরা ব্যাঙ সাহেব মিঃ গামিশের সহায়তায়, রক্তবতী মশার সঙ্গে পচাজল পাতিয়ে তার বাবা দীর্ঘ-শুণ্ড মশাকে ধরে কঙ্কাবতী ভূতের ওঝা খর্বুর মহারাজের কাছে এল। খর্বুর মহারাজ হাতীর পিঠে চড়ে মশা ও কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেতুর কাছে পৌছল। খর্বুর মহারাজের তন্ত্রের প্রচণ্ড শক্তিতে নাকেশ্বরী ভীত। কিন্তু নাকেশ্বরীর কিছু করার নেই। খেতুর পরমায়ু তালগাছ থেকে উড়ে পড়ে বাতাসে কিছু ছড়িয়ে গেছে, কিছু পিঁপড়ের পেটে গেছে। নাকেশ্বরী তালতলায় পাথরের ফাটলে, মাটির গর্তে খুঁজল। ডেওপিঁপড়ে, কাঠপিঁপড়ে, টোপ-পিঁপড়ে—সকলের কাছে জিজ্ঞেস করে করে এক কানাপিঁপড়ের কাছে খবর পেল—পরমায়ু-আহারী পিঁপড়েদের ব্যাঙ সাহেব মিঃ গামিশ গিলেছে। খর্বুর

মন্ত্রপূত সর্ষে দিয়ে ব্যাঙ সাহেবকে আনালেন। কিন্তু মিঃ গামিশের বমন কিছুতেই হল না। খর্বুর মহারাজ চিন্তিত হলেন– মশা, হাতী, গামিশ, কঙ্কাবতী চিন্তিত হল। নাকেশ্বরী খুশী হল। খর্বুর মহারাজ অনেক ভেবে মশাকে বললেন, "মহাশয়! এই ব্যাঙের বমন হয় এরূপ ঔষধ পৃথিবীতে নাই। জগতে ইহার কেবল একমাত্র ঔষধ আছে। ঐ যে আকাশে চাঁদ দেখিতে পান, ঐ চাঁদের মূল শিকড়ের ছাল এক তোলা, সাতটি মরিচ দিয়া বাটিয়া খাইলে, তবেই ব্যাঙের বমন হইবে। নতুবা আর কিছুতে হইবে না।"

কিন্তু কে আনবে শিকড়? অতদূর কে উঠবে? খর্বুর মহারাজ বুদ্ধি দিলেন,—একটা খোক্কোশের বাচ্চা ধরে তার পিঠে চড়ে কঙ্কাবতী চাঁদে পৌছতে পারে। ব্যাঙ সাহেব খোক্কোশের ঠিকানা দিলেন। খর্বুর ও ব্যাঙকে খেতুর পাহারায় রেখে মশা কঙ্কাবতী ও হাতীকে নিয়ে খোক্কোশ ধরতে চলল। এদিকে নাকেশ্বরী তার মাসীকে বলল—"মাসি, তুমি এক কর্ম কর! তোমার ঝুড়িতে বসিয়া তুমি গিয়া আকাশে উঠ। সমস্ত আকাশ ভুমি একেবারে চূণকাম করিয়া দাও। ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া চূণকাম করিবে, কোথাও যেন একটু ফাঁক না রহিয়া যায়! তুমি চশমা নাকে দিয়া যাও, তাহা হইলে ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে। চূণকাম করিয়া দিলে ছুঁড়ি আর আকাশের ভিতর যাইতে পথ পাইবে না চাঁদও দেখিতে পাইবে না। চাঁদের মূল শিকড়ও কাটিয়া আনিতে পারিবে না।" নাকেশ্বরীর মাসী সমস্ত আকাশ চূণকাম করিয়া দিল। এদিকে খোক্কোশের বাচ্চা ধরে কঙ্কাবতী তার পিঠে চড়ে চাঁদের দিকে চলল। আকাশ চূণকাম হওয়ায় কঙ্কাবতী ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তার অসহায় ভাব দেখে একটি নক্ষত্রবৌ আকাশের খিড়কি-দরজা খুলে দিয়ে কঙ্কাবতীকে ভিতরে নিয়ে গেল। কঙ্কাবতী খোক্কোশের শাবককে একটি মেঘের ডালে বেঁধে হেঁটে চাঁদের কাছে চলল। চাঁদ মূল-শিকড় হারাবার ভয়ে কাতর। চাঁদের বউ চাঁদনী কাঁদতে লাগল। চাঁদের ছেলেমেয়েরা কঙ্কাবতীর কাপড় ধরে টানতে লাগল। কঙ্কাবতী চাঁদনীকে এই বলে আশ্বস্ত করল যে এক তোলা শিকড় সে উপর উপর চেঁচে নেবে। তাতে চাঁদের কোন ক্ষতিই হবে না। চাঁদনী আশ্বস্ত হল। কঙ্কাবতী চাঁদের শিকড় নিয়ে খোক্কোশে চড়ে অরণ্যে ফিরল। খর্বুর মহারাজ ব্যাঙকে ঔষধ খাইয়ে বমন করালেন। পিঁপড়ে সব বেরিয়ে এলে অতি যত্নে তাদের পেট থেকে সূক্ষ্ম সোন্না দিয়ে খেতুর পরমায়ুটুকু বার করে আনলেন। কিন্তু এত চেষ্টা

সত্ত্বেও সব ব্যর্থ হল। যতটুকু পরমায়ু পাওয়া গেল তাতে খেতুর মুহূর্তের আয়ু হয়। তালগাছ থেকে পড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ আয়ু বাতাসে নষ্ট হয়ে গেছে। খেতু মুহূর্তের জন্য জেগে উঠে চিরনিদ্রায় শয়ন করল। মশা, হাতী, খর্বুর, ব্যাঙ সাহেব সকলকে কাঁদিয়ে কঙ্কাবতী সহমরণে সতী হল।

কঙ্কাবতীর সুখনিদ্রা ভেঙে গেল। কঙ্কাবতী ধীরে ধীরে সুস্থ হ'ল। কঙ্কাবতীর সঙ্গে খেতুর বিয়ে হ'ল। জনার্দন চৌধুরী অনুতপ্ত হয়ে বর-বধূকে আশীর্বাদ করলেন। গ্রামের দলাদলি দূর হ'ল। খেতুর মা কঙ্কাবতীকে পরম আদরে গ্রহণ করলেন। নটে গাছটি মুড়ল।

ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' রূপকথার কঙ্কাবতীর এক নবরূপায়ণ। এইজন্য রূপকথার ঢঙটা ও রূপকথার আমেজ কঙ্কাবতীর দ্বিতীয় ভাগের গোড়ায় এসে উৎকল্পনার গল্পরসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে রূপকথার বা অলৌকিক কথার সঙ্গে উৎকল্পনার বিরোধ নেই। উৎকল্পনার হাসি সামঞ্জস্যের হাসি। কিন্তু রূপকথা বা অলৌকিক কথা যেখানে হাসির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, সেখানে উৎকল্পনার হাস্যরস ব্যাহত হয়ে পড়ে। যেমন হয়েছে Carroll-এর Looking Glass-এ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'য়। 'কঙ্কাবতী'তেও রূপকথার অনুভূত প্রভাবে উৎকল্পনার হাসির চালটা হাল্কা হয়ে পড়েছে। আবার 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগে যে সামাজিক উপন্যাসের কাঠামো রচিত হয়েছে, তা দ্বিতীয় ভাগের উৎকল্পনার গল্পরসে স্থানে স্থানে প্রসারিত হয়েছে। খেতু ও কঙ্কাবতীর মধ্যে সামাজিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ভাব এসে পড়েছে। তাদের বিরহ-অশ্রু মিলন-আনন্দের মধ্য দিয়ে খেতুর আদর্শ প্রেমিক চরিত্র, কঙ্কাবতীর সতী সাধ্বীর আদর্শ চরিত্র, তাদের মুখে আদর্শ প্রেমের তত্ত্ব প্রথম ভাগ ছাড়িয়ে দ্বিতীয় ভাগের উৎকল্পনার মধ্যেও প্রবেশ করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিজীবনের দুঃখকষ্ট খেতুর অর্ধাহার অনাহার-ক্লিষ্ট চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। খেতুর মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা নানা ক্ষেত্রে প্রকাশিত।[৯] এর ফল হয়েছে এই যে কঙ্কাবতীতে উৎকল্পনার যে

৯. "কঙ্কাবতী। মানুষের মনে এরূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ নিষ্ঠুরতা নরক না হয়, তবে নরক আবার কি? কঙ্কাবতী! মানুষ মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে, তাদের ক্লেশ হয় না?"—কঙ্কাবতী দশম পরিচ্ছেদ—'চুরি' (বসুমতী সংস্করণ)।

প্রতিবেশ রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে নায়ক-নায়িকার আচরণ সর্বৈব লীন হতে পারে নি। তারা স্থানে স্থানে উৎকল্পনার প্রতিবেশ থেকে যেন বেরিয়ে এসে বৈশিষ্ট্যে ও স্বাতন্ত্র্যে বিশেষিত হতে চেয়েছে। যখনই একথা মনে হয়েছে, তখনই দেখা গেছে রচনার দেহ থেকে উৎকল্পনার হাসি ফিকে হয়ে এসেছে।

বস্তুত প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী'তে ত্রৈলোক্যনাথ 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'স্বর্ণলতা'-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যের সামাজিক উপন্যাস রচনার মনোভাবে ভাবিত হয়েছেন। কঙ্কাবতীর সমাপ্তি একখানা মিলনান্তক সামাজিক উপন্যাসের সমাপ্তি। মাঝখানের উৎকেন্দ্রিকতাকে ত্রৈলোক্যনাথ কঙ্কাবতীর ব্যর্থপ্রেমিক হৃদয়ের তীব্র মিলন আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন রূপায়ণ রূপে দেখিয়েছেন। একখানা সামাজিক উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার গল্পরস বাঁধা পড়ায় কঙ্কাবতীর সম্পূর্ণ দেহখানা 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'লুল্লু', 'ডমরুচরিত'-এর মত স্বয়ংসম্পূর্ণ উৎকল্পনার শিল্পসৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে নি। তা সত্ত্বেও সামাজিক উপন্যাসের ফ্রেমে রূপকথার পরকলার নীচে কঙ্কাবতীর উৎকল্পনার হাসির এই গল্পরস আস্বাদন করেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন রসধারা লক্ষ্য করেছেন। কঙ্কাবতীর অন্তর্গত 'স্কল স্কেলিটন এ্যাণ্ড কোম্পানী'র উদ্ভট কল্পনা, 'ব্যাঙ সাহেব মিঃ গামিশে'র উৎকেন্দ্রিক উদ্ভাবন, 'আকাশ চূণকাম করা'র উৎকল্পনা, 'চাঁদের মূল শিকড়ে'র কল্পনা—কঙ্কাবতীর সামাজিক উপন্যাসের ও রূপকথার ঢঙকে ছাড়িয়ে উঠে পাঠককে প্রসন্ন হাস্যে উচ্ছ্বসিত করেছে। পরবর্তী রচনায় এরই সার্থকতম প্রকাশ।

'স্কল ও স্কেলিটন'-এর ভৌতিক কাহিনী ভীতিশূন্য প্রসন্ন হাস্যে বাংলা সাহিত্যে অ-পূর্ব। মানব সমাজে সগৌরব আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ভূতের সংঘবদ্ধ লড়াই-এর কল্পনা করে, ভূত ও মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ক কল্পনা করে ত্রৈলোক্যনাথ উদ্ভট কল্পনার কারিগরি দেখিয়েছেন। অবশ্য আমাদের মৌখিক সাহিত্যধারায় ভূত নানাভাবে মানুষের উপকার করে এসেছে। কিন্তু তার অন্তরালে কাজ করেছে মন্ত্রতন্ত্রের শক্তি। ভূত মন্ত্রভয়ে মানুষের হয়ে খেটেছে। আবার সুযোগ পেয়ে সে প্রতিশোধ নিয়েছে। ভূতে ও মানুষে চিরবিরোধ এখানে ভীতিতে বিদ্যমান। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের হাতে ভূত নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের স্বীকৃতি না পেয়ে ব্যথিত হচ্ছে। মানুষের ক্লান্তি হৃদয়ঙ্গম করে ভূত তাকে সুপরিপক্ক ফল আহার করাচ্ছে, স্ফটিক স্বচ্ছ জল পান করাচ্ছে। মানুষের সঙ্গে

ভূত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একযোগে বন পরিষ্কার করে পাথরের গাঁথুনি খুলে আপনার সঞ্চিত সম্পত্তি মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে। এ চিত্র কেবল আমাদের দেশে নয়, সকল দেশের সাহিত্যে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার নিদর্শন। লেখার উৎকেন্দ্রিকতার সঙ্গে রেখার উৎকেন্দ্রিকতা মিলে মিশে কল্পনার পাগলামোর হাসি দ্বিগুণিত হয়েছে।

ব্যাঙ সাহেব মিঃ গামিশের উদ্ভট চরিত্রকল্পনা ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুতরস সৃষ্টির সার্থকতার প্রমাণ। শিল্পী একে রেখায় ধরে হাস্য আরও উচ্ছল করে তুলেছেন। সাহেব গামিশ 'Alice's Adventure in the Wonderland'-এর waist coat পরা Rabbit-কে মনে করিয়ে দেয়। Rabbit যখন তার ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে ঘড়ি টেনে বার করে 'Oh Dear ! Oh Dear ! I shall be too late' বলে ব্যস্ত হয়ে অদৃশ্য হল, সে দৃশ্য উদ্ভটতার আনন্দ সৃষ্টিতে ছয় থেকে ষাট বছরের পাঠককে খুশী করে তোলে। কিন্তু Alice-এর অদ্ভুত রাজ্যে Rabbit বড় চঞ্চল, বড় ব্যস্ত। ঘড়ি দেখে তার চলা। তাকে চোখের কাছে ধরে যে দেখব, আর দেখে দেখে হাসব, সে সুযোগ Rabbit দেয় না। কিন্তু মিঃ গামিশ তার হাবভাবে, তার ক্রোধ নিয়ে, তার খুশি, তার কান্না, সহৃদয়তা নিয়ে কঙ্কাবতীর পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের পরম দর্শনীয় ও হাস্যউদ্রেকের স্থিরচিত্র হয়ে উঠেছে। গামিশ সাহেবের উদ্ভট চালের তুলনায় Rabbit সাহেবের উদ্ভট চালটা একটু লঘু ধরণের।

চাঁদের মূল শিকড়ের কল্পনা একটা দুর্দান্ত উদ্ভট কল্পনা। বর্তমান চাঁদের ভবিষ্যৎ সন্তান চাঁদের কল্পনা এবং ভবিষ্যতে বর্তমান বৃদ্ধ চাঁদের চটকসুন্দরী কন্যার কালো অঙ্গচ্ছটার চকচকে অন্ধকারে রাত্রের জগৎকে যেদিন বারনিশ চামড়ায় মোড়া দেখাবে, সেই অপূর্ব দিনটির জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। চাঁদের ছোট মেয়েটি বাবার শিকড় হরণকারিণী কঙ্কাবতীকে আঁচড়ে, কামড়ে যে দৃশ্য সৃষ্টি করেছে, সে দৃশ্যের কল্পনার পিছনে এক নিপুণ শিল্পীমনই কাজ করেছে।

বাংলা হাস্যরসে ত্রৈলোক্যনাথ একটি নূতন ধারার সূচনা দেখালেন কঙ্কাবতীর প্রাকারে। এ ধারা পূর্ণতা পেয়েছে পরবর্তী রচনা 'লুল্লু', 'ডমরুচরিত', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য়।

উৎকল্পনার এই হাস্যরস সৃষ্টিই ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের বাঙালী পাঠকসমাজকে, যে পাঠকসমাজ বঙ্কিমের উপন্যাস পড়ে, মধু-হেম-নবীন-এর কাব্যপাঠে সমকালীন

বাংলা নাট্যরসে, বিহারীলালের ও তাঁর গোষ্ঠীর গীতিকবিতার রসাস্বাদনে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা-প্রবন্ধ-গল্প পাঠে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, সেই পাঠকসমাজকে তৃপ্ত করে আধুনিক পাঠকসমাজের মধ্যেও একটা ক্রমপ্রসারিত মূল্য লাভ করেছে।

'কঙ্কাবতী'তে যে আঘাত ব্যঙ্গ লক্ষ্য করা গেছে, তা উল্লেখযোগ্য হয়েছে কঙ্কাবতীর সামাজিক উপন্যাসের দেহাংশে। অর্থলিপ্সু তনু রায়, কপট ষাঁড়েশ্বর, শঠ ব্রাহ্মণ শিরোমণি—'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগে এদের তীব্র আঘাত করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ।

কিন্তু এখানেও একটা দিক লক্ষণীয়। ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী'র প্রথম ভাগে যে সামাজিক মানুষকে আঘাত করলেন, উপন্যাসের শেষে তাদের উদার ক্ষমার চক্ষে কাছে টানলেন। জনার্দন চৌধুরী অনুতপ্ত হল। তার মোসাহেব দল অনুতপ্ত হল। যে বরফ নিয়ে গ্রাম্যসমাজ খেতুর দুর্দশার একশেষ করল, সেই সমাজই অনুতপ্ত হয়ে কলকাতা থেকে বরফ আনিয়ে কঙ্কাবতী-খেতুর বিয়ের উৎসবে গ্লাসে গ্লাসে খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করল। এ চিত্র ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পী-মনের প্রধান একটা দিককে যেমন স্পষ্ট করেছে, তার রচনার প্রধান চরিত্রধর্মকেও প্রকাশ করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিচরিত্র মনুষ্যত্বের ওপর অতি বিশ্বাসী। তাঁর ব্যক্তি-জীবনের ক্রিয়াকলাপেও দেখা গেছে মনুষ্যত্বের ওপর অতি-বিশ্বাস। এই ব্যক্তি-জীবনই তাঁর শিল্পিজীবনকে প্রভাবিত করেছে। একটা মুক্তপক্ষ সর্বত্রচারী জীবন হওয়ায়, মানুষকে ও মানুষের সমাজকে তিনি স্বরূপে, নানা কোণ থেকে দেখেছেন। মানুষ ও সমাজের আচরণ তাকে ব্যথিত করেছে। কিন্তু প্রতিটি মানুষ কেন উদার হয় না, মানুষে মানুষে এই হানাহানি হিংসাদ্বেষ কেন,—এই ভাবনা তাঁর মধ্যে তীব্র বলেই কি সামাজিক, কি উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের কোন রচনায় কোথাও মানুষ ও মানুষের সমাজটা আঘাতে ইঙ্গিতে জ্বলে উঠতে পারে নি। মনুষ্যত্বের ওপর এই আবেগতীব্র বিশ্বাস ছিল বলেই, কঙ্কাবতীতে গ্রাম্য-সমাজকে তিনি ক্ষমা করে মনুষ্যত্বের উদার প্রাঙ্গণে সমবেত করতে পেরেছেন। এই উদার মনুষ্যত্ববোধের বাস্তব রূপায়ণ কতটা সম্ভব তার সতর্ক বস্তুনিষ্ঠ বিচার ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যিক স্বভাবের অনুকূল ছিল না। মনুষ্যত্বে বিশ্বাস তাঁর সমস্ত সত্তা জুড়ে এত বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল যে তাঁর সামাজিক উপন্যাস এক

একটা আদর্শের প্রচারক হয়ে পড়েছে। 'বাঙ্গাল নিধিরাম'-এ তাই ঘটেছে। 'ফোকলা দিগম্বর', 'পাপের পরিণাম', 'ময়না কোথায়'—উপন্যাসে তাই ঘটেছে।

এই মনোভাব তাঁর সামাজিক উপন্যাসকে সার্থকতা এনে না দিলেও, তাঁর উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্যরস সৃষ্টির সমস্ত রূপ ও রসের উৎস এই মনোভাব। মনুষ্যত্বে এই প্রবল আস্থা ও বিশ্বাসই তাঁর হাসিতে আঘাতদাহহীন অপূর্ব প্রসন্নতা এনে দিয়েছে। মনুষ্যত্বে এই প্রবল বিশ্বাস ও আস্থার জন্যই তিনি Swift-এর মত মানবসমাজের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেন নি, সমাজ সভ্যতাকে ব্যঙ্গে আঘাতে জর্জরিত করে তাকে বিনাশ করতে কলম ধরেন নি। ভল্টেয়ারের মত জীবন ও জগতের অন্ধকার দিকগুলোকে নিদারুণ নিষ্ঠুর আঘাত করতে বদ্ধ পরিকর হন নি। ইন্দ্রনাথের মত হাস্যসৃষ্টিতে ব্যঙ্গখরশান হতে পারেন নি। উৎকেন্দ্রিকতার কাঠামোকে একটা ছদ্মবেশ করে, কাঠামোর তলে শ্রেণীবিশেষ মানুষকে ও সমাজকে তিনি হাসির ছলে সকরুণ বিদ্বেষে আঘাত পীড়ন করতে পারেন নি। মনুষ্যত্বে এই বিশ্বাসই তাঁর হাস্যরসকে একটি পরিণত শিল্পলাবণ্য দান করে শিশুপাঠ্য আখ্যার ভ্রান্ত, রসহীন বিচার থেকে মুক্তি দিয়েছে।

উৎকেন্দ্রিক জগৎটার সঙ্গে পরিচিত জগৎটার যোগসাজস রচিত হওয়ায় এবং স্রষ্টা একজন সামাজিক মানুষ হওয়ায়, তাঁর উৎকল্পনার হাসির ধারাপথে কখনও সমাজটার ও সামাজিক মানুষের বিকার বিকৃতির ওপর ইঙ্গিত কটাক্ষ এসে পড়েছে। কিন্তু ইঙ্গিত কটাক্ষকে তিনি এমন ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিকরূপে হাসির সঙ্গে জড়িয়ে দিতে পেরেছেন যে, তার মধ্যে ব্যঙ্গ খোঁচা কোথাও উল্লেখ্য হয়ে উঠতে পারেনি। ব্যঙ্গ খোঁচার অস্তিত্বটা "...এতই সুদূর, এতই সেটা অধিক গভীর আছে কি না আছে তাহার প্রমাণ দিতে হয় না কবির।" বাংলা সাহিত্যে তাঁর এই নৈর্ব্যক্তিক প্রসন্ন মনের হাস্যসৃষ্টির উত্তরাধিকারী হলেন রাজশেখর বসু, সুকুমার রায় প্রমুখ। সে কথা পরে আলোচিত হবে।

ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পী প্রতিভার এই উদার নৈর্ব্যক্তিক স্বভাবটি যদি অগোচরে থেকে যায়, তবেই মনে হবে তাঁর উদ্ভট কল্পনার চরিত্র-কাহিনী মানব-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। মনে হবে উৎকেন্দ্রিকতা ত্রৈলোক্যনাথের ছদ্মবেশ,—ব্যঙ্গ-আঘাত-সংস্কার-মনস্কতা তাঁর প্রধান লক্ষ্য। মনে হবে

ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিকতার শিখণ্ডীর আড়ালে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাত চালিয়েছেন।

কঙ্কাবতীর 'স্কল ও স্কেলিটন', 'ব্যাঙ সাহেব মিঃ গামিশ'-এর মধ্যে আমাদের অতিরিক্ত ইংরেজ-প্রীতি, আমাদের দাসত্ব মনোভাবের প্রতি যে ইঙ্গিতটুকু রয়েছে, তার পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বকথিত 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' রেখে পড়লে ত্রৈলোক্যনাথের উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্যসৃষ্টির চরিত্র-ধর্মটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'হনুমদ্বাবুসংবাদ'-এ বঙ্কিম আমাদের ইংরেজ-প্রীতি ও ইংরেজ-দাসত্বের মনোভাবকে হাসির কশাঘাতে প্রায় উলঙ্গ করে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য সামাজিক মানুষের বিকার বিকৃতিকে সংশোধন করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি একটা উদ্ভট পরিবেশ তৈরি করেছেন। কিন্তু সেই উদ্ভটতার ছদ্মবেশের তলে বসে হাসির চাবুক মেরে ইংরেজ-দাসত্বলুব্ধ, ইংরেজ-প্রীতিপুষ্ট বাবুদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার ঘটনা-সৃষ্টি ও চরিত্র-সৃষ্টির লক্ষ্য মানুষকে প্রসন্ন হাসির আনন্দ দেওয়া। কখনওই তিনি উৎকেন্দ্রিকতাকে ব্যঙ্গ আঘাতের ছদ্মবেশরূপে গ্রহণ করেননি। সেটা যে যে তাঁর শিল্পিস্বভাবেরই বিরুদ্ধে, সেকথা বলবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই মনোভাবের জন্যই 'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয় ভাগে 'স্কল ও স্কেলিটন', 'মিঃ গামিশে'র উদ্ভট কল্পনার হাস্যস্রোতে ইঙ্গিত কটাক্ষ লক্ষ্য করা গেলেও তা বিদ্ধ করবার, আহত করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। বঙ্কিমের আঘাতের লক্ষ্য যারা তারা হাসতে গিয়ে আহত ও ব্যথিত হয়ে ওঠে, হয়তো ক্ষুব্ধও হয়ে ওঠে। ত্রৈলোক্য-নাথের কটাক্ষ-ইঙ্গিতের লক্ষ্য যদি কেউ হয়ে পড়ে, সে আঘাতের পেছনে স্রষ্টার প্রসন্ন মনটি দেখে উদ্ভটতার হাস্যস্রোতেই গা ভাসিয়ে দেয়। মনুষ্যত্বের ওপর বঙ্কিমের গঠনশীল মনও একান্ত বিশ্বাসী। কিন্তু সে বিশ্বাস আবেগের চেয়ে বিচারবুদ্ধি-কষিত। মনুষ্যত্বের ওপর ত্রৈলোক্যনাথের বিশ্বাস আবেগে উদ্বেলিত। বঙ্কিম ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক-মানুষকে প্রয়োজনে কশাঘাত করে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেন। ত্রৈলোক্যনাথ মানুষের মনুষ্যত্বহীনতায় নিজে ব্যথিত হন, কাতর হন। এই মনোভাবের ভিন্নতার জন্যই বঙ্কিমের হাসিতে জ্বালা রয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথের হাসি প্রসন্ন উচ্ছ্বসিত। এই মনোভাবের ভিন্নতার জন্যই বঙ্কিমের উৎকল্পনা ছদ্মবেশ মাত্র, ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনা হাস্যউচ্ছল এক

নিটোল শরীর। বাংলা সাহিত্যে এই শরীর-রূপ নতুনত্বের দাবী রাখে। কঙ্কাবতীর দেহে এ-রূপকে পূর্ণাঙ্গ করে না পেলেও, তার সূচনা প্রতিজ্ঞাপূর্ণ।

কঙ্কাবতীর গল্পরচনার ভঙ্গীটাকে গল্প লেখার ভঙ্গী না বলে, গল্প বলার ভঙ্গী বলা শ্রেয়। একটা বৈঠকী মেজাজ এখানে ছায়া ফেলেছে। গল্প কথকের মত ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর ইয়ার-বৈঠকখানায় বসে গল্প বলে গেছেন। কোন চতুর বৈঠকবন্ধু যেন লুকিয়ে সে-গল্প লিখে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যখন গল্পগুচ্ছের গল্প লেখার মধ্য দিয়ে গল্পরসের একটি অশেষ সম্ভাবনাময় উদ্বেলিত লেখ্যধারা বাংলার গল্পপিপাসু মনে বাহিত করে দিচ্ছিলেন, ত্রৈলোক্যনাথ বাংলার সেই লেখ্যরীতিকর্ষিত গল্পভূমিতে গল্পের মৌখিক ভঙ্গীটিকে পুনরুজ্জীবিত করলেন।

গল্পগুলির চালও স্বতন্ত্র। একটা গল্প থেকে আরেকটা গল্প লাফিয়ে উঠেছে। একটা গল্পের বুক থেকে, গল্পের মাথা থেকে আরেকটা গল্প ফুটে উঠেছে। 'আরব্য উপন্যাস', 'কথাসরিৎসাগর', 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'কাদম্বরী' কিংবা 'ডেকামেরন' 'ক্যান্টারবেরি টেল্‌স্' গল্পের অনুরূপ চাল এখানে। কেবল 'কঙ্কাবতী' নয়, পরবর্তী 'লুল্লু', 'বীরবালা', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'ডমরুচরিত', সকল ক্ষেত্রেই একটা টানা গল্পের দেহ থেকে ছোট ছোট গল্প বিকশিত হয়েছে। প্রমথনাথ বিশীর ভাষায় 'তাঁহার' (ত্রৈলোক্যনাথের) প্রায় সমস্ত রচনাই টানা গল্পের ফ্রেমে বাঁধানো ছোট গল্পের সমষ্টি।'[১]

একটা গল্পই পাবে পাবে গল্প খুলে চলছে। পথের শেষে এসে যখন পেছনের শরীরটা গুটিয়ে আনল, দেখল তা অশেষ দৈর্ঘ্যে বিপুল হয়েছে। বাংলা গল্পের লেখ্যধারার অপূর্ব পুষ্টি ও অশেষ অঙ্গীকারের পাশে 'কঙ্কাবতী'তে ত্রৈলোক্যনাথ যে মৌখিক ভঙ্গীটাকে ফিরিয়ে আনলেন, সে ভঙ্গীটা কেবল ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টির মধ্যেই সীমিত রইল না। তা যদি থাকত, এ-ধারার সাহিত্যমূল্য হোত সঙ্কীর্ণ। এই মৌখিক ধারা বিশ শতকের বিভিন্ন দশকের গল্পকারদের মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে'তে এই মৌখিক রীতি অনুসৃত হয়ে অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যভূমিতে এ-ধারা রসসিঞ্চন করেছে। রাজশেখর বসুর সৃষ্টিভূমিকে উর্বর করে এ-ধারা বর্তমান কালের সম্বুদ্ধ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ স্রষ্টার ভূমিতেও প্রবেশ করেছে। ১৮৯২ থেকে বাংলা সাহিত্যের

১০. প্রমথনাথ বিশী—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (বাংলার লেখক)।

লেখ্যধারার গল্পরসের পাশাপাশি মৌখিক ধারার গল্পরস যে তার গতি ও বিকাশ নিয়ে সগৌরবে ও স্বাতন্ত্র্যে শিল্পীর সচেতনতা নিয়ে নবনবরূপরসে বাহিত হয়ে এসেছে, তার প্রথম গৌরব প্রাপ্য ত্রৈলোক্যনাথের।

'কঙ্কাবতী'তে এই গৌরবার্জন-ক্ষমতার প্রথম প্রকাশ, পরবর্তী 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'ডমরুচরিত'-এ পূর্ণ প্রস্ফুটিত।

'কঙ্কাবতী'র পর 'ভূত ও মানুষ'।[১] 'ভূত ও মানুষে'র অন্তর্গত চারটি রচনা :—(১) বাঙ্গাল নিধিরাম, (২) বীরবালা, (৩) লুল্লু, (৪) নয়নচাঁদের ব্যবসা।

'বাঙ্গাল নিধিরাম' আদর্শ প্রেমের উপন্যাস। কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতা উপন্যাসের প্রাকারে কোথাও আসেনি। ত্রৈলোক্যনাথের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। 'বাঙ্গাল নিধিরাম' আমাদের আলোচ্য নয়।

'বীরবালা'র উৎকেন্দ্রিকতার হাসির মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের গুরুবাদের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যেতে পারে। গল্পের আরম্ভেই—"পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন"—এই সতর্কতার উল্লেখে ত্রৈলোক্যনাথ একটু রহস্য করেছেন। সমকালীন গুরুবাদ সমস্যাকে তিনি 'হুতুম প্যাঁচার নক্‌সা'র মত সোজাসুজি 'রোলারসই' না করে, কিংবা 'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথের মত গুরুবাদের ওপর স্পষ্ট ইঙ্গিত না করে, গুরুবাদকে উৎকল্পনার প্রতিবেশে লগ্ন করে দিয়েছেন। সেজন্য উদ্ভট কল্পনার এই প্রতিবেশটি বুঝে গল্প পড়তে পাঠককে সতর্ক করেছেন।

'কঙ্কাবতী'তে যেমন সামাজিক উপন্যাসের ফ্রেমে রূপকথার পরকলার নীচে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্যরসই আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে, 'বীরবালায়'ও গুরুবাদের উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়ে উপভোগ্য হয়েছে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার হাসি। 'অমাবস্যা বাবাজী'র চরিত্রাঙ্কনে গুরুবাদকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, গুরুর নৃশংসতা, কপটতা, লোভ দেখিয়েছেন। গুরুর ওপর নির্ভরতার ফলে ভারত সিংহের নিষ্ক্রিয়তা, স্ত্রীর কান্না, সংসারের পতন, পুত্রের প্রাণ সংশয়, কন্যার মৃত্যু—সব কিছুর মধ্য দিয়ে গুরুবাদের বিশ্বাসের ওপর কটাক্ষ এসেছে। কিন্তু এই অমাবস্যা বাবাজীকে শেষ পর্যন্ত একটা পাখি করে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসিকেই ফলশ্রুতি করে রচনা করলেন। 'সকলে তখন বুঝিলেন যে অমাবস্যা বাবাজী মনুষ্য নন। অমাবস্যা

---

১১. প্রকাশকাল ১৮৯৬, ১৩ই জানুয়ারী।

বাবাজী যেই উড়িয়া যাইলেন, আর ভারত সিংহ যেন চমকিত হইয়া ঘোর নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন।'

অমাবস্যা বাবাজীকে একটি অসম্ভব চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করে লেখক গুরুবাদের ইঙ্গিত-আঘাতকেই গল্পের দেহ থেকে উড়িয়ে দিয়েছেন। উৎকল্পনার হাসির চরিত্রধর্ম ত্রৈলোক্যনাথ এখানে সূত্রাকারে ব্যঞ্জিত করেছেন। সে হল শিল্পিসত্তা সমাজনিবিষ্ট মূল বলে উৎকল্পনার হাস্যজগতে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর ভাবনা, ইঙ্গিত-কটাক্ষ স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার দেহের মধ্যে উদ্ভাবিত করে উৎকল্পনার হাস্যের প্রসন্ন উদ্দাম প্রকাশকেই পথ ছেড়ে দিতে হবে। হাস্যরসের অন্যান্য ধারার সঙ্গে উৎকেন্দ্রিকতার হাসির মৌল পার্থক্যটা এখানেই। 'হিউমার' যেখানে 'with some pain is fraught', স্যাটায়ারের হাসি যেখানে শিখণ্ডী হয়ে আড়ালে 'a blow in the face or back' হানতে উদ্যত, 'উইট'-এ যখন বুদ্ধির মাপা চরণের চালটা উপলব্ধ, ফান্-এ খোঁচাটা পীড়নটা যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে, উৎকল্পনার হাসি সেখানে হাস্যদেহের বিকীর্ণ অশ্রু-আঘাতকে জারিত করে নিয়ে প্রসন্ন উদ্দাম হাস্যেরই ফলশ্রুতি রচনা করে। এ গল্পে অমাবস্যা বাবাজীর ওপর পাঠকমনে যে ঘৃণা ও রাগ দেখা দিয়েছিল, কল্পনার উদ্ভটতার দেহে তা লীন হয়ে হাস্যে পরিণত হল। তখন দেখা গেল গুরুবাদ নয়, গুরুও নয়, অসম্ভব কল্পনার গল্প বলাই কবির প্রধান লক্ষ্য। আর এখানেই উৎকল্পনার হাস্যের সূত্রসন্ধান। 'হুতুম প্যাঁচার নকৃসা'য় কালীপ্রসন্ন সিংহ গুরু প্রসাদক্ষণে গুরুকে রোলারসই করে শোধন করলেন,

'বলো তুমি রাধা আমি শ্যাম',
কাঁধে বাড়ি বলরাম।

—এই দৃশ্যটির উচ্চহাস্যের তলে গুরু তথা গুরুবাদের সামাজিক প্রথাটার আহত রক্তাক্ত চেহারাটা ফুটে উঠেছে। এরপর থেকে গুরু তার শ্যামসত্তা নিয়ে আর শিষ্যকন্যাকে 'রাধা' নাম শেখাতে সাহস পান নি, পদরেণু পাঠিয়েই কর্তব্য সমাধা করেছেন। গুরুবাদের এ-কাহিনীতে কোথাও কল্পনার খেলা নেই। এ-গল্প পড়ে অ-গুরুরা যখন হাসবেন, গুরুরা তখন আশঙ্কিত, ভীত, ক্ষুব্ধ হবেন। ত্রৈলোক্যনাথের বাবাজীকেও জবরদস্ত সিংহ গরম চিমটা দিয়ে নাক চেপে ধরে শাস্তি দিয়েছেন। বাবাজীর নাক পড়্ পড়্ শব্দে পুড়তে

লাগল। দগ্ধ নাক থেকে দুর্গন্ধময় ধূম নির্গত হতে লাগল। তখন বাবাজী যন্ত্রণায় পিঠে পাখা বার করে উড়ে গেলেন। যাকে আঘাত করা হল যখন দেখা গেল সে মানুষই নয় তখন আঘাতের ব্যথাসহ অনুভূতি হাস্যকর হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের যে অসম্ভবতা তাতে করেই 'বীরবালা' রচনায় গুরুবাদের ওপর আঘাতটা, গুরুপীড়নের ব্যথাটা মিলিয়ে গেছে। অ-গুরু পাঠকদের সঙ্গে গুরু পাঠকরাও এ-গল্প পড়ে হেসে উঠবেন। সমস্ত আখ্যানের উৎকেন্দ্রিকতার হাসির ভারসাম্য রক্ষা করেছে এই উদ্ভট পরিবর্তন। 'মুক্তমালা'র সামাজিক পরিবেশেও তিনি গুরুবাদকে তীব্র কষাঘাত করেছেন। কিন্তু এখানে গুরুবাদ সমস্যাটা গল্পে উপস্থিত মাত্র। এ সমস্যাটা লেখকের লক্ষ্যও নয় উপলক্ষ্যও নয়। গল্পটির দেহ ঘিরে যে ভূত ও মানুষের উদ্ভট লীলা, তাতে সমস্যাটা ভেসে গেছে। মিষ্টত্বের মিশ্রণে সুতোর সত্তাটাই একসময় মিষ্ট হয়ে পড়ে। ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে সুতোটা চোখেই পড়ে না। তবু সুতোর দরকার মিছরির তালকে জমাট বাঁধাবার জন্য। গুরুবাদকে কেন্দ্রে রেখে 'বীরবালা'র উৎকেন্দ্রিক গল্পটা লেখক বাঁধতে চেয়েছেন—যেমন 'কঙ্কাবতী'তে উৎকেন্দ্রিকতাকে জমাট বাঁধাতে চেয়েছেন সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্রে রেখে। পাঠক-শ্রোতার কাছে শেষ পর্যন্ত এ সমস্যাটা আর প্রধান হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তী যে 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'ডমরুচরিত' সেখানকার চাল আরও উঁচু ধরণের। উৎকেন্দ্রিকতার রসের তাল জমাতে গিয়ে সেখানে কোন সুতোরই দরকার হয়নি। 'কঙ্কাবতী'র মত 'বীরবালা'য় ত্রৈলোক্যনাথ এই উঁচু চালে পৌছুতে পারেননি।

গুরু অমাবস্যা বাবাজী ভারতসিংহের সদ্যোজাত কন্যা কমলাকে মাটিতে পুঁতে রেখে কমলা হত্যার দায়ে ধর্মদত্তকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত করলেন। ঘটনাচক্রে এদিকে বোগদাদের শাহ সুলতান কন্যাকে তুলে আপন দেশে নিয়ে গেলেন। ধর্মদত্তের স্বামীঅন্তপ্রাণা পত্নী বীরবালা ননদ কমলাকে উদ্ধার করে স্বামীকে মুক্ত করবার জন্য প্রস্তুত হল।

এ পর্যন্ত ঘটনার মধ্যে একটা বাস্তব সম্ভাব্যতার ভিত্তি আছে। মানবচরিত্র নিয়ে ভাবনা আছে। কিন্তু যে পথে বীরবালা কমলাকে উদ্ধার করে স্বামীকে মুক্ত করল, সে পথ উদ্ভট কল্পনার পথ। কোনযুগে, কোনকালে তা সম্ভব নয়।

কঙ্কাবতীতে যেমন একটা সমাজমূলক সম্ভাব্য ভিত্তির ওপর উদ্ভট কল্পনার মৌলিক গল্প গড়ে উঠেছে, বীরবালায়ও একটা সমাজগন্ধী সম্ভাব্য ভিত্তির ওপর

উৎকেন্দ্রিকতার গল্পটা গড়ে উঠেছে। তাতে করে 'বীরবালা'র দেহখানিতে মাঝে মাঝে হাস্যস্রোত মন্থর হয়েছে। কিন্তু কঙ্কাবতীর মত বীরবালায় কোথাও উৎকেন্দ্রিকতার প্রতিবেশের ওপর চরিত্র বা বক্তব্য স্বতন্ত্র ভূমিকা নেবার চেষ্টা করেনি। সেজন্যই 'কঙ্কাবতী'র চেয়ে বীরবালার উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির চালটা যেমন উঁচুদরের হয়েছে, আরেক দিকে এ গল্পের অনেকাংশ জুড়ে হাসি ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। গল্পের আরম্ভে বীর হনুমানের টিকি আকর্ষণ থেকে গল্পের শেষে অমাবস্যা বাবাজীর পাখীরূপে পলায়ন পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে কখনও কখনও মন্থরতা দেখা গেছে। সে ঐ সমাজগন্ধী ভিত্তিটার জন্য —গুরুবাদের সম্ভাব্য সমস্যাটার জন্য। 'বীরবালা' রচনায় উৎকেন্দ্রিকতার হাসি কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তা প্রাথমিকভাবে সাহেবভূতের উদ্ভট আচরণের কাহিনী তুলে দেখান যেতে পারে—

বীরবালা শাহ সুলতানের চিঠি থেকে কমলার সন্ধান পেয়েছিল। এক সাধুর কৃপায় এক কবজ পেয়ে, পৃথিবীর শেষপ্রান্তের খর্বকায় ভূতদের সঙ্গে সেই কবজ নিয়ে টানাটানির পর সবুজ ভূতের [১২] সহায়তায় বীরবালা বোগদাদে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু বোগদাদ-এ এসে খবর পেল, কমলা অন্য হাতে পড়ে বিলাত চলে গেছে। বীরবালা হতাশ হয়ে পড়ল।—

কি করিয়া বিলাত যাইবেন, (বীরবালা) বিষণ্ণবদনে সেইখানে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। নিজের দুরদৃষ্ট ভাবিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নিঃশ্বাসটি যেই ফেলিয়াছেন, আর কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া নিকটে কে কাঁদিয়া উঠিল। চমকিত হইয়া বীরবালা চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে একটি সাহেবভূত। সাহেবভূত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—ওগো তুমি আমার

১২. ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ ভূতের কল্পনা করেছেন, ক'বছর আগে সবুজ মানুষের কল্পনা শোনা গেছে বেতারে। ৬৭বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যার (২২শে মার্চ, ১৯৬৩) 'বেতার-জগৎ' প্রেমেন্দ্র মিত্র, অদ্রীশ বর্ধন, দিলীপ রায়চৌধুরী এবং সত্যজিত রায় গ্রহান্তরের সবুজ মানুষের কল্পনা করেছেন। তবে ত্রৈলোক্যনাথ সবুজ ভূত নিয়ে উদ্ভট কল্পনার হাসি হেসেছেন। এরা সবুজ মানুষ নিয়ে একটি রুদ্ধশ্বাস রহস্যময় কাহিনী রচনার চেষ্টা করেছেন, একটি সায়েন্স-ফিকশনের খসড়া তৈরি করেছেন, "সবুজ মানুষ? হ্যাঁ, সত্যিই সবুজ মানুষ নাকি আছে। সবুজ মানুষ বলা অবশ্য এক দিক দিয়ে ভুল। কারণ মানুষের মত সবকিছু হলেও তারা পৃথিবীর মানুষ নয়। আর তাদের গায়ের রঙও ফিকে সবুজ।" প্রেমেন্দ্র মিত্র : প্রথম অধ্যায় (উক্ত বেতার-জগৎ)।

সহিত এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কেন করিলে? জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলে কেন? এই দেখ আমার শরীরের যোড় সব খুলিয়া গেল।'

বীরবালা দেখিলেন, সত্য সত্যই সাহেব ভূতের শরীরের যোড় সব খুলিয়া যাইতেছে। হাত, পা, নাক, কান খসিয়া পড়িতেছে।

সভয়ে বীরবালা বলিলেন,—'মহাশয়। আপনি যে এখানে বসিয়াছিলেন, তাহা জানিতাম না। আপনার শরীরের যোড় যে এত ভঙ্গুর তাহাও জানিতাম না। তাহা যদি জানিতাম, তাহা হইলে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিতাম।'

সাহেবভূত পুনরায় বলিলেন,—'আমার আঙ্গুল খসিয়া গেল, এখন আঙটি পরিব কোথায়? পা খসিয়া গেল, মল পরিব কোথায়? কান খসিয়া গেল, মাকড়ি পরিব কোথায়?'

সাহেব ভূতের দুঃখে বীরবালা দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'মহাশয় ইহার কি কোনও উপায় নাই?—ভূত বলিলেন,—যদি তুমি কাদা দিয়া আমার হাত পা ভাল করিয়া জুড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি ভাল হই। বীরবালা তাহাই করিলেন। সুস্থ হইয়া সাহেবভূত বীরবালার সমুদয় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল কথা পরিচয় দিয়া বীরবালা সাহেবভূতকে বিলাত যাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সাহেবভূত বলিলেন,—'তার ভাবনা কি? আমি এইক্ষণেই তোমাকে টেলিগ্রাফে বিলাত পাঠাইয়া দিতেছি। জন-সাহেব কমলাকে বিলাত লইয়া গিয়াছেন, রঙ্গিণী মেমের নিকট তোমাকে আমি পাঠাইব। আমি জীবিত থাকিতে রঙ্গিণী আমার স্ত্রী ছিলেন। জন-সাহেবের মেমের সহিত রঙ্গিণীর ভাব আছে। এই বলিয়া সাহেবভূত সমুদ্রের বালি দিয়া বড় একটি টেলিগ্রাফের তার প্রস্তুত করিলেন। বীরবালাকে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন।

বীরবালা তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে সাহেবভূত তারের বাঁটটি টক্ টক্ টক্ করিয়া নাড়িলেন, আর সেই মুহূর্তেই বীরবালা বিলাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে রঙ্গিণীর ঘরের ভিতর গিয়া পৌছিলেন।'

এই সাহেবভূত যদি কোন শ্রেণী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে চায়, তবে দৃঢ় বিশ্বাস, সেই শ্রেণী-মানুষ এই প্রতিনিধিত্বের ইচ্ছাকে উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেবেন।

এই উদ্ভট বাজে কল্পনার কোন মূল্য আছে কিনা জগতের অনেক সময়-হিসেবী কেজো পাঠকরাই তা ভেবে পাবেন না। কিন্তু টেনিসনের 'Idle

Tears'-এর মতই 'Idle Laughter' সৃষ্টি করে স্ফটিকের মত এ উদ্ভট কল্পনা ঝলমল করে উঠেছে। পৃথিবীর 'স্ফটিকধর্মী' মানুষেরা রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র ভীল রমণীর মত এই মুক্তাকে টিপে দেখে কুল নয় বলে ফেলে দেবেন না। উৎকেন্দ্রিক কল্পনার এই হাসি পাঠকের কাছে কেমন ঠেকবে, তা নিয়ে ত্রৈলোক্য-নাথের প্রথমদিকে কিছুটা সংশয় ছিল। সেজন্যই প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী'র মত 'বীরবালা'য়ও তিনি উৎকেন্দ্রিক কল্পনাকে স্পষ্ট দিবালোকে ঘটাতে আশঙ্কা বোধ করেছিলেন। দু-ক্ষেত্রেই উৎকেন্দ্রিক ঘটনাকে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। জ্বরে বেহুঁশ কঙ্কাবতীর স্বপ্নের মধ্যে 'কঙ্কাবতী'র কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতা বয়ন করেছেন। বীরবালা'যও দেবী সিংহের সরযূঘাট-এ অশ্বত্থমূলে মুহূর্তের ঝিমুনির মধ্যে এই 'অদ্ভুত রহস্য' ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্যবস্তুর প্রথম আবির্ভাবটা স্বভাবতই সকুণ্ঠ। 'কঙ্কাবতী' ও 'বীরবালা'য় সেই কুণ্ঠা। পরবর্তী 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'ডমরু-চরিত'-এ এই স্বপ্নের আবরণটা দূরে সরিয়ে স্পষ্ট দিবালোকে, চন্দ্রতারকালোকে উৎকেন্দ্রিকতার কাহিনী রচনা করেছেন।

'লুল্লু'তে প্রথম শ্রেণীর উৎকেন্দ্রিকতার চাল। কঙ্কাবতী ও বীরবালায় প্রতিবেশটা মিশ্রধরণের। অর্থাৎ উৎকেন্দ্রিক কাহিনীর ভূমিকা হিসাবে সমাজ-মূলক কথা এসে পড়েছে। তাতে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার মৌলিক দেহটা আহত হয়েছে। 'লুল্লু'তে অবিমিশ্র উৎকেন্দ্রিক কল্পনার প্রতিবেশের পটে লীন হয়ে রয়েছে চরিত্র ঘটনা। এজন্য চরিত্রের প্রতিটি চরণক্ষেপে, কথাবার্তা-চালচলনে. ভাবনার মধ্যে হাসি উদ্ভিন্ন। আবার এজন্যই আঘাত ইঙ্গিত বেদনা কোথাও দাঁড়াতে পারেনি।

'লুল্লু'র দৃশ্যসজ্জায় আরম্ভ দৃশ্যেই দেখা যাচ্ছে লুল্লু ভূত দিল্লীর আমীর সেখের বাড়ীর ছাদের আলিশার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে। লুল্লু নূতন ভূতগিরি নিয়েছে। সে যখন ভাবছে কাকে ধরবে, তখন শুনল আমীর সেখ তার স্ত্রীকে ধরে নিতে লুল্লুকে ডাকছে—'লে লুল্লু'। আমীর সেখ 'লে লুল্লু' এই বাজে কথাটা বলে স্ত্রীকে ভয় পাওয়াতে চেয়েছেন। লুল্লু ভূতের কথা তিনি জানবেন কি করে? 'কিন্তু যখন বিপত্তি ঘটে, তখন কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসে। আশ্চর্যের কথা এই, লুল্লু একটি ভূতের নাম ছিল। আবার, দৈবের কথা শুন. লুল্লু সেই রাত্রিতে, সেই মুহূর্তে, আমীরের বাটীর ছাদের আলিশার উপর পা

ঝুলাইয়া বসিয়াছিল। হঠাৎ কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সে চমকিয়া উঠিল, শুনিল,—কে তাহাকে কি লইতে বলিতেছে, চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক পরমাসুন্দরী নারী। তাহাকেই লইয়া যাইবার নিমিত্ত লুল্লুকে অনুরোধ করা হইতেছে। এইরূপ সামগ্রী পাইলে দেবতারাও তদ্দণ্ডে নিকা করিয়া ফেলেন, তা ভূতের কথা ছাড়িয়া দিন। চকিতের ন্যায়, দুর্ভাগা রমণীকে লুল্লু আকাশপথে কোথায় যে উড়াইয়া লইয়া গেল, তার আর ঠিক নাই।'

এরকম উদ্ভট পন্থায় বাস্তব জগতে কেউ কোনদিন তার স্ত্রীকে হারায়নি। উদ্ভট কল্পনার অপূর্ব মৌলিকতার এক অনবদ্য কাহিনী। সমস্ত কাহিনীটিই হয়ে উঠেছে প্রসন্ন উচ্চহাস্যের তরঙ্গে সফেন।

ত্রৈলোক্যনাথ 'কঙ্কাবতী' ও 'বীরবালা'র চেয়ে অসম্ভব কল্পনার হাসি সৃষ্টির দ্বিমুখী চালটা নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছেন পরবর্তী রচনায়। 'লুল্লু'তে এই চালটির সুনিপুণ আয়ত্ত ঘটেছে।

আমীর সেখের স্ত্রী হারানো ঘটনাটার উদ্ভট মৌলিকতাটাই উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টির পক্ষে চ্যাম্পিয়ান কল্পনা। অতিরিক্ত, এই উদ্ভট অসম্ভবকে বিশ্বাস্য করে তুলবার ছদ্মচালটা প্রয়োগ করে উচ্চহাস্যের দ্বিতীয় চালটি এখানে আয়ত্ত করেছেন। এ ঘটনাটা যে উদ্ভট অবিশ্বাস্য হাস্যকর ঘটনা, লেখক একথা যেন কিছুতেই স্বীকার করতে চান না। বরং গম্ভীরভাবে প্রমাণ করতে বসলেন—যখন বিপত্তি ঘটে, দৈব যখন বিরুদ্ধে থাকে তখন এরকম ঘটনাও জীবনে ঘটে। দিল্লীর আমীর সেখের ঘটনা তারই তো প্রমাণ। উপরন্তু স্ত্রী চুরির পর আমীরের অশ্রুপাত দেখিয়ে, বিলাপ শুনিয়ে, সত্যটাকে আরও প্রমাণ করতে চাইলেন। আমীর বিবির সতীত্বের নানা নজির দিলেন, পাড়া-প্রতিবেশীর সমবেদনার কথা, সন্দেহের কথা বললেন। দিল্লীতে একবার গিয়ে খোঁজ-খবর নিলে আমীরের দৈববিপত্তির এই করুণ কাহিনী যেন সবার মুখে শোনা যাবে। অথচ এদিকে এমনই এক উদ্ভট অসম্ভব কাহিনী ফেঁদে রেখে দিয়েছেন, যার হাস্যকর অবিশ্বাস্যতা কোন বিশ্বাস দিয়েই ঢাকা যাচ্ছে না। এ যেন আপ্রাণ চেষ্টায় উদ্গত হাসি চেপে রেখে গম্ভীরতার ভাণ করে একজনকে কিছু বিশ্বাস করাতে যাওয়া। নিজের মুখের ভাবাবস্থাটা তখন নিজে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বোঝাবার লক্ষ্য যে মানুষটি, সে যদি দু' বছরের কচি খোকাও হয়, শাসকের অবস্থাটা দেখে সে হেসে উঠবে।

'লুল্লু'তে তাই ঘটেছে। অবিশ্বাস্য অসম্ভবের হিমালয়টাকে বিশ্বাসের ছেঁড়া চাদরটা দিয়ে ঢাকতে গিয়ে উচ্চহাস্যকে আরও উচ্চ করে তুলেছেন।

আমীরের বিবি-উদ্ধারে ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনার উদ্ভটতা চরমে উঠেছে। শোকাতুর আমীর এক মুসলমান রোজা, সদাশয় ব্রাহ্মণ, কালোয়াতি সঙ্গীত-নায়ক তাঁতি, অশ্বত্থ গাছের ভূত, অন্ধকূপের বিরহক্লিষ্ট ঘ্যাঘোঁ ভূত—এদের সাহায্যে সংবাদ পেলেন—লুল্লু তার বিবিকে হিমালয় প্রদেশে ভীমতাল নামক এক হ্রদের ভিতরে পাহাড়ের গায়ে ঘর খুদে সেখানে রেখেছে। একবছরের মধ্যে যদি বিবি লুল্লুকে নিকা না করে, বিবির প্রাণ সংশয়। কিন্তু লুল্লুর সে ঘর থেকে কী করে বিবির উদ্ধার সম্ভব। ঘ্যাঘোঁ ভূত বলল—"যদি তোমরা একটি হৃষ্ট-পুষ্ট ভূত ধরিয়া তাহার তেল বাহির করিতে পার, আর যদি সেই তেল মাখিয়া জলে প্রবেশ কর, তাহা হইলে লুল্লুর ঘরে পৌছিতে পারিবে। তারপর কৌশল করিয়া আমীরের স্ত্রীকে উদ্ধার করিও। তা বলিয়া যেন আমাকে ধরিয়া তেল বাহির করিও না। মনের খেদে জরজর আছিই, তার উপর আবার তাঁতির গান শুনিয়া আমার শরীরে আর শরীর নাই, এক বিন্দুও তেল বাহির হইবে না। তবে এক কাজ কর, এই মাঠের প্রান্তভাগে একটি গাছ আছে। সেই গাছে গোঁ গোঁ নামে একটি গলায়-দড়ি ভূত বাস করে। নিকটে গ্রামের লোককে গলায় দড়ি দিয়া মরিতে সে প্রবৃত্তি দিয়া থাকে। যে কেহ তাহার প্রলোভনে পতিত হয়, সে এই গাছে আসিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরে। শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু হইবে বলিয়া, এই ভূত তখন তাহাদের পা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়ে। তোমরা যদি এই ভূতটিকে ধরিয়া তেল বাহির কর, তাহা হইলে আমি বড়ই সন্তোষলাভ করি। কারণ, সে দুরাচার আমার পরম শত্রু। আমার যেখানে বিবাহের সম্বন্ধ হয়, সে গিয়া ভাংচি দিয়া আসে। প্রেতিনী শঙ্খচুনী প্রভৃতি নানাপ্রকার ভূতিনীদের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। দুই এক স্থানে কন্যাও দেখিতে গিয়াছিলাম, কন্যা দেখিয়া মনও মোহিত হইয়াছিল। কিন্তু এই দুরাচার গিয়া কন্যার পিতামাতার কাছে আমার নানারূপ কুৎসা করে। সেজন্য—দুঃখের কথা বলিব কি। ভূতগিরি করিতে করিতে বুড়া হইয়া যাইলাম। আজ পর্যন্ত আমার বিবাহ হয় নাই। সংসারে আমি আধখানা হইয়া আছি, পুরা ঘ্যাঘোঁ হইতে পারিলাম না।"

ভূতের চরিত্রে, মানব চরিত্রের ভাবনা, দুঃখ বেদনা আরোপিত করে

আমাদের সঙ্গতিবোধকে প্রচণ্ড হাস্যে নাড়া দিয়েছেন। তার ওপর ঘ্যাঘোঁর দুঃখ যেন লেখক কত যত্ন নিয়ে আমাদের বোঝাতে চাচ্ছেন।—লেখকের এই ছদ্মগম্ভীর চালটা পূর্বের অসঙ্গতিকে আরও তীব্র করে হাস্য উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে।

ঘ্যাঘোঁর কথায় আমীর চিন্তিত হলেন। স্ত্রীর উদ্ধার অসম্ভব দেখে কাঁদলেন। শেষে অনেক চিন্তা করে গোঁ গোঁ ভূতকে ধরতে চললেন। আমীরের গোঁ গোঁ ভূত ধরার কাহিনী উৎকেন্দ্রিকতার উচ্চহাস্যের এক অদ্ভুত কাহিনী। 'অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আমীর মাথা হইতে পাগড়ীটা খুলিলেন। পাগড়ীটা উত্তমরূপে পাকাইলেন, আর তাহার এক পাশে একটি ফাঁস করিলেন। এইরূপে সুসজ্জ হইয়া, যে আমগাছে গোঁ গোঁ নামক গলায়-দড়ি ভূত থাকে, সেইদিকে চলিলেন। গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া গাছের উপর উঠিতে লাগিলেন। অনেক দূর উঠিয়া গাছের ডালে পাগড়ীর অপর পার্শ্ব বাঁধিয়া ফাঁসটি গলায় দিতে উদ্যত হইলেন। ফাঁসটি গলায় দেন আর কি, এমন সময় চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই গলায়-দড়ি ভূত সহাস্যবদনে তাঁহার সম্মুখে আর একটি ডালে বসিয়া রহিয়াছে।

ভূত বলিল,—'নে নে শীঘ্র শীঘ্র গলায় ফাঁস পরিয়া ঝুলিয়া পড়, নীচে হইতে আমিও সেই সময় তোর পা ধরিয়া টানিব এখন, তা হইলে সত্বর তোর মৃত্যু হইবে, তাহা হইলে আমার বেকার নাতি জামাই তোর ভূতগিরি করিতে পারিবে।' আমীর কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে জেব হইতে আফিমের কৌটাটা বাহির করিলেন। কৌটাটির ঢাকনা ভূতের সম্মুখে ধরিলেন। ভূত তাহাতে উঁকিঝুঁকি মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ওর ভিতর ও-কে?' আমীর বলিলেন—'একটি ভূত।' গোঁ গোঁ বলিল,—'ভূত। কৈ। ভাল করিয়া দেখি।' খুব ভাল করিয়া দেখিয়া গোঁ গোঁর নিশ্চয় বিশ্বাস হইল যে, ভূত বটে। সে জিজ্ঞাসা করিল—'উহার ভিতর তুই ভূত ধরিয়া রাখিয়াছিস কেন?' আমীর বলিলেন—'আমি একখানি খবরের কাগজ খুলিবার বাসনা করিয়াছি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক-এর প্রয়োজন। ডিবের ভিতর যে ভূতটি ধরিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে সহকারী সম্পাদক করিব। আর তোরে মনে করিয়াছি সম্পাদক করিব।' গোঁ গোঁ বলিল—'আমি যে লেখাপড়া জানি না।' আমীর বলিলেন—'পাগল আর কি। লেখাপড়া জানার আবশ্যক

কি? গালি দিতে জানিস ত?' গোঁ গোঁ বলিল—'ভূতদিগের মধ্যে যে সকল গালি প্রচলিত আছে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি।' আমীর বলিলেন—'তবে আর কি। আবার চাই কি? এতদিন লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষ যা কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীল ভাষা পর্যন্ত, সব খরচ হইয়া গিয়াছে, সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব। আমার অনেক পয়সা হইবে।' ভূত বলিল—'তবে কি তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে না? ঐ যে পাগড়ী, ঐ যে ফাঁস?' আমীর বলিলেন—'আমি ত আর ক্ষেপিনি যে, গলায় দড়ি দিয়া মরিব। পাগড়ি আর ফাঁস হইতেছে টোপ, ওরে বেটা। তোরে ধরিবার জন্য টোপ। যদি এ ফন্দি না করিতাম, তাহা হইলে তুই কি গাছের ভিতর হইতে বাহির হইতিস? এখন চল, ইহার ভিতরে প্রবেশ কর।' এই বলিয়া আমীর তাহাকে চোঙর নলটি দেখাইলেন। ভূত জিজ্ঞাসা করিল, 'ও আবার কি?' আমীর বলিলেন—'এর নাম আটখিল্লে। সাধুভাষায় ইহাকে থক্ বলে। নলের ভিতর যদি না প্রবেশ করিস তাহা হইলে ইহা দিয়া তোর চক্ষু উপড়াইয়া লইব।' বাস্তবিক থক্‌টি তখন যেরূপ চক্‌চক্ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সে আজন্মকাল ভূতের চক্ষু তুলিয়া আসিতেছে। যেন ভূতের চক্ষু না তুলিয়া থক্ কখনও জলগ্রহণ করে না। আর যেন আমীর যদি নাও উপড়ান থক্ নিজে গিয়া সেই মুহূর্তে ভূতের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবে। এই প্রকট মূর্তি দেখিয়া ভূত বড়ই ভয় পাইল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মনে করিল,—'কাজ নাই বাপু। পরের চাকর হইয়া, এডিটারি করিয়া না হয় খাইব। তা বলিয়া অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিব না।' এই ভাবিয়া সে আপনার কলেবর হ্রাস করিল, আর সুড়সুড় করিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করিল। নলের ছিদ্রে ভাল করিয়া শোলা আঁটিয়া দিয়া আমীর গাছ হইতে নামিয়া আসিলেন।

আমীরের মনে এখন কিঞ্চিৎ স্ফূর্তির উদয় হইল। শিষ দিতে দিতে তিনি গ্রামাভিমুখে চলিলেন। গ্রামে উপস্থিত হইয়া লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমাদের এ গ্রামে কলুর বাড়ি আছে?' লোকে বলিল, 'হ্যাঁ আছে।' কলুর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমীর কলুকে বলিলেন, 'কলু ভায়া, আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি

ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া সেই ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।' কলু বলিল—'তার আটক কি। এখনই দিব। তিল, সরিষা, তিসি, পোস্ত, কত কি পিষিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব, সে আর কি বড় কথা। কৈঁ, লইয়া এস।' দুইজনে ঘানিগাছের কাছে গেলেন। আমীর নল হইতে ভূতটিকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া ঘানিগাছের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কলু তৎক্ষণাৎ ঘানি চালাইয়া দিলেন। কলুর বলদ মৃদুমন্দ গতিতে ঘুরিতে লাগিল। ভূতের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল। ভূত—'ত্রাহি মধুসূদন। ত্রাহি মধুসূদন।' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আর বলিতে লাগিল—'এই বুঝি তোমার এডিটারির পদ্? এই বুঝি খবরের কাগজের সম্পাদকতা করা?' আমীর হাসিয়া কহিলেন—'জান না ভায়া। সম্পাদক হইতে আমি এইরূপেই প্রবন্ধ বাহির করিয়া থাকি। কেমন। উত্তম উত্তম গালি, ভাল ভাল প্রবন্ধ এখন মনে উদয় হইতেছে ত? গোঁ গোঁ ভায়া। সেকালের হরিণের গল্পটাও কি ছাই শুন নাই? যাহাতে কথা আছে—ওহে ভাই শশধর। আগে এ দায়ে ত তর, তারপর কাজ কাম কর আর না কর।' ঘানি হইতে ক্রমে ক্রমে টপ টপ করিয়া তেল পড়িতে লাগিল। প্রায় এক শিশি তেল প্রস্তুত হইল। যখন ভূতের দেহ একেবারে তেলশূন্য শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বলদ থামিল, ঘানিগাছ আর ঘুরিল না। আমীর সেই ছোবড়ারূপ ভূতকে বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বলাবাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোনকালে মরিয়া যাইত।'

গোঁ গোঁকে কলুর ঘানিতে পেষণের মধ্যে পীড়ন অনুভব করতে গেলে হাসি আরও উচ্ছ্বসিত হবে। কারণ ভূত পিষে তেল বার করবার কল্পনা করা, ভূতের হাড় মড় মড় করে ভাঙ্গার কল্পনা করা, ভূতের ত্রাহি মধুসূদন ডাক—এ এমন এক দুর্দান্ত উদ্ভট কল্পনা যে ভূত পীড়নের ভাবনাটাই হাস্যকর হয়ে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথ—'বলাবাহুল্য যে, ভূত না হইয়া যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কোন্‌কালে মরিয়া যাইত—'এই ছত্রের হাস্যকরকেই লক্ষ্য করেছেন।

পাঠকসমাজ গোঁ গোঁ ভূতকে কাগজের সম্পাদকের প্রতিনিধি মনে করতে পারেন। গোঁ গোঁর হাড় ভাঙ্গার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গরূপ কলুর ঘানিতে সম্পাদকের হাড় ভাঙ্গার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে ত্রৈলোক্যনাথকে তীব্র

স্যাটায়ারিস্ট মনে করতে পারেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিস্বভাব এই মন্তব্যের বিরুদ্ধতা যেমন করছে, 'লুল্লু' কাহিনীর সমাপ্তিতে আমীর যখন এই গোঁ গোঁকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে তাকে কাছে টেনে ব্যথা দেবার জন্য দুঃখ বোধ করলেন, এবং গোঁ গোঁকে নিজের কাছে রেখে তার সেবার ভার নিলেন, তখন আর ত্রৈলোক্যনাথ স্যাটায়ারিস্ট, দাঁড়াচ্ছে না। বস্তুত একদিকে লেখকের প্রসন্নদরদী শিল্পিমনের স্পর্শ, আরেক দিকে কল্পনার প্রচণ্ড উদ্ভটতা— এই দুয়ের মিলিত স্রোতে কোনরকম আঘাত ইঙ্গিত দাঁড়াতে পারেনি। উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যস্রষ্টার সামাজিক সত্তাটা এই পরিচিত সমাজটার একদিকের বিকৃতির ওপর একটু ইঙ্গিত করে বসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভূতের তেল বার করার মৌলিক উদ্ভট কল্পনায় ইঙ্গিত কোথায় ভেসে গেছে। স্রষ্টা তাঁর উদ্ভট কল্পনার হাস্যদানিটা থেকে হাসি ছড়িয়ে ইঙ্গিতকে হাস্যে ভিজিয়ে দিয়েছেন। পত্রিকার সম্পাদকেরা, পত্রিকার লেখক এ গল্প পড়ে হাসতে গিয়ে তাদের প্রতি এই ইঙ্গিতে ও সাবধান বাণীতে লজ্জা পাবেন, কিন্তু লজ্জা পেয়ে আবার উচ্চহাস্য হেসে উঠবেন। সুইফট্ বা বঙ্কিমের মত উৎকেন্দ্রিক কল্পনার কাঠামোকে ত্রৈলোক্যনাথ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করার ছদ্মবেশ হিসাবে কখনওই গ্রহণ করেন নি। কল্পনার উদ্ভটতা দিয়ে পাঠক সমাজকে প্রসন্ন হাস্যের আনন্দ দেওয়া তাঁর লক্ষ্য। এই লক্ষ্যপথে ইতস্তত বিকীর্ণ ইঙ্গিতকটাক্ষ এসে একদিকে গল্পরসকে বৈচিত্র্য দিয়েছে আরেক দিকে হাসিকেই উচ্ছ্বসিত করেছে। ইঙ্গিত-কটাক্ষের উপস্থাপনায় উদ্ভটতাকে বিশ্বাস্য করে তুলবার একটা ছদ্ম প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। প্রচণ্ড উদ্ভটতার হাসির গায়ে লেগে এই প্রয়াসটা যত আঘাত পেয়েছে হাসি ততই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। তেলের শিশিটি পকেটে নিয়ে আমীর হিমালয়মুখী হলেন। এর পরের কাহিনীতে আমীর ভূতের তেল মেখে অনায়াসে ভীমতল হ্রদের ভিতরে লুল্লুর ঘরের সন্ধান পেলেন। দিনের বেলা আমীর একটা গর্তে লুকিয়ে থাকেন, রাতে যখন লুল্লু চরতে যায়, তখন আমীর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উদ্ধারের পথ ভাবেন। স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমীর ঠিক করলেন, চণ্ডুর মাহাত্ম্য লুল্লুর উপর প্রয়োগ করবেন। গল্পের চণ্ডুমাহাত্ম্য অধ্যায়ে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভট কল্পনা চরমে পৌঁছেছে।

আমীরের পরামর্শে আমীর-বিবি লুল্লুর সঙ্গে প্রিয় ব্যবহার করতে প্রস্তুত হ'ল। 'প্রাতঃকাল না হইতে হইতে ভূত বাটী ফিরিয়া আসিয়াই, প্রথমে

আপনার গর্তে গিয়া শুইল। ঘোরতর নাক ডাকাইয়া অনেকক্ষণ নিদ্রা যাইল। তারপর উঠিয়া হ্রদের জলে স্নান করিতে যাইল। পাথর দিয়া, সাবাং দিয়া উত্তমরূপে গা মাজিল। শরীরের নানাস্থানে রক্ত ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। আপনা-আপনি বলিল—'ক্রমে ক্রমে এইবার দুধে আলতার রঙ হইয়া আসিতেছে', তারপর সাজগোজ করিয়া আমীর রমণীর নিকট গমন করিল। বলিল—'সুন্দরি, দেখিতেছ? দিন দিন কি হইতেছি? দুধে আলতার রং?' আমীর রমণী বলিলেন, 'তাইতো। তোমাকে যে আর চেনা যায় না।' ভূত বলিল—'পাথর, ঝামা, বালি, সাবাং।' আমীর রমণী বলিলেন—'সত্য সত্যই তুমি সভ্য-ভব্য-নব্য ভূত।' ভূত বলিল—'তবে কাজি ডাকি?' আমীর রমণী বলিলেন—'কাজি ডাকায় আমার কিছু আপত্তি নাই, তবে কিনা জান, তুমি হইলে ভূত, আমি হইলাম মানুষ, দুইজনে মিলিবে কি করিয়া তাই ভাবিতেছি। মানুষের মত একটু-আধটু যদি তোমার ব্যবহার দেখি, তাহা হইলে বুঝি, হাঁ দুইজনে পরিণয় হইতে পারিবে। এই দেখ, এত খাদ্যদ্রব্য তুমি আমাকে আনিয়া দাও, নিজে কিছু একদিনের জন্যেও একটু খুঁটিয়া মুখে দাও না। কি খাও, কি না খাও, তাহাও জানি না। সাপ খাও, কি ব্যাং খাও,—কিছুই বলিতে পারি না। হয়তো কোন দিন পচা মড়া খাইয়া আমাব নিকট উপস্থিত হইবে। মুখের গন্ধে আমার প্রাণ বাহির হইবে। তারপর দেখ, মানুষে পান খায়, তামাক খায়, গাঁজা খায়, আরও কত কি খায়। আহা আমার স্বামী আমীর কেমন চণ্ডু খাইতেন। কাছে বসিয়া মনের সাধে কেমন তাঁহাকে আমি চণ্ডু খাওয়াইতাম। যখন চণ্ডুর ধূম আমার নাকে প্রবেশ করিত, তখন কেমন আমি স্বর্গসুখ লাভ করিতাম। তাঁহার চণ্ডুর আসবাবগুলি আমি আমার কাঁধের ঝুলি করিয়া রাখিয়াছিলাম। শয়নে উপবেশনে সর্বদাই আমার নিকট রাখিতাম। আহা, আজ পর্যন্ত সেই ঝুলিটি আমার কাঁধেই রহিয়াছে।' ভূত বলিল—'বটে। তা আমিও চণ্ডু খাইব, নিয়ে এস, এখনি খাইব।' আমীর রমণী বলিলেন—'তাহা যদি করিতে পার তো বড় ভালই হয়। ভূত-ভূতিনীদিগের কাছে তুমি সভ্য-ভব্য-নব্য ভূত বটে, কিন্তু আমাদের নাকে তোমাদের গায়ের একটু গন্ধ লাগে, একটু বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ। রীতিমত চণ্ডু খাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে, আর তোমার গায়ে সে গন্ধ আসিবে না।

মানুষ মানুষ গন্ধ হইবে।' ভূত বলিল—'তা দাও, খাইব।' আমীর রমণী বলিলেন—'কাঁচা আফিমই হউক, কি গুলি হউক, কি চণ্ডু হউক, অল্প অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করিতে হয়। একেবারে অধিক খাইলে অসুখ করে। তোমার অসুখ করিলে প্রাণে আমি বড়ই ব্যথা পাইব। কারণ তোমার প্রতি এখন আমার নব অনুরাগ বই তো নয়? যাহা হউক চণ্ডু গুইয়া খাইতে হয়।' এই বলিয়া আমীর রমণী চণ্ডুর আসবাব বাহির করিয়া দিলেন।'

চণ্ডুর মাহাত্ম্য লুল্লুর ওপর মোক্ষম কাজ করল। লুল্লু চণ্ডুপানে যখন বিলক্ষণ অভ্যস্ত হল, তখন আমীরের পরামর্শে বিবি লুল্লুকে চণ্ডু দেওয়া বন্ধ করল। চণ্ডু না পেয়ে সে কেবল আকর্ণপূরে হাই তোলে। মন তার অবসন্ন, শরীর অবসন্ন, সর্বদেহে অসহ্য বেদনা। তখন বিবির হাত ধরে আমীর হাসতে হাসতে লুল্লুর কাছে এসে দাঁড়ালেন। ভূত চিঁচিঁ করিয়া বলিল—'এ বিপদের সময় মুখনাড়া দিচ্ছিস আবার কেরে', আমীর বলিলেন—'আমি আমীর, এই রমণীর স্বামী যাহাকে তুই নিদারুণ ক্লেশ দিয়াছিস, তাই আজ তোর যাতনা দেখিয়া বড়ই প্রীতি লাভ করিতেছি।' ভূত বলিল—'তোমার জরু তুমি ফিরিয়া লও, অমন জরুতে আমার কাজ নাই বাবা। ওতো জরু নয়। সুখে স্বচ্ছন্দে ভূতগিরি করিতেছিলাম—একি বাপু। ভূতের আবার চণ্ডু খাওয়া কি? ঐ তো আমাকে মজাইল। এখন তোমার কাছে যদি আফিম কি চণ্ডু থাকে ত দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। ধড়ে প্রাণ আসিলে তোমার স্ত্রীকে এবং তোমাকে ঘরে লইয়া যাইব। কেবল ঘরে রাখিয়া আসিব না এখন দেখিতেছি আমাকে চিরকাল তোমার গোলামি করিতে হইবে। চণ্ডু না খাইলে ত আর বাঁচিব না। সুতরাং চণ্ডুর জন্য তোমার গোলামি করিতে হইবে। দুইবেলা চণ্ডু দিও, যা বলিবে তাহা করিব। তোমার সংসারে ভূতের মত খাটিব।' আফিমের মহিমা আমীর ভাল রূপেই জানিতেন। তিনি বুঝিলেন, লুল্লু যাহা বলিতেছে তাহা প্রকৃত কথা। প্রতারণা ইহাতে কিছুই নাই। পকেট হইতে বাহির করিয়া প্রথমে তাহাকে একটু কাঁচা আফিম খাইতে দিলেন। ইহাতে ভূতের শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। শরীরের অস্থি সমুদয় পুনরায় যে যাহার স্থানে গিয়া জোড়া লাগিল। তখন সে উঠিয়া বসিল। তারপর আমীর তাহাকে চণ্ডু পান করিতে দিলেন। তাহাতে তাহার দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হইল, শরীর স্বচ্ছন্দতা লাভ করিল।

লুল্লু তখন আমীরের পদতলে পড়িয়া বলিল,—'মহাশয়। আপনার নিকট আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী, বড়ই দোষ করিয়াছি, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জনা করুন। বড়ই নিদারুণ ক্লেশ হইতে আপনি আমাকে মুক্ত করিলেন। আপনার ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পরিব না। চিরকাল দাসানুদাস হইয়া আপনার এবং এই বিবিজীর সেবা করিব। এখন সকাল সকাল আহারাদি করিয়া লউন। আজই রাত্রিতে আপনাদিগকে ঘরে লইয়া যাইব।'

লুল্লু আমীর ও তার বিবিকে দিল্লীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমীর ও লুল্লু দুজনে একসঙ্গে শুয়ে অনেকক্ষণ মনের সুখে চণ্ডু পান করলেন। 'ভূতে ও মানুষে ক্রমেই বড়ই ভাব হইল। একদিন চণ্ডু খাইতে খাইতে আমীর বলিলেন—'হে লুল্লু। হে চণ্ডুসেবক কুলতিলক। আমার বড়ই সাধ হইতেছে যে, পুনরায় বন্ধুদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ করি—যাঁহারা স্ত্রী উদ্ধারের বিষয়ে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন তুমি আমার শত্রু ছিলে, এখন কিরূপ প্রাণের মিত্র হইয়াছ, তাহাও তাহারা একবার আসিয়া দেখুন। প্রথম হইতেছেন সেই জীন্, যিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ। তারপর সেই কলুর পো, যার মত তৈল-নিষ্পীড়ক জগতে আর নাই, হইবেও না। আর যদি ভূতদিগকে আনিতে পার, তাহা হইলে ত বড়ই সন্তুষ্ট হই। সেই ভূত-তত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের ভূত, সেই অমানুষিক অভৌতিক প্রেমিক ঘ্যাঘোঁ আর সেই ভাবী সম্পাদক তৈল-প্রদায়ক গোঁ গোঁ। তোমার গেঁটে দাদার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে বড়ই ইচ্ছা। আর একটি কথা—আহা। ঘ্যাঘোঁর বিবাহ হয় নাই, তাহার সেই নাকেশ্বরীকে আনিয়া যদি দুইজনে মিলন করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ই সন্তুষ্ট হই। লুল্লু বলিল—'আপনার সমুদয় আদেশ পালন করিতে আমি সমর্থ। আমি এই রাত্রিতেই সকলকে এখানে আনিতেছি।'

সেদিন রাতে দিল্লীতে আমীরের গৃহে ভূতে মানুষে সমস্ত শত্রুতা ভুলে পরম উল্লাসে নানাবিধ চর্ব্যচূষ্য লেহ্য-পেয় পান ভোজ চলল। মানুষের গৃহে ভূত ভূতিনীর মিলন হল। আমীর নিজে ঘ্যাঘোঁ ভূতের হাতে নাকেশ্বরী পেতনীকে সমর্পণ করলেন। ঘ্যাঘোঁ নববধূর রূপমাধুর্য দেখে সলজ্জ হাসি হাসল। মানুষের সুখ-হাসি-আনন্দের সঙ্গে ভূতের আনন্দ-লজ্জা-হাসি মিলেমিশে এক প্রসন্ন হাসির জগৎ রচিত হল। ত্রৈলোক্যনাথ এই প্রসন্ন হাসির মিলনের জগতে যাকে

আঘাত করে বসেছেন, ইঙ্গিত পীড়ন করে বসেছেন, পরক্ষণে তাকে কাছে টেনে শুশ্রূষা সেবা করে আঘাত বেদনা দূর করে দিয়েছেন। যে লুল্লু স্ত্রীহরণ করেছে, আমীর তাকে চণ্ডু খাইয়ে কিছু কষ্ট দিয়েছিলেন। কিন্তু স্ত্রী হরণকারীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তাকে কাছে টেনে পাশে শুইয়ে আমীর তার ব্যথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। লুল্লুও আমীরের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রসন্নতায় সহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছে। গোঁ গোঁকে কলুর ঘানিতে পিষে কষ্ট দিয়েছেন আমীর। আবার আমীর নিজেই তার সেবা করলেন। সব ভূত চলে গেলে আমীর গোঁ গোঁকে বললেন—'গোঁ গোঁ। তুমি যাইও না। তোমার অস্থি মজ্জা সমুদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আফিম আর দুধ, এই দুই বস্তু নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিলে তোমার শরীর পুনর্গঠিত হইতে পারে।' গোঁ গোঁ আমীরের সহৃদয়তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে আমীরের কাছেই রইল।

এতো ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের চরিত্রের কথা নয়। ত্রৈলোক্যনাথের মানস গঠনে এই সহৃদয়তা, প্রসন্নতা। তারই প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। তাঁর উদ্ভট কল্পনার গল্পধারায় কল্পনার চরম উদ্ভটতার হাস্যের তলে এই সহৃদয় দরদী মনের স্পর্শ সঞ্চারিত থাকায়, এ জগৎ সকল রকম আঘাত দাহপীড়ন মুক্ত হয়ে প্রসন্ন উচ্চহাস্যের জগৎ হতে পেরেছে।

হাস্যরসের সৃষ্টিতে যাঁরা জগতের সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বল যশঃ-কিরীট্ মাথায় পরে আছেন—সেই হিউমারিস্টদের হাস্যের মূল আবেদন প্রসন্ন হাস্যের আবেদন। ত্রৈলোক্যনাথ সেই প্রসন্ন হাসির সঙ্গে উচ্চহাসি যোগ করে দিয়েছেন। উচ্চহাস্যের জন্যই হাসির ফ্রেমে হিউমারের অশ্রু বাঁধা পড়তে পারেনি। অশ্রুও হেসে উঠেছে। ত্রৈলোক্যনাথের মূল আবেদন প্রসন্ন উচ্চ হাসির আবেদন।

বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরসের ধারায় 'কঙ্কাবতী' উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যের এই যে নূতন ধারার সূচনা করেছে, 'লুল্লু'তে সে ধারার চরম উৎকর্ষ দেখা গেল।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা'-য় এই উৎকর্ষের আরেক ধাপ অগ্রসরণ। 'লুল্লু'তে উদ্ভট খেয়ালের অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তি বিসদৃশের সমাবেশ কৌশলে আমাদের যে প্রচুর হাসির উপাদান এনে দিয়েছে, 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় তারই আরেক ঝলক ছড়িয়ে পড়ে আমাদের সমস্যাজটিল, রূঢ় বাস্তব জীবনটাকে আনন্দময় করে তুলেছে।

'লুল্লু'র মত 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য়ও উদ্ভট মৌলিকতার যে প্রতিবেশটি হাস্য সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে লীন হয়ে আছে চরিত্র ঘটনা। সমাজের ওপর মাঝে মধ্যে ইঙ্গিত কটাক্ষ এসেছে। কিন্তু উদ্ভটতার পরিবেশটা ছাড়িয়ে তা কোন স্বতন্ত্র ভূমিকায় দাঁড়াতে পারেনি। চরিত্র তাদের চলা-বলায়, কথাবার্তা আচরণে কোথাও প্রতিবেশটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র কোন জিজ্ঞাসা, ভাবনা, বক্তব্যের ভূমিকা নেয়নি। এর ফলেই রচনার সর্বদেহ জুড়ে উৎকেন্দ্রিকতার উচ্চ প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে আছে।

নয়ন, লম্বোদর, গগন প্রভৃতির সান্ধ্যআসর বসেছে ফরাসডাঙ্গায়, এক আড্ডাঘরে। এ-আসরে নিত্যক্রিয়াটি চলে। নিত্যক্রিয়া অর্থে গুলি খাওয়া। এ ক্রিয়াটির গুণ এই যে, মাঝে মাঝে মজার কথা চাই। আড্ডার সকলে নয়নচাঁদকে ধরে বসল,—নয়ন কি করে বড়লোক হল—সেই ভাগ্য ফেরার কাহিনী বলতে হবে। নয়নচাঁদের ভাগ্য ফেরার উদ্ভট কাহিনীই 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'।

নয়নচাঁদের বড়ই দুর্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনদিন হয়, কোনদিন হয় না। এমন অবস্থায় নয়ন শুনল কোলকাতায় বসন্তের হিড়িক পড়েছে। ধূর্ত নয়নচাঁদের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। 'জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটি লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটি শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দূর মাখাইলাম। টানাটানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম। পুরাতন রাংতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় চলিলাম।'

যে পাড়ায় নয়ন উপস্থিত হল, সেখানে শীতলার এক পাণ্ডা ছিল। বসন্তে তার দুই পুত্রের মৃত্যু ঘটায় পাণ্ডা শীতলা ভেঙে দেশে চলে গেছে। নয়ন এ অবস্থায় তার ধূর্ত বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে পাড়ায় বিলক্ষণ পসার করে বসল। নিজে একটি শীতলার ছড়া বেঁধে শীতলা হাতে দোরে দোরে গান করে চলল।—

শীতলা বলেন আমি যার ঘরে যাই।
ছেলে বুড়ো আণ্ডা বাচ্চা টপ টপ খাই॥
চৌষট্টি হাজার এই বসন্তের দল।
গৃহস্থের ঘরে গিয়া দেয় রসাতল॥

বড়বসন্ত ছোটবসন্ত বসন্তের নাতি।
কারো ঘরে নাহি রাখে বংশে দিতে বাতি॥
ডেকে বলে যত ঐ কাল বসন্তের পাল।
পাঁঠাছাড়া কোরে ছাড়াই লোকের গায়ের ছাল॥
ফাটা বসন্ত বলে আমরা কেও-কেটা নই।
ফেটে মরে মানুষ যেন তপ্ত খোলার খই॥
নেচে নেচে বলে ওই ধসা বসন্ত যত।
মাংস পচা গন্ধে প্রাণ করি ওষ্ঠাগত॥
পাতাল মুখো বসন্ত বলে নীচে কোরে মুখ।
হাড় মাস খেয়ে আমরা প্রাণে পাই সুখ॥
খুঁজে বসন্ত বলে তোমরা মিছে কর গোল।
আমার চোটে লোকের গা ফুলে হয় ঢোল॥
হাড় ভাঙ্গা বসন্ত বলে যারে দেখা পাই।
ছেলে বুড়ো সব আমরা কাঁচা ধোরে খাই॥
শীতলা বলেন আমি চাল পয়সা চাই।
না দিলে ছেলের মা আর রক্ষা নাই॥
চাল পয়সা আনো হবে পূজার বাজার।
বসন্ত ধরিবে নয় তো চৌযট্টি হাজার॥

এ হেন ছড়া শুনে ভীত গৃহস্থ নয়নের ধামা চালে পয়সায় ভরে তুলল। নয়ন প্রথম দিনের রোজগার এনে গিন্নীকে বলল—'গিন্নী। একবার বাহির হইয়া দেখ দেখি বাপধোন। বড় যে গুলিখোর বলিয়া মুখ ঝামটা দাও। গুলিখোর না হইলে এরূপ ফিকির বাহির করে কে, বাপ-ধোন? এরূপ বুদ্ধি যোগায় কার?'

কিন্তু একদিন নয়ন তার এই জাগ্রত শীতলা নিয়ে এক মাতালের হাতে পড়ল। মাতালের হাতে পড়ে কিল খেয়ে, শীতলা হারিয়ে নয়ন যখন ঘরে বসে পিঠে চুনে-হলুদ মাখাচ্ছে, তখন সেই মাতালের কাছ থেকে এক চিঠি এল।—'শীঘ্র আসিয়া তোমার শীতলা লইয়া যাইবে। তোমার এ জাগ্রত শীতলা লইয়া আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। তোমার কোন ভয় নাই। শীঘ্র তোমার শীতলা লইয়া যাইবে।'

এর পর থেকেই উৎকেন্দ্রিতার হাস্যস্রোত বয়ে চলল। জাগ্রত শীতলা

নিয়ে মাতাল যে বিপদে পড়েছিল, 'নয়নচাঁদের ব্যবসা' মাতালেরই সেই উদ্ভট বিপদের অতি উদ্ভট কাহিনী।

নয়ন মাতালের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল—'বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ন জনঃ ন মানবঃ। কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। বাহিরের ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া একটু উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাপুরে। বলিতে এখনও সর্বশরীর শিহরিত হইয়া উঠে। বাহিরের ঘরের ভিতরে দেখি, না, বসিয়া আছে দুইটি ভূত।'

একটি ভূত মাতাল মিত্তির-জা ভূত, দ্বিতীয়টি নেই আঁকুড়ে-দাদা ভূত। কর্তা ভূত নয়নকে কাছে ডেকে অভয় দিয়ে বলতে লাগল কি করে নয়নের জাগ্রত শীতলার জন্য বৈকুণ্ঠ না গিয়ে তাকে ভূত হয়ে আটকে থাকতে হয়েছে।

'আড্ডাধারী মহাশয় ও লম্বোদর গগন প্রভৃতি বলিয়া উঠিলেন,—নয়ন। তোমার সাহস তো কম নয়। স্বচ্ছন্দে বসিয়া ভূতদের সঙ্গে তুমি গল্পগাছা করিলে? বুকের পাটা তো তোমার কম নয়?'

নয়ন উত্তর করিলেন,—'বেঁধে মারে সয় ভাল। করি কি? ভূতের খর্পরে গিয়া পড়িয়াছি; পালাইবার তো যো ছিল না, কাজেই কাদায় গুণ ফেলিয়া পড়িয়া থাকিতে হইল। তা না হইলে সদাই ভয় হইতেছিল। কি জানি? ভূতের মরজি। যদি বলিয়া বসে যে তোমার পিঠ দেখিয়া আমাদের হাত সুড় সুড় করিতেছে, এস দুইটি কিল মারি। তোমার ঘাড় দেখিয়া আমাদের হাত নিশপিশ করিতেছে, এস ভাঙ্গিয়া দিই। তাহা হইলে কি করিতাম। যাহা হউক, সেইরূপ কোন বিপদ ঘটে নাই। ভূতগুলি দেখিলাম ভালমানুষ ভূত। সেই কর্তা ভূতের এখন আশ্চর্য কাহিনী শুন।'

পঞ্চম পর্ব থেকে শেষ পর্ব পর্যন্ত কর্তা ভূতের এই আশ্চর্য কাহিনী হাসির উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে তুলেছে।

মিত্তির জা যেদিন শীতলা কেড়ে নিল, তার দুদিন পর খুবই তার বসন্ত হল। —তোমার সেই চৌষট্টি হাজার বসন্তে আমায় ছাইয়া ধরিল। চুলের ডগা পায়ের কোড়ে আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত, তিল রাখিবার স্থান ছিল না। বৈদ্য আসিয়া মহাদেব-চূর্ণ ও গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতের ব্যবস্থা করিলেন। মহাদেব-চূর্ণ খাইতে দিলেন, আর গৌরচন্দ্রিকা ঘৃত গায়ে মাখিতে বলিলেন। ঔষধের ব্যবস্থা দেখিয়াই বুঝিলাম যে এবার গতিক বড় ভাল নয়। তিনদিন পরে

রাত্রিকালে যমদূতেরা আমাকে লইতে আসিল। চারিটি যমদূত আসিয়াছিল। সব বিকট মূর্তি, দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়।

'যমদূতেরা আসিয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া টিকিটি খুঁজিতে লাগিল, ইচ্ছা যে, টিকিটি ধরিয়া আমাকে যমপুরে লইয়া যায়। কিন্তু আগে থাকিতে আমি একটি বুদ্ধির কাজ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেইদিন প্রাতঃকালে, রোগের বে-গতিক দেখিয়া মনে মনে করিলাম যে, পৃথিবীতে আসিয়া আমি কখনও কোনও একটি পুণ্যকর্ম করি নাই। চিরকাল পাপ করিয়াছি। নরহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রী-হত্যা, চুরি, জাল প্রভৃতি যাহা কিছু পাপকর্ম, সকলই করিয়াছি। ভাল কাজ একটিও কখনও করি নাই। এখন তো দেখিতেছি, মৃত্যু উপস্থিত। যমকে গিয়া জবাব দিব কি? তাই মনে করিলাম যে, এই অন্তিমকালে পুণ্য কাজ করি। আমি চান্দ্রায়নটি করিলাম। গোয়ালে আমার একটি এঁড়ে বাছুর ছিল। আমি মিত্তির-জা। আমার গোয়ালে এঁড়ে বাছুর কেমন তা বুঝিয়া লও। এক ফোঁটা দুধ থাকিতে গাইকে আমি কখনও ছাড়ি নাই। মার দুধ কারে বলে বাছুরটি তা কখনও চোক্ষে দেখে নাই। অন্য খাওয়া দাওয়াও তদ্রূপ। সুতরাং না খাইয়া খাইয়া বাছুরটির অস্থি-চর্ম সার হইয়াছিল। মর-মর হইয়াছিল। সেই এঁড়ে বাছুরটি একজনকে দান করিলাম। দড়ি ধরিয়া বাছুরটিকে ব্রাহ্মণ লইয়া চলিলেন। আমার বাড়ীর বাহির হইয়াই রাস্তার উপর বাছুর শুইয়া পড়িল, সেইখানেই মরিয়া গেল।

'চান্দ্রায়ন করিতে মাথাটি নেড়া হইয়াছিলাম। মাথাটি ঠিক বোম্বাই ওলের মত হইয়াছিল। যমদূতেরা টিকি ধরিয়া আমাকে যমের বাড়ী লইয়া যাইবেন, তার যো ছিল না। অন্ধকারে যমদূতেরা আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দেখিল যে, টিকি নাই। যমদূতেরা ফাঁফরে পড়িল। কি ধরিয়া আমাকে লইয়া যায়? অবশেষে চিন্তা করিয়া তাহারা আমার হাত ধরিল। গৌরচন্দ্রিকা ঘৃতে আর বসন্তের রসে আমার গা হড়হড়ে হইয়াছিল। অনায়াসে আমি হাতটি ছাড়াইয়া লইলাম। যেখানে ধরে আর আমি পিছলে গিয়া সরিয়া বসি। কখনও তক্তা-পোষের ওপর, কখনও তক্তাপোষের নীচে, কখনও ঘরের মাঝখানে, কখনও পাশে, এ-কোণে, সে-কোণে, যমদূতদিগের সঙ্গে সমস্ত রাত্রি আমি এইরূপ পেছলা-পিছলি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তারা হইল চারিজন, আমি হইলাম একা। কতক্ষণ আর পেছলা-পিছলি করিব? ভোরের মাথায় তাহারা হাতে ছাই ও

মাটি মাখিয়া আসিল। সুতরাং আর আমি পিছলে যাইতে পারিলাম না। আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল।'

পাপকর্মকে সুপরিচিত রীতি অনুযায়ী চান্দ্রায়নের পুণ্যে ঢেকে দেওয়ার যে ইঙ্গিতটুকু, পঞ্চম পর্বেই টিকি রাখা নিয়ে যে ইঙ্গিতটুকু,—সে ইঙ্গিত যম মানুষের সারারাত্রি ধরে পেছলা-পিছলির উদ্ভট কল্পনার পরিবেশে কোন রকমেই প্রাধান্য পেতে পারেনি। মিত্তির জা হাস্যময় প্রতিবেশের অঙ্গীভূত হয়েই আমাদের ঘৃণার বা ক্রোধের পাত্র না হয়ে আনন্দ দেবার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। মিত্তির-জাকে কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধি করে আঁকবার লক্ষ্য যে ত্রৈলোক্যনাথের ছিল না, তার প্রমাণ গল্পের শেষে রয়েছে,—যেখানে মিত্তির-জা যমকে তাড়িয়ে যমরাজারূপে সকল পাপীদের নরক থেকে তুলে নিজ হাতে তাদের চান করিয়ে দিল এবং যেখানে বিষ্ণু যখন মিত্তির জাকে বৈকুণ্ঠে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন, মিত্তির-জা পাপীদের সঙ্গে না নিয়ে যেতে নারাজ হল। ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পি-স্বভাবের বিশেষ ধর্ম যে মনুষ্যত্বে তীব্র বিশ্বাস, সে বিশ্বাসে স্নাত হয়েই মিত্তির-জার চরিত্র মানবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে শ্রেণীবিশেষের ওপর তীব্র আঘাত হানতে পারেনি। মিত্তির-জা উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের প্রতিবেশলীন হয়ে হাস্যসৃষ্টির উপাদান হয়ে উঠেছে।

যমদূতেরা মিত্তির-জাকে সঙ্গে করে যমরাজের কাছে উপস্থিত হল। যমরাজে উপস্থিত হয়ে মিত্তির-জা কি করে যমরাজ ও চিত্রগুপ্তকে সেই এঁড়ে বাছুরটা দিয়ে রাজ্যছাড়া করল এবং নিজে যমরাজ হল, কি করে স্বর্গের সমস্ত পাপীদের মুক্তি দিল, এবং স্বয়ং বিষ্ণুকে বৈকুণ্ঠ থেকে নামিয়ে এনে স-পাপী বৈকুণ্ঠে যাবার অনুমতি পেল, অথচ প্রবেশপথে সুদর্শন চক্র কি করে তার গতিরুদ্ধ করে নয়নচাঁদের জাগ্রত শীতলাহরণ মনে করিয়ে দিল এবং নয়নকে ডেকে শীতলা ফিরিয়ে দিয়ে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করতে বলল—সেই উদ্ভট কাহিনীর তরঙ্গভঙ্গ রয়েছে সমস্ত রচনাটিতে। এই হাস্যস্রোতেই 'নেই-আঁকুড়ে দাদা'র (কর্তাভূতের সঙ্গে দ্বিতীয় ভূত) কাহিনী এসেছে,—নেই-আঁকুড়ে দাদার কাহিনী মানুষের বুদ্ধির কাছে যমদেবতার বিচার কি করে হার মানল, তারই এক মৌলিক উদ্ভট গল্প। সমগ্র রচনাটির ওপর কাব্যে রসধ্বনির মত নয়নচাঁদের শীতলাটি চলে চলে বেড়িয়েছেন। 'অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নারায়ণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নয়নচাঁদ বলিয়া এক ব্যক্তির শীতলা কি তুমি কাড়িয়া

লইয়াছিলে?" আমি উত্তর করিলাম—'হাঁ মহাশয়। মৃত্যুর পূর্বে আমি সে কাজটি করিয়াছিলাম।"

নারায়ণ বলিলেন—"ঈশ! করিয়াছ কি! সে যে ভারি জাগ্রত শীতলা। এমন কাজও করে? আর সব পাপ আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু সে শীতলা কাড়া পাপটি আমি ক্ষমা করিতে পারি না। যাও, শীঘ্র ভূত হইয়া তুমি মর্ত্ত্যে ফিরিয়া যাও। নয়নচাঁদের শীতলাটি ফিরিয়া দাও। আর, সকলকে গিয়া বল, যেন নয়নচাঁদের শীতলাকে সকলে পূজা করে।' মিত্তির-জা নয়নের হাতে শীতলাটি দিয়ে সঙ্গী ভূত নিয়ে সরু সরু বাঁশের সলার মত লম্বা হল। 'তাহার পর হাযুই বাজির মত একে একে সোঁ সোঁ করিয়া আকাশে উঠিল। বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।' কোনো যুগে, কোনো কালে, কোনো মানুষের এহেন পন্থায় ভাগ্য ফেরেনি। ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভট কল্পনার এক দুর্দান্ত কাহিনী 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'।

ত্রৈলোক্যনাথ দেবতা মানুষ ভূত নিয়ে, স্বর্গ মর্ত্য নিয়ে, কু-সংস্কার অন্ধবিশ্বাস নিয়ে উদ্ভট কল্পনার মৌলিক যে হাস্যময় জগৎ রচনা করেছেন, সে জগতে ভয়-ভীতি ইঙ্গিত-কটাক্ষ দাঁড়াতে পারেনি। যে যম বিচ্ছেদ বেদনা এনে দেয়, তাকে নিয়ে মজা করবার সাহস গোপীচন্দ্রের গানে দেখেছি। কিন্তু দেবতার ওপর গুরু ছিলেন খুঁটির জোর। ভারতচন্দ্রে প্রথম দেবতা নিয়ে ব্যঙ্গ। শিবের কামমত্ত অবস্থায় অপ্সরার পশ্চাৎধাবন দৃশ্য তার প্রমাণ। উনিশ শতক থেকে সংস্কারমুক্ত মন দেবতা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা ব্যঙ্গ ইঙ্গিত করে আসছে। দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ' রচনায় উৎকেন্দ্রিকতার পরিবেশলীন করে দেবতা নিয়ে হাসি উপভোগ্য হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের অকর্মণ্য যমের পূর্বপুরুষকেই দীনবন্ধুর রচনায় একবার দেখেছি। মিত্তির-জার মত মর্ত্ত্যের মানুষ কুড়রাম স্বর্গে হুলুস্থুলু সৃষ্টি করেছিল। নয়নচাঁদের ভাগ্য ফেরার কাহিনীতে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে না-মঞ্জুর করে কেবল ফণীমনসা, কাটিগঙ্গা আর মা শীতলাকে মান্য করে, (তাদের মধ্যে আবার শীতলাকে মান্য করে) নয়ন ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলল। মা শীতলা সমস্ত রচনাটিকে উদ্ভট পথে চলার গতি এনে দিয়েছেন। এবং নিজে তিনি এমনভাবে উৎকেন্দ্রিকতার এই গতিতে জড়িয়ে পড়েছেন যে হাসির প্রতিবেশটা থেকে আর নিজেকে আলাদা করে নিতে পারেননি। ফলে শীতলা-ভীতি, শীতলা-বিশ্বাস যেমন স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারেনি, দেবতা নিয়ে ব্যঙ্গ

ইঙ্গিত ঠাট্টাও উৎকেন্দ্রিকতামুক্ত হয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারেনি। আরেক দিকে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যময় প্রতিবেশলীন হয়েই নয়নচাঁদের ধূর্তামি. মিত্তির-জার ধূর্তামি, যমের অকর্মণ্যতা কোন শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিত্ব করেনি। এদের প্রতি আমাদের কোনরকম ঘৃণা, উন্নাসিকতা বা বিদ্বেষ যে জাগে না, বরং এদের সহাসি উপস্থিতি যে আমাদের আনন্দ দেয়, তার কারণ এই উৎকেন্দ্রিকতার প্রতিবেশলীনতা। স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল এখানেই। হাসির তরঙ্গভঙ্গে নয়নচাঁদের গোটা দেহখানা যেভাবে ফুলে ফুলে উঠেছে, সে দোলা থেকে কোন চরিত্রই, কোন বক্তব্যই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াতে পারেনি। তারই ফলে উৎকেন্দ্রিকতার হাসি আঘাতহীন দাহহীন অশ্রুমুক্ত, গভীরতা গাম্ভীর্যমুক্ত প্রসন্ন উচ্চ হয়ে উঠেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় যে একটি গল্পবলার বৈঠকীভঙ্গী রয়েছে সে-কথা বলা হয়েছে। গল্পের অন্তরেও এক একটা বৈঠক গড়ে উঠেছে। কখনও সে বৈঠক অপ্রত্যক্ষ, কখনও প্রত্যক্ষ। অপ্রত্যক্ষ বৈঠক যেমন কঙ্কাবতী, লুল্লু, বীরবালায়। প্রত্যক্ষ আড্ডাখানা কয়েকজন ইয়ার নিয়ে গড়ে উঠেছে। এই আড্ডায় একজন আড্ডাধারী থাকেন। নিজে ব্যয়ভার বহন করে তিনি আড্ডাধারী হন। কখনও বা সকলে মিলে আড্ডার শৃঙ্খলা ও সুর বজায় রাখতে একজনকে আড্ডাধারী নির্বাচিত করেন। ফরাসডাঙ্গার এমন এক প্রত্যক্ষ আড্ডায় নয়নচাঁদের গল্প শুনেছি। মহাদেববাবুর মজলিশে 'মুক্তমালা'র গল্প জমেছে। 'কঙ্কাবতী', 'বীরবালা', 'লুল্লু'তে প্রত্যক্ষ কোন মজলিস বসেনি, কিন্তু একটি অপ্রত্যক্ষ মজলিস থেকে গল্প শোনানো হচ্ছে.—এবং সে মজলিসের আড্ডাধারী লেখক স্বয়ং—এমন ভাব স্পষ্ট।

আড্ডা যখন আছে, আড্ডার নিত্যক্রিয়াবস্তুর আয়োজনও থাকা চাই। আধুনিক পন্থায় চা, বিয়ার, সিগার, ঠাণ্ডাপানীয় এই সেকেলে আড্ডায় ঘুরে ঘুরে ফেত না। এখানে গুলি, আফিম, গাঁজার ধোঁয়া, গুড়ুকের ধোঁয়া চলত। কখনও পূজাপার্বণে সসংকোচে একটু ধেনো মদকে 'দ্রবীভূত তারা', 'পবিত্র সামগ্রী', 'মায়ের প্রসাদ' ইত্যাদি শ্রদ্ধেয় আখ্যা দিয়ে সংকোচ কাটিয়ে পান করা চলত। ফরাসডাঙ্গার আড্ডায় চলত গুলি খাওয়া। মহাদেববাবুর মজলিসে গাঁজার ধূমপান এবং কিনুবাবুর চালাঘরের যোগমন্দিরে গাঁজার ধূম-পানের সঙ্গে 'দ্রবীভূত তারা' চলত। 'লুল্লু', 'কঙ্কাবতী'তে আফিম, গুলি, গাঁজা,

তামাকের ধেঁায়া আড্ডা থেকে ওঠেনি, কিন্তু সেখানেও চণ্ডু বা তামাকের ধেঁায়ার আমেজ সৃষ্টি করেছে গল্পের নায়ক ও প্রধান চরিত্ররা। 'ডমরুচরিত'-এ আসর আছে। কিন্তু আসরের নিত্যক্রিয়াবস্তুর উল্লেখ নেই। কিন্তু সচ্ছল আড্ডাধারী ডমরুর আড্ডায় যে হুঁকো কলকে গড়গড়া থাকত, তা অলক্ষিত সত্য। মোটের ওপর ত্রৈলোক্যনাথের উৎকেন্দ্রিকতার গল্পে প্রত্যক্ষত অলক্ষিত আফিম গুলি গাঁজা তামাকের স্নায়ু-উত্তেজক ধেঁায়া রয়েছে। এই ধেঁায়া নাকে মুখে গেলেই ইয়াররা উৎফুল্ল হতেন, আড্ডা জম্‌জমাট হত। মদ-গাঁজা-আফিমের এই শক্তির কথা অনস্বীকার্য। মদের শক্তির কথা আর্যগণও স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলতেন সোমরস। বৈদিক আর্যগণ সোমলতা থেকে নিষ্কাশিত যে সোমরস, তার শক্তির স্তুতিতে ছিলেন মুখর। আর্যগণ সোমরসের এক অপূর্ব মাদকতা-শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, এই অদ্ভুত রস পান করলে মনে এক শক্তির উন্মেষ হয়। তখন মানব অমানুষিক কাজ সাধন করতে পারে। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলটি (সূক্তসংখ্যা ১৪৪) সোমরসের আধার সোমলতার উদ্দেশ্যে গীত। গাঁজা গুলি চণ্ডু তামাকের মধ্যেও এই শক্তি কখনও অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়, যেমন দিয়েছে বঙ্কিমের কমলাকান্তের, ডিকুইনসির Opium Eater-এর। জগৎ ও জীবনটাকে আঘাত করে, সমালোচনা করে শোধন সংস্কারে চেতনাবুদ্ধি খরশান হয়ে ওঠে। আবার এ শক্তি কখনও জীবনটা থেকে সকলরকম ভার—দুঃখশোকের, অভাব-অভিযোগের, চিন্তাভাবনার ভার লঘু করে মনকে আমেজী, খেয়ালী, প্রসন্ন করে তোলে। তখনই ফরাসডাঙ্গার আড্ডা বলে 'মজার মজার কথা চাই, তাহা না হইলে প্রাণে ততটা আয়েস হয় না।' মহাদেববাবুর মজলিশ বলে—'নতুন ধরণের ভূতের গল্প হয়তো, বল। পচা গল্প শুনিতে ইচ্ছা হয় না।' কিনুবাবুর যোগমন্দিরে ইয়াররা অদ্ভুত গল্প শোনার বায়না ধরে। ডমরুর পূজার দালানে আজগুবি গল্প জমে ওঠে।

'মুক্তামালা'য়[১৩] মহাদেববাবুর যে মজলিস,—সেখানে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্য-রসের গল্প প্রাধান্য পায়নি। 'মুক্তামালা' বিচিত্র চালের গল্প। উৎকেন্দ্রিকতার হাস্য-ছটা সেখানে একটি চাল। 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসায়' উদ্ভট গল্পের হাস্য-সৃষ্টির পর ত্রৈলোক্যনাথ যেন ভিন্নচালে একটা গল্প বলতে চেয়েছেন। মহাদেব-বাবুর আড্ডার ইয়াররা যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—'নূতন ধরণের ভূতের গল্প বল',

১৩. প্রকাশকাল—৭ই জানুয়ারী, ১৯০২।

তা যেন ত্রৈলোক্যনাথেরই উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের চাল থেকে স্বতন্ত্র এক চালের গল্প কথনের বাসনার ইঙ্গিত। এই চালটা সামাজিকতা—অলৌকিকতা ও উৎকেন্দ্রিকতার বিমিশ্র এক চাল। আসরের ইয়াররা এই নতুন সামগ্রীকে আস্বাদন করে বলেছে –'নব আরব্য উপন্যাস'। গল্পগুলিকে কতকগুলি রজনীতে (৭টি) বিভক্ত করায় আরব্য উপন্যাসের বহিরঙ্গানুসৃতি ঘটেছে। ডাকিনী, রাক্ষস, নরমুণ্ড, বেতাল, খড়্গপানি, আঙটি বীরের গল্প এসে বেতাল-পঞ্চবিংশতির অলৌকিক অনুভূতির প্রত্যয় সৃষ্টি করেছে। তারই সঙ্গে সামাজিক গল্পের স্বাদ পরিবেশিত হয়েছে বিভিন্ন রজনীর গল্পে। গল্পগুলো কখনও হয়ে উঠেছে ভ্রাতৃ-প্রেমের পারিবারিক গল্প (প্রথম ও তৃতীয় রজনীর গল্প), কখনও বাৎসল্য রসের করুণ গল্প হয়ে উঠেছে (ললিত ও লাবণ্য), কখনও হয়ে উঠেছে শ্বাসরোধকারী ভূতের গল্প (সপ্তম রজনীর ভূতের বাড়ি), আবার কখনও গুরুবাদকে ব্যঙ্গআঘাত করে ব্যঙ্গ গল্প হয়ে উঠেছে (দ্বিতীয় রজনীর গল্প)।

'মুক্তামালা'র এই আরব্য উপন্যাসে, বেতাল-পঞ্চবিংশতির গল্প-স্বাদের সঙ্গে, সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সামাজিকতামূলক ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্পরচনার প্রভাবানুগত ছোট গল্পের স্বাদের সঙ্গে মিশেছে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার হাস্য গল্প-স্বাদ।

চতুর্থ রজনীর গল্পে ভূমিকম্প বুড়োর কল্পনা এবং এক টাকার ভূমিকম্প কেনার উদ্ভট আচরণে এই হাসি দেখা গেছে। 'মানুষ মরিয়া নানারূপ হয়, সে রূপের সংখ্যা চৌরাশি হাজার'—এই চৌরাশি হাজার রূপের মধ্যে জলের কলসীরূপী নস্কর মশাইর কথাবার্তায়, মৃত্যুর পর জগবন্ধুর সামান্য একখানা খুরি হয়ে জন্মাবার কল্পনার মধ্যে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার মৌলিকতার স্বাদ হাসির সৃষ্টি করেছে। উৎকেন্দ্রিকতার এই হাসি পঞ্চম রজনীর গল্পে আরেকবার দেখা গেছে। গড়গড়ি মশাই ভূমিকম্প বুড়োর ফুৎকারে শূন্যে উত্থিত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা গির্জার মাথায় আটকে পড়লেন। সেখানে কাকের মাংস খেয়ে বেঁচে থেকে কাটা ঘুড়ি জড়ো করে একদিন গির্জা ছেড়ে উড়ে চললেন। কিন্তু পড়লেন এক সমুদ্রে। সমুদ্রে পড়ে যখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন সেইক্ষণে মনোহরি জাহাজের মত একটা বিপুল-আকৃতি ঝিনুক দেখতে পেয়ে তার মধ্যে ঢুকলেন বিশ্রামের আশায়। ঝিনুক গড়গড়ি মশায়কে মুখে পুরে মুখ বন্ধ করে দিল। ঝিনুকের পেটের ভিতর অন্ধকার ছিল না। কারণ একটা জালার মত মুক্তা চারদিক

আলোকিত করেছিল। গড়গড়ি মশাই ঝিনুকের নাড়ীর এক অংশ বালিশ করে ঘুমলেন। তিন-চারদিন পরে ঘুম থেকে উঠে তিনি খিদের তাড়নায় ঝিনুকের মাংস খেতে শুরু করলেন। এবং তিনমাস ধরে ঝিনুকের মাংস খেয়ে বেঁচে রইলেন। এদিকে ক্রমান্বয়ে মাংস কাটার ফলে ঝিনুকটার মৃত্যু ঘটল। তখন গড়গড়ি মশাই টানাটানি করে ঝিনুকের খোলা দু'ভাগ করে খুলে ফেললেন। বজ্রপাতের মত শব্দ করে দুটো খোলা দু'খানা জাহাজের মত সমুদ্রে ভাসতে লাগল। যে খোলাভাগে জালাকৃতি মুক্তা ছিল, গড়গড়ি মশাই সেখান করে ভাসতে ভাসতে সাতদিন পরে এক অরণ্যসংকুল ভূমিতে এসে নামলেন।

নাবিক সিন্দাবাদের অভিযান গল্পে একটা সম্ভাব্যসত্য সৃষ্টির চেষ্টা মন স্পর্শ করে। শিল্পিমন দুর্গম, অজ্ঞাত সমুদ্রের রহস্যসৃষ্টিতে, অজ্ঞাত স্থলভূমির রহস্য-সৃষ্টিতে নিবিষ্ট। পাঠকমন রহস্যাবৃত, অভিভূত, বিস্মিত হয়। কিন্তু গড়গড়ি মশায়ের 'অভিযান' গল্পে কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা দিয়ে একটা হাস্যকর অসম্ভব পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা প্রবল হয়ে উঠেছে। তাকে বিশ্বাস্য করে তুলবার একটা ছদ্মচাল চেলেছেন। বিস্ময় অবিষ্টতার স্থানে হাসি তা-ই দেখা দিয়েছে। সপ্তম রজনী থেকে মুণ্ডমালাদের গড়গড়ি মশায় যে গল্প শুনিয়েছেন, তাদের মধ্যে একটিতে (মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান্ সর্প) উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যময় পরিবেশ রচিত হয়েছে। মুণ্ডমালাদের গল্প প্রত্যেকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে. উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরস স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। ফরাসডাঙ্গায় জয়গোবিন্দ ভড়ের আড্ডায় মূল্যবান তামাক সেবনের সঙ্গে নতুন গল্প শোনার ইচ্ছা জাগল। আড্ডাধারী মশাই'র অনুরোধে তিনুবাবু সাপের গল্প শুরু করলেন। 'আড্ডাধারী জিজ্ঞাসা করিলেন—সত্যগল্প? না মিথ্যা, কল্পিত, বানানো গল্প? তিনুবাবু উত্তর করিলেন—সম্পূর্ণ সত্যগল্প। তামা তুলসী, গঙ্গাজল হাতে লইয়া বলিতে পারি। যাহা আমার নিজের বাড়িতে ঘটিয়াছে, যাহা নিজে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সেইরূপ গল্প আমি করিব।'

কিন্তু তামা-তুলসী গঙ্গাজলের দোহাই দিয়ে তিনুবাবু সাপের যে সত্যগল্প করলেন, কোন দেশে, কোন কালে, কোন গৃহস্থের বাড়িতে এ-গল্পের অঙ্কুর দেখা যায়নি। হাস্যময় অসঙ্গতির উদ্ভট গল্প তিনুবাবুর গল্প।

"আমার আটবৎসরের একটি বালক আছে। স্কুলে সে পড়িতে যায়। বাড়ি আসিয়া যোগ করিবার নিমিত্ত মাষ্টার তাহাকে এক তেরিজ দিয়াছিলেন।

শ্লেটে লিখিয়া অঙ্কটি ছেলে ঘরে আনিয়াছিল। বালক অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু অঙ্কটি বড় ছিল, কিছুতেই সে ঠিক দিতে পারিল না। হতাশ হইয়া বিরসবদনে শ্লেটের পাশে চাহিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কাঁধের উপর বসিয়া একটি সাপ মুখ বাড়াইল। তাহার পর সাপটি আরও অগ্রসর হইয়া পেন্সিল সহিত তাহার দক্ষিণ হস্তে অনেকগুলি পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। এইরূপে বালকের হাত ধরিয়া শ্লেটের উপর তাহাকে লিখাইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে বিনাভুলে যোগটি সমাপ্ত করাইল। তাহার পর দিন আমরা সকলে মিলিয়া বালককে ত্রৈরাশিক প্রভৃতি আরও নানারূপ কঠিন কঠিন অঙ্ক দিলাম। বালক যোগও ভাল করিয়া শিক্ষা করে নাই, কিন্তু সেই সর্পের সহায়তায় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমুদয় অঙ্কগুলি সে কষিয়া ফেলিল। সেই অবধি মুহুরিগিরী করিবার নিমিত্ত সাপটিকে আমরা পুষিয়া রাখিয়াছি। সংসার খরচের হিসাব, গয়লার সহিত দুধের হিসাব, ধোপার সহিত কাপড়ের হিসাব, আমাদের সামান্য একটু পৈতৃক সম্পত্তির হিসাব,—কড়ায় গণ্ডায় সমুদয় হিসাব সেই সাপটি রাখে। জমিদারী সেরেস্তায় হিসাবের গোলমাল হইলে, সাপটিকে ভাড়া দিয়া আমরা মাঝে মাঝে বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জন করি।……"

সাপ ও মানুষের সহ-অবস্থানের এই উদ্ভট মৌলিক কল্পনা সকল বয়সের পাঠককে প্রসন্ন উচ্চহাস্যে মুখরিত করে তোলে। সাপের মুহুরিগিরী করার এই গল্প, 'ছানা ও মা লাউডগা সাপে'র মানবশিশুর চুল বেঁধে দেবার গল্প, 'বালিকা ও কৃষ্ণসর্প', 'শিশু ও বেঁড়ে' তিনুবাবুর সর্পমূলক এই সকল সত্যগল্পে হাস্যরসের যে এক স্বতন্ত্র ধারা এসেছে, বাংলা সাহিত্য-পঙক্তি ভোজে তার সমাদর অনস্বীকার্য।

শিল্পের ভাষান্তর কঠিন কাজ। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের যদি ভাষান্তর ঘটে, বিশ্বসাহিত্যে তা 'মুক্তামালা'র জালাকৃতি মুক্তার মতই স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করবে।

'ফোকলা দিগম্বর' (১৯০১, ৪ঠা মার্চ), 'ময়না কোথায়' (১৯০৪, ১৬ই অক্টোবর), এই উপন্যাস দু'খানা উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিমনের এক গভীর গূঢ় প্রকোষ্ঠ থেকে এদের জন্ম। তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল 'মজার গল্প'। সাতটি গল্পের সঙ্কলন 'মজার

গল্প'। তাদের মধ্যে 'এক ঠেঙো ছকু' গল্পে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। বাকি গল্প ছটি কখনও জাদু খেলার ইন্দ্রজাল রহস্য, কখনও রূপকথা ও ইতিহাস-কথার মিশ্র অনুভূতি, কখনও ভূতের গল্পের রুদ্ধশ্বাস অবস্থা সৃষ্টি করে বিচিত্র স্বাদের হয়ে উঠেছে। হাস্যরসের প্রসন্ন উচ্চপ্রকাশ সেখানে নেই।

'এক ঠেঙো ছকু'র জন্ম কিনুবাবুর আড্ডাখানা 'যোগমন্দির' থেকে। মহাষ্টমীর আনন্দ দিনে 'তিন ছিলিম গাঁজায় ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পর আসল জিনিসটি আরম্ভ হইল।' আসল জিনিসটি হোল 'অতি পবিত্র দ্রবীভূত তারা।' এই দ্রবীভূত তারা পান করে আসরের ইয়াররা ছকুকে ধরে বসল 'মহাষ্টমীর রাত্রি। মা পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। অগণিত ভূত, প্রেত, দানা দৈত্য, তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। অদ্ভুত গল্প শুনিবার সময় এই।'

ছকু অদ্ভুত গল্প আরম্ভ করল। মন্ত্রবলে দেবী, দেবীর বাহন সিংহ ও মহিষাসুর পর্যন্ত কি করে সজীব হয়েছিল, এবং ছকু তা স্বচক্ষে দেখে সেই হিড়িকে কেমন করে একখানা পা হারিয়ে এক ঠেঙো ছকু হল, এই অদ্ভুত গল্প কিনুবাবুর যোগমন্দিরে মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় শুরু হল।

ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির সুপরিচিত কৌশলটি এখানেও আয়ত্ত করেছেন। গ্রাম্য দলাদলির একটি বাস্তব চিত্রের গম্ভীরপটে তিনি সপ্তমীর রাত্রে দেবীকে জাগিয়ে দিয়ে, উদ্ভট কল্পনার এক হাস্য-নৃত্য ঘটালেন। ছকুর মাথায় তার বিগতা স্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর মুণ্ড বসিয়ে দিয়ে ছকু-বেচারার এক হাস্যকর উদ্ভট চেহারা সৃষ্টি করলেন। আরও উদ্ভট হল যখন এক দাঁতওয়ালা মূর্তি এসে রাত্রের অন্ধকারে লোহার মত কঠিন হাতে ছকুর গালে এক চড় মেরে বলল—'আমি ভূত।......এস তোমাব ঘাড়টি ভাঙ্গিয়া দিব।'

(ছকু বলিল)—'এ আমার মস্তক নহে, অন্য লোকের।'

ভূত পুনরায় বলিল—'সম্প্রতি আমি ভূত হইয়াছি। ভূতগিরি করিতে এখনও ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি নাই। আজ ভোর হইলে কি যে কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি।'

এই ভূতই ছকুকে তার নিজের মুণ্ডের সংবাদ দিল—তোমার মুণ্ড খিড়কীর বাগানে চালতেতলায় পোঁতা আছে। শাবল লইয়া আমার সঙ্গে চল, আমি দেখাইয়া দিব।'

নিজের মুণ্ড মাটি খুঁড়ে বার করে ছকু তার পূর্ব অবয়ব ফিরে পেল। সেই

সঙ্গে গুপ্তধনের সংবাদ পেয়ে তা আত্মসাৎ করতে গিয়ে চিরকালের মত একখানা ঠ্যাঙ হারিয়ে ছকু এক ঠেঙো ছকু হল।

ছকুর প্রতি গল্পস্রষ্টার নির্মমতা যদি মনে হয়, পীড়ন-বোধ যদি মনে হয় —উদ্ভটতার কল্পনার হাস্যস্রোতে সে পীড়ন-বোধ দাঁড়াতে পারেনি।

গল্প শুনে কিনু জিজ্ঞাসা করলেন—'ভূত, মহিষাসুর—এসব কি করিয়া হইয়াছিল ?'

ছকু উত্তর করিলেন—'মাধব হিপনটিশ্যাম করিয়াছিল।'

বদন বলিলেন—'গেলাসে ঢালো।'

কিনু বলিলেন—'তামাক সাজো।'

মদ ও গাঁজার মিলিত উত্তেজনা ও ধোঁয়ায় যে এক হিপনটিশ্যামের সৃষ্টি হল পাঠককে তা প্রসন্ন উচ্চহাস্যে আনন্দমুখর করে তুলেছে।

উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ডমরুচরিত' প্রকাশিত হয়েছে, ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর। প্রকাশকাল ১৯২৩। 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির যে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন, তার সার্থকতম প্রকাশ 'ডমরুচরিত'-এ। 'কুড়রাম', 'নেই-আঁকড়ে দাদা' বা 'নয়নচাঁদের'ই সমগোত্রীয় ডমরুধর। কৌশলে, ছলচাতুরীতে, দেবতাকে দিয়ে নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে পসার করতে এরা জুড়িহীন। ডমরু তাদের ওপর এককাঠি। সুদে টাকা করেছে ডমরু, মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য সে দেয়। তার ওপর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী রণমূর্তি এলোকেশীকে লুকিয়ে দুর্লভী বাগ্দিনীর প্রতি ডমরু একটু আকৃষ্ট। চঞ্চলার সঙ্গে সদ্ভাবের বাসনা নিয়ে তার জন্য গোপনে এটা সেটা হাতে নিয়ে যাতায়াত করে।

কিন্তু লক্ষ্য করবার এই যে এদের ছলচাতুরীর প্রতি আমাদের ঘৃণা নেই, এদের আমরা এড়িয়ে চলি না। ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল, তনু রায়, জগমণি, কাঙ্গালীচরণ, গুরুদেব কিংবা ইয়াগো, গনেরিল, রেগাস—এদের লুব্ধতা, শঠতা, নীচতা, ভণ্ডামি, ছলচাতুরী আমাদের কাছে চিরকাল অকাম্য। আমাদের সুখের সংসার, আমাদের প্রেম প্রীতি সরলতা, সহজ বিশ্বাস-প্রবণতার হন্তারক এরা। সমাজে জীবনে এদের উপস্থিতিতে আমরা আতঙ্কিত, ভীত। এদের পাশ কাটিয়ে যেতে আমরা ব্যস্ত। কিন্তু ডমরু, নয়নচাঁদ, কুড়রামের চাতুরী ছলনা সত্ত্বেও এদের কাছে পেতে আমাদের ভালো লাগে। আমাদের রূঢ়

কঠিন জীবনটার ভাঙচুরের মধ্যে, শাসনের বাধা-নিষেধের শানবাঁধানো পথে এরা সঙ্গে চললে আনন্দ পাই।

এর কারণ এরা হাসির পথে আনাগোনা করে। ছলচাতুরী নিয়ে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে এরা হাসির আলোতে জীবনকে মূল্যবান, অর্থবান ও প্রিয় করে তোলে। চোখের জলের মত, হাসির স্ফূর্তিতে একটা সাধারণীকৃতি-শক্তি রয়েছে। সে শক্তিতে এরা আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত এদের শঠতা, ছলনার সঙ্গে আমাদের বাস্তব ও পরিচিত জগৎটার যোগ নেই বলেই, তা গায়ে লাগে না। এমন একটা উদ্ভট পরিবেশ রচনা করে সেখানে এরা কাজ করে যে, সে পরিবেশের আঁচ বাস্তব সংসারের মানুষদের গায়ে লাগতে পারে না। দেবতার সঙ্গে এদের ছলচাতুরী। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে যমকে নাকাল করে, যমদূতকে জব্দ করে, বিষ্ণুকে বিব্রত করে মানবসমাজে এরা হাসির ফোয়ারা এনে দিয়েছে। ভূতপ্রেতের সঙ্গে ছলনা চাতুর্য করে হাসির উদ্রেক করেছে। যেখানে এ জগতের সামাজিক জীবনে নেমে এসেছে, সেখানেও এমন একটা উদ্ভট পথে এরা শঠতাচাতুর্যের খেলা দেখিয়েছে যে, তাতে আমরা সব ভুলে প্রসন্ন উচ্চহাস্যে মুখর হয়ে উঠেছি। বস্তুত নিজেদের চারদিকে এরা এমন একটা অসঙ্গতিময় হাস্যপূর্ণ পরিমণ্ডল রচনা করে চলে যে, হাসির সে পরিমণ্ডল থেকে তাদের কোন আচরণই স্বতন্ত্র হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ফলে হাসি ছাড়া, তাদের আর কোন আচরণই কোন আবেদন সৃষ্ট করতে অপারগ হয়। কিন্তু ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি চরিত্র তাদের শঠতা বঞ্চনার সত্তা নিয়েই চারপাশের সুপরিচিত জগতে বিচরণ করেছে। আমাদের হাতের আংটি নিয়ে তাদের শঠতা, আমাদের ভাগ্য নিয়ে সুখ, আনন্দ নিয়ে তাদের ঈর্ষা। আমাদের প্রেম প্রীতির বিশ্বাস নিয়ে তাদের মিথ্যা প্রবঞ্চনা। সমাজের একটা শ্রেণীর, মানবমনের একটা অন্ধকার স্তরের এরা প্রতিনিধিত্ব করছে। এদের স্রষ্টা সচেতনভাবে এদের তুলে ধরে মানবসমাজের ও চরিত্রের বৈচিত্র্যকে, বৈশিষ্ট্যকে, রহস্যকে, কু ও সু'র দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেছেন। এদের দিয়ে জীবন ও জগতের রূপাঙ্কনে শিল্পের সমান্তরালবাদ সৃষ্টির কৌশল এনেছেন। কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যস্রষ্টার সে মনোভাব নেই, সে লক্ষ্য নেই। জীবনে চলার পথে হাসির কিছু দিয়ে চলাটাকে ক্লান্তিমুক্ত করতে শিল্পী চান। জীবনের ক্ষতকে হাসি দিয়ে সেবা করা তাঁর বাসনা। এই অর্থে উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা বাস্তবজীবনবিমুখ নন। তিনি জীবন

প্রেমিক। আর এই নিভৃত জীবনরসের স্পর্শেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি ছেলে-ভোলানো গল্পে এলিয়ে পড়েনি। জীবনরসিক স্রষ্টার এই হাস্যসৃষ্টির কলমের স্পর্শেই ডমরু, নয়নচাঁদ, কুড়রামরা উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের আনন্দ সৃষ্টি করে কালের সীমা পেরিয়ে আজও প্রিয় হয়ে রয়েছে।

এদের আচরণের মধ্যে কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাঠক, কোন বিশ্লেষণাত্মক প্রতিভা যদি বাস্তব সংসারের প্রতিনিধিত্ব দেখেন, তিনি বোধহয় শিল্পীর রসসৃষ্টির মেজাজটাকে ভুল বুঝবেন। ত্রৈলোক্যনাথ সে কাজ করেছেন তাঁর সামাজিক উপন্যাসে। সেখানে তনু রায়, ষাড়েশ্বর, গুরুদেব, দিগম্বর, সমাজের ও মানব-চরিত্রের অন্ধকার স্তরটার, মানুষের মধ্যেকার অমনুষ্যত্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের মানবতায় বিশ্বাসীমনের স্পর্শে এরা শোধিত হলেও, এরা চিরকালই আমাদের অস্বস্তি ও ঘৃণা জাগিয়ে, এড়িয়ে চলার পাত্রই হয়ে রয়েছে।

ডমরু মা দুর্গার প্রিয়পাত্র। যার সঙ্গে তার ছলনা চাতুরী। মা তার দুঃখ-কষ্ট দূর করেন। ডমরুর ছলনা-চাতুরীকে পাঠকসমাজের মতই মা হাস্য আনন্দে গ্রহণ করেছেন। ডমরু সঙ্কটে পড়ে মাকে পূজা দেবার মানত করে, সঙ্কটমুক্ত হয়ে যথাক্রমে পূজার মানত ভুলে যায়। নতুন সঙ্কটে পূর্বত্রুটির ক্ষমা চেয়ে আবার মানত করে। বলাবাহুল্য সঙ্কটমুক্তিতে পুনরায় ডমরু মানতের কথা ভুলে যায়। ডমরুর কাছে বার বার হার মানতে মার যেন আনন্দ।

পঞ্চমীর দিন সন্ধ্যার পর ডমরুধর তার পূজার দালানে বসে লম্বোদর, শঙ্কর, পুরোহিত প্রভৃতি ইয়ারদের কাছে তার এই সঙ্কটের কথা এবং দুর্গতিনাশিনীর প্রতি অবিচলিত ভক্তির ফলে সে সঙ্কট-মুক্তির কথা শুনিয়েছেন। কিন্তু তার এই সঙ্কট ও সঙ্কটমুক্তির কাহিনীতে এমন হাস্যকর বিসদৃশের সমাবেশ ঘটেছে, এমন বিশ্বাস-আচ্ছাদিত অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, তা অনিয়ন্ত্রিত হাসির আবেগে মন ভরিয়ে তোলে। সমাজ ও জীবনের ওপর কোনরকম ইঙ্গিত-কটাক্ষ যদি এখানে এসে পড়ে থাকে তো সেই কটাক্ষ-ইঙ্গিত হাসির নীচে দাঁড়াতে পারে নি।

'ডমরুচরিত'-এ ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের শিল্পগুণ পূর্ণাঙ্গ আয়ত্ত করেছেন। উদ্ভট হাস্যময় কাহিনীকে ডমরু ইয়ারদের কাছে একান্ত বিশ্বাস্যের ছদ্মবেশে ঢেকে পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সেই ছদ্মবেশটা দিয়ে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যের রাজবেশটি ঢাকতে না পেরে রাজবেশটাকেই বেশি দৃষ্টিপন্থী ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। ফলে হাসি হয়েছে অবারিত।

প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই ডমরু মা দুর্গার প্রতি আধুনিক বাবুদের অবিশ্বাস ও অ-ভক্তির তীব্র সমালোচনা করে বলতে চাইলেন—দেবীপদে অবিচল ভক্তি থাকলে দেবী স্বয়ং নেমে আসেন। এই ভক্তির জোরেই ডমরুধর দুর্গতিনাশিনীর অশেষ কৃপায় ভয়াবহ সব সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছেন। পাঠকমনে দৈব বিশ্বাস ও ভক্তির যে স্বাভাবিক একটি আবেদন রয়েছে, সেই আপ্লুত পটভূমিতে একের পর এক যে সাতটি গল্প ডমরু ছড়িয়ে গেলেন, তা অবিশ্বাসের অসম্ভবের রস আহরণ করে উদ্ভটতার ডালপালা মেলে উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের কল্পতরু হয়ে রয়েছে। সাতটি গল্পের প্রতিটিতে ডমরু এমন এক ভঙ্গীতে গল্প বলতে আরম্ভ করেছেন, যেন একান্ত একটা গল্পই শোনাচ্ছেন। পরিচিত স্থানের, পরিচিত মানুষের কথা বলে, সমাজটার নানা দিকের কথা এনে ইয়ারদের মনকে একটা বিশ্বাস্য ঘটনা শ্রবণের জন্য প্রস্তুত করেছেন। যখন দেখেছেন ইয়ারদের মনে এরকম একটা প্রত্যয় এসেছে যে,—ডমরুধর তাঁর জীবনেরই একটা সত্য গল্প বলছেন, তখনই সেই বিশ্বাসের মধ্যে কল্পনার চরম উদ্ভটতা চোলাই করে দিয়ে শ্রোতৃমনের বিশ্বাস উন্মুখতার ভাবটা কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদের সব সংশয়, আশঙ্কা, বিশ্বাস হাস্যকর অসঙ্গতির এই আঘাতে ফেটে হাসিতে সফেন হয়ে উঠেছে। প্রতিটি গল্পে বিশ্বাস-উৎপাদনের সব উপাদানকেই শেষ পর্যন্ত উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির পিরামিডটা তৈরির ইট কাঠ চুন পাথরের উপাদানের কাজে লাগিয়েছেন। উৎকেন্দ্রিকতার হাসি সৃষ্টির এই গুণ পূর্বেকার গল্প-কথনে লক্ষ্য করেছি, 'ডমরুচরিত'-এ তার আয়োজনটি আরো নিখুঁত।

দ্বিতীয়ত, 'লুল্লু', নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'মুক্তামালা', 'একঠেঙো ছকু' প্রভৃতি কাহিনীর প্রকাশ্য আড্ডায় গাঁজা, আফিম গুলির ধোঁয়া ঘুরে ঘুরে উঠছে। তার স্তরে স্তরে স্তরীভূত হয়েছে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরস। ডমরুর পূজার দালান সম্পূর্ণ নিরামিষ। গাঁজা, আফিম, গুলি, এমন কি তামাক পর্যন্ত সেখানে অনুপস্থিত। গাঁজা-আফিম-গুলির উত্তেজক শক্তিকে ডমরু যেন তার ভেতরেই তৈরী করে নিয়েছেন। বাইরের কোন উত্তেজক শক্তির দরকার হয়নি। পূর্ববর্তী উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরস সৃষ্টির ওপর 'ডমরুচরিত' এক্ষেত্রে নিপুণ শিল্প-কৌশল আয়ত্তের পরিচয় দিয়েছে।

পূর্ববর্তী হাস্যরচনার ওপর 'ডমরুচরিত'-এর শ্রেষ্ঠত্ব এসেছে গল্পকথনের

নৈপুণ্যে। 'ডমরুচরিত' একাধিক সাতটি বড় গল্পের স্বাদে পরিপূর্ণ। নায়ক ডমরুকে কেন্দ্র করে গল্পগুচ্ছ এক অবলম্বনে গ্রথিত হলেও, সাতটি গল্পেই কল্পনার সাতমুখী বিকাশ এবং প্রত্যেকটি গল্প কল্পনার উদ্ভাবনায় মৌলিক। রূপকথার মর্জি, অলৌকিকতার সংস্কার, ইঙ্গিত-কটাক্ষ, কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার তলে অবলীন হয়ে প্রসন্ন উচ্চহাস্যেরই ফলশ্রুতি রচনা করেছে। একঠেঙো ছকু, নয়নচাঁদ, কিংবা ঘনশ্যামের তুলনায় ডমরু শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন গল্প-কথনে তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চাতুর্যের ক্ষেত্রে। নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গিতে ও অসম্ভব কল্পনাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করার অনায়াস তৎপরতার ক্ষেত্রে ডমরু পূর্ববর্তী গল্প-কথকদের থেকে নৈপুণ্য ও স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। 'ডমরুচরিত'-এর প্রথম গল্পে ডমরু বিপদ ডেকে এনেছেন গাছে ঝোলা এক সাধুকে বিশ্বাস করতে গিয়ে। এই সাধুকে ইয়ার বন্ধুরা সবাই দেখেছে। সাধু যে বিন্দী গোয়ালিনীর ভিটায় আমগাছে ঝুলছিল তাও তারা জানে। তারা এও জানে এই সাধুকে ঘিরে বহু শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক ভিড় করেছে। ডমরু এই সুপরিচিত ঘটনার অবতারণা করে একটা বিশ্বাস্য পরিবেশ সৃষ্টি করলেন ইয়ারদের মনে। সেই পরিবেশে ধীরে ধীরে তার হাস্যকর উদ্ভট কল্পনাকে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

সাধু তার শক্তিবলে ডমরুর ভেতরের 'আমি'কে কৌশলে বার করে দিয়ে আমি-শূন্য ডমরুধরের শরীর-খোলসটার ভেতর নিজের 'আমি'কে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ডমরু সেজে বসল। ডমরু সেজে সাধু ডমরুর বিষয় ভোগ করতে লাগল। ডমরুর বাগদত্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবার জন্য প্রস্তুত হল। ওদিকে বেচারা ডমরু তার লিঙ্গ-শরীর নিয়ে ছাদফুটো করে শূন্যপথে এলোক সেলোক পেরিয়ে যমদূতের হাতে পড়ল। যমদূত ডমরুকে বেঁধে নিয়ে উপস্থিত হল যমালয়ে। যমালয়ে বৃন্দাবন গুঁইয়ের বিচার দৃশ্য দেখিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ আমাদের সমাজের অন্ধ সংস্কারের ওপর ইঙ্গিত করেছেন। একাদশীর দিন পুঁইশাক খাবার অপরাধে বৃন্দাবন তার চোদ্দপুরুষ নিয়ে নরকবাসের যে শাস্তি পেল, যমের সে বিচার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের মানবতায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানীমন সামাজিক কু-সংস্কারকে আঘাত করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে তিনি ডমরুর লিঙ্গ-শরীরটা নিয়ে হাসির পূর্বপথেই প্রসন্ন মনে এগিয়ে চললেন। সে-পথের অনিয়ন্ত্রিত হাস্যস্রোতে পূর্বের ইঙ্গিত-কটাক্ষ স্বতন্ত্র মর্যাদায় আত্মপ্রতিষ্ঠা পায়নি। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার সকল গল্পেই ইঙ্গিত ব্যঙ্গের উপস্থিতি এইভাবে পরিণতিতে হাস্য-লীনতায় রূপায়িত হয়েছে।

যমদূতেরা ডমরুর বলিষ্ঠ শরীরের ওপর ডাণ্ডস মেরে তাকে আবার তার মর্ত্যের পূজার ঘরেই পাঠিয়ে দিল। লিঙ্গ-শরীর ডমরুর পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনা নতুন মোড় নিল। ডমরুর সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত দেহ-আশ্রয় এবং সুন্দরবন-যাত্রা ও মায়ের কৃপালাভ, রয়াল বেঙ্গল টাইগারের গায়ের ছাল ত্যাগ করে অস্থি-মাংসের দেহ নিয়ে রুদ্ধশ্বাস পলায়ন, গরম গরম সেই বাঘছালের ভেতর লিঙ্গ-শরীর ডমরুর প্রবেশ এবং সন্ন্যাসীর কবলমুক্তি ইত্যাদি বিচিত্র কাহিনীর উদ্ভাবনায় প্রথম গল্পটি উৎকল্পনার হাস্যরসের এক অদ্ভুত সৃষ্টি হয়ে রয়েছে।

ডমরুর এ-কাহিনী সম্বন্ধে যদি কারও সংশয় দেখা দেয়, যদি মনে হয় এ-কাহিনী অবিশ্বাস্য, সে অবিশ্বাস ও সংশয় দূর করতে ডমরুধর প্রস্তুত— 'পাঠকদিগের যদি আমার গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। সে বাঘছাল আমার ঘরে আছে। আমি তাঁহাদিগকে দেখাইব। তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইবে।'

কিন্তু ডমরুর এই অকৃত্রিম চেষ্টায় সন্দেহ দূর হওয়া দূরের কথা সন্দেহ. আরও বদ্ধমূল হয়ে হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে।

এই গল্পটির সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বিজ্ঞানী H. G. Wells-এর The Story of the Late Mr. Elvesham-এর। একটু Pinkish Powder খাইয়ে এক দন্তহীন লোলচর্ম বৃদ্ধ কি করে তরুণ Eden-কে "Packed away in an old man's body' এবং কি করে তার তারুণ্য-স্ফুরিত দেহ নিয়ে, তার চেক-বই, তার টাকা নিয়ে নবীন জীবন ভোগ করতে চাইল, সে কাহিনী এই গল্পটিতে। অবশ্য ডমরুধরের গল্পের নিরবচ্ছিন্ন হাস্য সেখানে নেই। Eden-এর মধ্যে ডমরুর চাতুর্য নেই, দেবীর কৃপাও তার ওপর বর্ষিত হয়নি। সেইজন্য অসম্ভবের হাস্য কিঞ্চিৎ আহত হয়েছে। কিন্তু Wells-এর সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের ঐক্য রয়েছে অসম্ভব কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তিতে।

'ডমরুচরিত'-এর সাতটি গল্পের ছটি গল্প ডমরুর এই উদ্ভট বিপদ এবং মার কৃপায় আরও উদ্ভট বিপন্মুক্তির গল্প। প্রায় প্রতিটি গল্পেই হাসির মধ্যে কখনো সমাজটার ওপর, সংস্কারের ওপর, হিঁদুয়ানীর উগ্রতার ওপর, স্বাদেশিকতার হিড়িকের ওপর টুকরো টুকরো ইঙ্গিত-কটাক্ষ এসেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে তা উৎকল্পনার হাস্যধারায় লীন হয়ে গেছে। পূর্ববর্তী হাস্য রচনার মতো

ত্রৈলোক্যনাথের এই শেষ রচনায়ও উদ্ভট কল্পনার হাস্য থেকে এই কদাচিৎ উপস্থিত ইঙ্গিত-কটাক্ষকে আলাদা করে দেখা যায়নি বলেই কোন গল্পেই তা স্বতন্ত্র হয়ে নজরে পড়তে পারেনি। অথচ যে ইঙ্গিত-কটাক্ষ আঘাত মুক্ত হয়ে এসেছে, কল্পনার উদ্ভটতার হাস্যতলে যে ইঙ্গিত-কটাক্ষ নজরে পড়ার গুরুত্ব হারিয়েছে, তাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে প্রধান করে দেখিয়ে কোন কোন সমালোচক ত্রৈলোক্যনাথকে একজন 'প্রধান স্যাটায়ারিস্ট বা ব্যঙ্গ রচয়িতা' বলে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত আরেকজন সমালোচক হাস্যস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথকে 'সুইফ্‌ট্'-এর সমদলীয় বলে গণ্য করেছেন।

তাঁদের সমালোচনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। তার কারণ পূর্বেই স-উদাহরণ বিশদ আলোচিত হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সর্বত্রই উৎকেন্দ্রিকতার হাসি। উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির বাইরে তিনি যে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন সেখানে ব্যঙ্গ আঘাত তীব্র, কিন্তু হাসি সেখানে অনুল্লেখ্য। অথচ স্যাটায়ারের প্রধান অস্ত্র হাসি। সুতরাং সামাজিক উপন্যাসে ত্রৈলোক্যনাথ স্যাটায়ারিস্ট নন। যেখানে ত্রৈলোক্যনাথ হাসিয়েছেন, সেই উৎকল্পনার গল্পভূমিতেও তিনি কোথাও স্যাটায়ারিস্ট নন। সার্থক স্যাটায়ারিস্ট হাসিকে বক্তব্য প্রকাশের উপায় রূপেই গ্রহণ করেন। কিন্তু হাসতে গিয়ে আঘাত করতে কখনও তিনি বিরত হন না। স্যাটায়ারের হাসির তলে প্রচণ্ড আঘাতটা ও সংস্কার-মনস্কতা প্রচ্ছন্ন শক্তিতে স্বতন্ত্র হয়েই উপলব্ধ হয়। অসূয়ামুক্ত প্রসন্ন হাসি স্যাটায়ারে কখনই দেখা যায় না। Ronald Knox—সার্থক স্যাটায়ারের এই কুলধর্মকে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—"Satire borrows its weapons from the humourist. Yet the laughter which satire provokes has malice in it always."

ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যসৃষ্টির মধ্যে malice বা অসূয়া রয়েছে, তা-তো নজরে পড়েনি। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি সমাজ ও জীবনের ওপর 'a blow in the back or face.'[১৪] হয়ে কোথাও স্যাটায়ারে উন্নীত হয়েছে বলে তো মনে হয়নি। আর এই কারণেই ত্রৈলোক্যনাথকে একজন 'প্রধান স্যাটায়ারিস্ট' বলে মানতে মন চায় না। ত্রৈলোক্যনাথকে একজন প্রধান স্যাটায়ারিস্ট বলতে হলে

১৪. The laughter of satire is a blow in the back or the face.—An Essay on Comedy.

তাঁর সামাজিক উপন্যাস থেকে ব্যঙ্গ অসূয়াটুকু নিয়ে, এবং তাঁর হাস্য-গল্প থেকে হাসি নিয়ে একটা যোগরূঢ় রচনা তৈরি করে বলতে হয়—ত্রৈলোক্যনাথ একজন প্রধান স্যাটায়ারিস্ট। নচেৎ ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে হাস্যস্রষ্টা, সেখানে তিনি কখনওই স্যাটায়ারিস্ট নন। ত্রৈলোক্যনাথের হাসি অসূয়ামুক্ত প্রসন্ন সরব হাসি।

একই কারণে Swift-এর সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের ঐক্যও সমর্থনের ভিত্তি পায় না। Swift-এর শিল্পিমন মানবসমাজের নির্বুদ্ধিতা, অমানুষতার ওপর ঘৃণা, ক্রোধ, আঘাত বর্ষণ করেছে। জীবনের জ্বালাকে প্রকাশ করবার জন্য তিনি হাসির অস্ত্র ধরেছেন। H. Thomas and D. L. Thomas, Swift-এর শিল্পি-স্বভাব সম্বন্ধে এই দিকটির উল্লেখ করেছেন—"He has a compassionate contempt for the Yahoos of the human race, with their perjuries and their passions and their stupidities and swindless and their wars. He was amazed at man's inhumanity to man. He has lost all faith in human reason."[১৫] ত্রৈলোক্যনাথের কি সামাজিক কি হাসির রচনায় এ-দিকটা তো কোথাও চোখে পড়ল না! Swift-এর মত ত্রৈলোক্যনাথ "Was amazed at man's inhumanity to man'. 'কঙ্কাবতী'তে খেতু ব্যথিত হয়ে বলেছিল, "কঙ্কাবতী। মানুষের মনে এ-রূপ নিষ্ঠুরতা কোথা হইতে আসিল? যদি এ-নিষ্ঠুরতা নরক না হয়, তবে নরক আবার কি? কঙ্কাবতী। মানুষে মানুষকে এরূপ যাতনা দেয় কেন? পরকে যাতনা দিতে তাদের ক্লেশ হয় না?" এ-প্রশ্ন এক ব্যথিত শিল্পিআত্মার প্রশ্ন কিন্তু এই ব্যথিত আত্মা সমাজের ওপর ঘৃণার দাক্ষিণ্যে ফেটে পড়েনি। মানুষের অমনুষ্যত্বে Swift-এর amazement যেখানে অকরুণ ঘৃণায় আঘাত করেছে ত্রৈলোক্যনাথ মনুষ্যত্বের কাছেই আবেদন করেছেন। অশ্রুপাত করেছেন এবং নিজে চেষ্টা করেছেন শ্রম দিয়ে, সাধনা দিয়ে, এই অমনুষ্যত্ব দূর করতে দ্বিতীয়ত, ত্রৈলোক্যনাথের সামাজিক উপন্যাসেই এই ব্যথিত উৎকণ্ঠা যা-কিছু ধরা পড়েছে। তাঁর হাস্যজগতে এই উৎকণ্ঠা কোথাও নেই। উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যজগতে ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে অসূয়ামুক্ত প্রসন্ন হাসির ফলশ্রুতি রচনা করেছেন সেখানে Swift-এর সঙ্গে শিল্পিমানসের অনৈক্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে

১৫. H. Thomas and D. L. Thomas—Living Biographies of famous Novelists.

Swift-এর মত তিনি "Lost all faith in human reason ;"—একথা মোটেই সত্য নয়। বরং মনুষ্যত্বে আবেগ-তীব্র বিশ্বাসই ছিল ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিস্বভাবের মূল কথা। 'বাঙ্গাল নিধিরাম', 'কঙ্কাবতী'তে ত্রৈলোক্যনাথ উদার মনুষ্যত্বের আলোকে ব্যক্তির ও সমাজের অমনুষ্যত্বকে কিভাবে ক্ষমা করেছেন সে-কথা বলা হয়েছে। এই মনোভাবের জন্যই তিনি Swift-এর মত 'compassionate contempt'-এর অস্ত্রে সমাজকে ও জীবনকে কোথাও আঘাত করতে পারেননি। সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও Swift-এর শিল্পি-স্বভাবের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিস্বভাবের পার্থক্য সুস্পষ্ট। হাস্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে Swift-এর সঙ্গে ঐক্য তো কোনদিকেই চোখে পড়ে না।

পূর্ববর্তী হাস্যসৃষ্টিতে যেমন, আলোচ্য 'ডমরুচরিতে'ও ত্রৈলোক্যনাথ কোথাও একজন প্রধান স্যাটায়ারিস্ট হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর শিল্পিস্বভাব যে তাঁর স্যাটায়ারিস্ট অভিধার বিরোধিতা করেছে, সেকথা অনস্বীকার্য সত্য।

সুকুমার সেন মহাশয় 'ডমরুচরিত'কে Cerventes-এর Don Quixote-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। Don Quixote-এর মূলে রয়েছে "Squalor of poverty and the bitterness of despair.[১৬] 'ডমরুচরিতে'র উদ্ভবের এ-জাতীয় পশ্চাৎভূমি নেই। ত্রৈলোক্যনাথের ব্যক্তি-জীবনের যে ছবিটি তুলে ধরা হয়েছে সেখানে দারিদ্র্যপীড়ন ও হতাশার ওপর ত্রৈলোক্যনাথ বীরাসনে বসে সচ্ছলতা জয় করে এনেছিলেন। ১৮৯৬-তে তিনি কর্ম থেকে অবসর নেন। এর পূর্বেই তিনি অতি উচ্চ বেতনের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসকের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান অর্জন করেছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনা এই সচ্ছলতা ও সম্মানের মধ্যে রচিত। অভাব ও হতাশার অতীত অভিজ্ঞতাটা একমাত্র প্রথম রচনা 'কঙ্কাবতী'তে (১৮৯২) খেতুর চরিত্রে কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর 'লুল্লু', 'বীরবালা' প্রমুখ অন্যান্য হাস্যসৃষ্টিতে এই অতীত অভিজ্ঞতাটাও ছায়া ফেলেনি। 'ডমরুচরিত' সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। Don Quixote-এর মত 'Squalor of poverty and the bitterness of despair'-এর মধ্যে 'ডমরুচরিত' রচিত তো হয়-ই নি, অতীতের বিষাক্ত অভিজ্ঞতাটাও বক্রোক্তিতে

১৬. Living Biographies of famous Novelists :—"All of it (Don Quixote) has been planned and composed amidst the squalor of poverty and the bitterness of despair."

কোথাও হাস্যের তলে রূপ পায়নি। সুতরাং Don Quixote-এর উদ্ভব-ইতিহাস এবং ভমরুচরিতের উদ্ভব-ইতিহাসের মধ্যে যে তুলনা চলে না, সেকথা অস্বীকারের হয়তো কারণ নেই।

দ্বিতীয়ত, দুই গ্রন্থের রসাস্বাদনে একটা পার্থক্য লক্ষণীয়। 'Don Quixote'-এর খেয়ালী পাগলামো ও আনন্দের হাস্যের মধ্য দিয়ে সমকালীন Spain-কে তার স্খলন পতন নিয়ে আবিষ্কার করা যাচ্ছে। "While Cerventes lived, Spain was still enjoying the glories of her past, still unconscious of the desparate poverty of her lower classes, still unable to realise how tremendous had been sacrifice of energy and human resources in the conquest and settlement of the New World. It was amage of conspicuous expenditure, of great advances in art and education, of the splendour of courts and the squalor of the cities; of decline agriculture, of the loss of Spain's best blood in European wars and overseas adventures." [১৭] Cerventes হাস্যের তলে তাঁর বক্রোক্তি-জীবিত কলমে সমকালীন যুগকে উপস্থিত করেছেন তাঁর Don Quixote-এ। Don Quixote সমকালীন Spain-এর ইতিহাসদর্পণ। এই ইতিহাসগত প্রত্যক্ষ মূল্যে Don Quixote সাহিত্যের রোমান্টিক রীতিচর্চাকে, শিভল্‌রির প্রচলিত পন্থানুসৃতিকে যে আঘাত করেছে তা অস্বীকার করা যায় না। চোখের জলের মধ্য দিয়ে Carventes যে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, এ সত্য উপেক্ষা করে Don Quixote-এ যাঁরা কেবল হাস্য লক্ষ্য করেছেন, তাঁরা এই গ্রন্থকে অর্ধাঙ্গ করে পড়েছেন। Don Quixote-কে ঠেকে শিখতে হয়েছে যে 'Will and courage, will be fruitless if they are misapplied' এবং Don Quixote-এর ভাগ্য পরিহাস হল "It emphasises the folly of the individual who abandons the immediate sphere of well doing are well being in order to embark as an enterprize for which he has neither skill nor preparation." এই folly-র পথেই Don Quixote-এ হাস্য এসেছে, এবং হাস্যের তলে পুঞ্জীভূত হয়ে এসেছে চোখের জল।

১৭. Henry Grattam Doyle – Don Quixote – Introduction.

'ডমরুচরিত'-এর উদ্ভট বিপদ এবং আরও উদ্ভট বিপন্মুক্তির কল্পনার মধ্যে সমকালীন সমাজ ও মানুষের ওপর ইতস্তত বিকীর্ণ যে ইঙ্গিত-কটাক্ষ লক্ষ্য গোচর হয়, তা Don Quixote-এর মত কিছু প্রমাণ করে না। 'ডমরুচরিত'-এ Don Quixote-এর অনুরূপ জীবনদর্শন ও ভাগ্যের পরিহাস কোথাও নেই। 'ডমরু-চরিত'-এ ত্রৈলোক্যনাথ অসূয়ামুক্ত প্রসন্ন হাসির মধ্য দিয়ে যে জীবনের ওপর দৃষ্টিপাত করেছেন, এ সত্য উপেক্ষা করে 'ডমরুচরিত'-এ যাঁরা satire লক্ষ্য করেছেন, তারা হয়তো এই গ্রন্থের সুবিচার করেননি। কালের সীমা অতিক্রম করে বিভিন্ন যুগের রসবোধে Don Quixote তীব্র সমালোচনার অবসর সৃষ্টি করেছে। Cerventes-কে কেউ বলেছেন— 'Psychologist', 'Erasmian', 'Man of the Middle Ages', 'Barogne man' এমন কি তাঁকে কেউ কেউ Communist পর্যন্ত বলেছেন।[১৮] 'ডমরু-চরিতে'র একমাত্র পরিচয়, এ গ্রন্থ চিন্তাক্লিষ্ট, সমস্যাদুষ্ট মানুষকে উৎকল্পনার হাস্যের পথে অন্তরস্থিত সজীবতার সন্ধান দিয়ে মুক্তপক্ষভারহীন স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দ দিয়ে এসেছে। অসূয়ামুক্ত প্রসন্ন হাস্যসৃষ্টির পশ্চাতে যে সুগভীর জীবন-বোধ ও মানবতা বোধ প্রয়োজন, সে গুণের পূর্ণ অধিকারী হয়ে ত্রৈলোক্যনাথ শতবর্ষ পরেও একজন প্রধান হাস্যস্রষ্টারূপে পরিচিত হয়ে এসেছেন।

সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পরস্পরের মধ্যে আনন্দদানের ক্ষেত্রে যে ঐক্য রয়েছে, Don Quixote-এর সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুচরিতেরও সেই পথেই একমাত্র তুলনা চলে।

'ডমরুচরিত'-এর দ্বিতীয় গল্পে চুম্বক শক্তির প্রশস্ত বিজ্ঞানসত্যের ওপর ডমরু একটি মোক্ষম উদ্ভট চুরির গল্প দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী-চোরের আকর্ষণে সরকেল বাড়ীর লোহার জিনিসপত্র উড়ে চলেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে নেমে শূন্যপথে লোহার সিন্দুক চলেছে। সিন্দুকের পেছনে হাত-বেড়ি খন্তা-কুড়ুলকে সাঁ সাঁ করে ছুটিয়ে দিয়ে শেষে ডমরু তাঁর চাবির থলের সঙ্গে নিজেকেই শূন্যপথে ছুটিয়ে দিয়েছেন। মায়ের কৃপায় ডমরুর লাভের ভাগ্য। সরকেল বাড়ির এই উদ্ভট চুরির ঘটনায় ডমরুর দু হাজার টাকা ভাগে এল। এবং এই অদ্ভুত চুরির পেছনে যে একটি চুম্বক পাথরের কালীমূর্তি ছিল, সে সত্য ডমরু উদ্ঘাটিত করে

১৮. Published in the Cerventes Quadricentennial Number of His Thirty Years of Cerventes Criticism.

সকলকে বিস্মিত করলেন। লম্বোদর বললেন—'এ সমুদয় তোমার আজগুবি গল্প। এ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আমরা সেই সময় শুনিয়াছিলাম যে, সরকেল মহাশয়ের বাড়িতে যথার্থই চুরি হইয়াছিল এবং সে চোরগণ তোমার অপরিচিত লোক ছিল না।'

ডমরু উত্তর করিলেন—'সমুদয় মিথ্যা কথা ? হিংসায় লোকে কিনা বলে।'

ডমরু তাঁর গল্পের আরম্ভে এবং শেষে এইভাবে এক সত্য কথনের ভণিতা করেছেন—বিশ্বাসের একটা ভূমি রচনা করবার চেষ্টা করে তিনি তার ওপর চির অবিশ্বাসের উচ্চহাস্যের উৎকেন্দ্রিক গল্প-আসর জমিয়ে তুলেছেন। দ্বিতীয় গল্পে বিজ্ঞান সত্যের কঙ্কালের ওপর ত্রৈলোক্যনাথ উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের যে নিটোল গল্প সৃষ্টির পথ দেখালেন, সে সূচনার পরিণতি দেখেছি বর্তমান কালের প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'র গল্পে।

দ্বিতীয় গল্পের অষ্টম পরিচ্ছেদে কুমীর শিকারের এক আজগুবি গল্প বলেছেন ডমরুধর। ডমরুর আবাদে নদীতে যে পর্বতপ্রমাণ কুমীর কর্মচারীদের খেয়ে অত্যাচার চালাচ্ছিল, ডমরু বহুকষ্টে বহুল আয়োজনে সে ডাকাত কুমীর শিকার করলেন। কুমীর শিকার করে তার পেট কেটে দেখলেন কুমীরটা যে পূর্বদেশীয় এবং ক-দিন আগে যে বেগুনওয়ালী সাঁওতাল মাগীকে গিলেছিল, সেই সাঁওতাল মাগী পূর্বদেশীয়া মহিলার সমস্ত গয়না পরে কুমীরের পেটের মধ্যে বেগুনের ঝুড়ির ওপর বসে বেগুন বেচছে। এ-কাহিনী শুনে শঙ্কর ঘোষ বললেন, 'কুমীরের পেটের ভিতর ঝুড়ির উপর বসিয়া সে বেগুন বেচিতেছিল ?'

লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল ? কুমীরের পেটের ভিতর সে খরিদ্দার পাইল কোথা ?'

বিরক্ত হইয়া ডমরুধর বলিলেন, 'তোমার এক কথা। কাহাকে সে বেগুন বেচিতেছিল, সে খোঁজ করিবার আমার সময় ছিল না।'

ত্রৈলোক্যনাথের কলমের এই স্পর্শটুকু অপূর্ব শিল্পকৌশল-মণ্ডিত। অতবড় আজগুবী গল্পটা পাছে ধরা পড়ে যায়, সেজন্য ডমরুধরের এই কৃত্রিম রাগের প্রকাশ হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। এবং উচ্ছ্বসিত হাসি আরও উপভোগ্য হয়েছে, গল্পের শেষে ডমরুধর যখন গল্পের সত্যতার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। শঙ্কর ঘোষ বলিলেন, 'এ কুমীরের গল্প যে সত্য, তাহার কোন প্রমাণ আছে ?' ডমরুধর উত্তর করিলেন—'প্রমাণ ? নিশ্চয় প্রমাণ আছে। কোমরের ব্যথায়

জন্য এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।' লম্বোদর জিজ্ঞাসা করিলেন—'সে কুমীর যদি তালগাছ অপেক্ষা বৃহৎ ছিল, তবে তাহার দাঁত এত ছোট কেন ? ঠিক অন্য কুমীরের দাঁতের মত কেন ?'

ডমরুধর উত্তর করিলেন—'অনেক মানুষ খাইয়া সে কুমীরের দাঁত ক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।'

ডমরুধরের এমন নিস্পৃহ, সপ্রতিভ, চতুর উত্তর যুক্তিতর্কের বাঁধ ভেঙে দিয়ে হাসিকে সরব করে তুলেছে।

ডমরুর এই উদ্ভট শিকার গল্পের একটি ধারানুসরণ বর্তমান বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা গেছে সম্বুদ্ধ-র শিকার গল্পে।

তৃতীয় গল্পে কোন এক গণৎকার গণনা করে ডমরুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ডমরু মনুষ্য নন, তিনি মা দুর্গার কনিষ্ঠ পুত্র কার্তিকেয়। অবতার হয়ে তিনি পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছেন। অবতার হয়েছেন কোন অভিশাপের দরুন নয়, মর্ত্যে এসে বিয়ের সাধ পূর্ণ করতে। কিন্তু মায়ের প্রিয় বলে তার ওপর নন্দীর যে একটু ঈর্ষা আছে, এবং তাকে বিপদে ফেলবার জন্য নন্দী যে সুযোগ খুঁজছে, সে কথা গণৎকার স্মরণ করিয়ে দিলেন। নন্দীর ক্রোধে ডমরুধর কি করে বিপদে পড়লেন তৃতীয় গল্প ডমরুধরের সেই বিপদ ও বিপদোত্তরণের উদ্ভট গল্প।

পীর গোরাচাঁদের অসম্মান করে ডমরুধর যে বিপদে পড়েছিলেন সে বিপদ ও বিপন্মুক্তির অফুরন্ত হাসির গল্প চতুর্থ গল্প। আলোচনার প্রারম্ভে এই অনুপম কল্পনার পরিচয় দেওয়া গিয়েছে।

পঞ্চম গল্প ডমরুর এক উদ্ভট বিপদের কাহিনী। 'চঞ্চলা'কে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে ডমরু এক দুর্ঘটনায় কোমর থেকে নিচের অংশ হারাল। ডমরুর সঙ্গে চঞ্চলার গাইগোরু দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। গোরুটার কোমর থেকে ওপরের অংশ কাটা যায়। ভিখু ডাক্তার তাড়াতাড়ি করে ডমরুর উর্ধ্বাংশের সঙ্গে চঞ্চলার গোরুটার নিম্নাংশ একত্র করে ওষুধ দিয়ে জুড়ে দেন। অর্ধেক গোরু, অর্ধেক মানুষ—এই গোমানুষ হয়ে ডমরুধর চঞ্চলাকে প্রত্যহ দু'সের করে দুধ দিয়েছেন, আরেক দিকে ভিখুর জমি চাষ করে দিয়েছেন। দ্বিখণ্ডিত মানুষকে উপযুক্ত আঠা (Glue) দিয়ে জুড়ে বাঁচিয়ে তুলবার উদ্ভট কল্পনা Lear-এ রয়েছে—

There was an old Man of Nepaul
From his horse had a terrible fall
But, though split quite in two
By some very strong glue
They mended that Man of Nepaul.

কিন্তু মানুষ ও গোরুকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিয়ে জুড়ে দিয়ে দু'সের করে দুধ দুইয়ে নেওয়া ও জমি চাষ করাবার মৌলিক উদ্ভাবনা সকল দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। ডমরুধরের এই অভূতপূর্ব বিপদ এবং দুর্গতিনাশিনীর কৃপায় পূর্ণাঙ্গদেহে বিপন্মুক্তির গল্প পঞ্চম গল্প। পুরাণের নরসিংহ, অর্ধনারীশ্বর কল্পনাকে অতিক্রম করে ত্রৈলোক্যনাথ গো-মানুষের যে হাস্যময় কল্পনা করলেন বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব। ষষ্ঠ গল্পে ডমরুধর নষ্টচন্দ্র দেখে তার বিপদ ডেকে এনেছেন। নষ্টচন্দ্র দেখলে চুরি করতে হয়। মাছ চুরি করতে গিয়ে ডমরু পরিধেয় খুইয়ে উলঙ্গ অবস্থায় মাথায় টুপি পরে 'ন্যাংটা গোরা' সেজে যে বিপদে পড়েছিলেন, ষষ্ঠ গল্প সে উদ্ভট বিপদের গল্প।

সপ্তম গল্প ডমরুর বিপদের গল্প নয়। অবতার ডমরুর কৃতিত্বের গল্প। ডমরু এ-গল্পে একটু লীলাখেলা দেখিয়েছেন। ঢাক মহাশয় যখন দয়াময়ী দুর্গার ওপর বিশ্বাস হারালেন, তখন ডমরু মায়ের কৃপায় জিলেট মন্ত্রে অভিশপ্ত ঢাককে কি করে একচক্ষুহীন দামড়া গোরুর রূপ থেকে মানুষের রূপে ফিরিয়ে আনলেন এবং কন্যাজামাতাকে উদ্ধার করলেন, সে অপূর্ব কৃতিত্বের গল্প ডমরুচরিতের শেষ গল্প।

লম্বোদর এই শেষ গল্পটি শুনে বললেন, 'আচ্ছা আজগুবি গল্প তুমি বানাইতে পার।'

ডমরুধর উত্তর করিলেন—'সকলই মহামায়ার মায়া। জিলেট জিলেকি সিলেমেল কিলেকিট কিলেকিশ।'

ডমরুচরিতের এই সাতটি গল্প যেহেতু ডমরুধরের জীবনেরই সত্য গল্প, সেজন্য গল্পগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে। এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ত্রৈলোক্যনাথের উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের সমস্ত গল্পাখ্যানের মধ্যেই রয়েছে একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র। কয়েকটি পরিচিত ভূত পেত্নী পশুপক্ষী ইয়ার নিয়ে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের জগৎটা গড়ে উঠেছে। 'কঙ্কাবতী'তে যে নাকেশ্বরী ও গোঁ গোঁ ভূতের কথা পেয়েছি, 'লুল্লু'তে তাদের আবার দেখেছি। তাদের

মিলনের উৎসব দেখেছি। 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় নয়নচাঁদ যে সুবল ঘোষের গল্প বলেছে, সে সুবলকে ডমরুধরও চেনেন। তৃতীয় গল্পে ডমরু সুবল ঘোষের কথা বলেছেন। উৎকেন্দ্রিকতার সমস্ত রচনার মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখাবার পেছনে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিমনের যে ভাবনা কাজ করেছে, সে হোল,— একটা বিরাট বিস্তৃত বৈঠকের ভাবনা। নয়ন ফরাসডাঙ্গার, একঠেঙো ছকু ফরাসডাঙ্গার। কিন্তু আমীর দিল্লীর, ডমরু কোলকাতার দক্ষিণের এক গ্রামের। বৈঠকের স্থান যার যেখানেই হোক, এরা সকলে এক বিরাট বৈঠকের অন্তর্ভুক্ত। সেই বৈঠকেরই স্থানে স্থানে বসে এরা গল্প করেছে—একই বাড়ির এ-ঘর ও-ঘরের মত। এরা সকলেই শ্রোতা, আবার এরা অনেকেই বক্তা। ত্রৈলোক্য-নাথের ডমরুচরিত' সৃষ্টি এক মৌলিক সৃষ্টি।

বাংলা সাহিত্যে ডমরুচরিতের গল্পের জুড়ি নেই। ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে উৎকেন্দ্রিক হাস্যরসের এহেন মৌলিক উদ্ভাবনা আছে কিনা জানি না। হিন্দী সাহিত্যে হাসির 'কহনীয়া' রয়েছে। সেখানে এ জাতীয় অদ্ভুত কল্পনার প্রসন্ন অনাবিল হাসি নেই। ইংরেজী ভাষায় রচিত অ-ইংরেজের রচনাকে যদি ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়, তাহলে ইংরেজী ভাষায়ই অষ্টাদশ শতকে ডমরুচরিতের এই উদ্ভাবনার সমগোত্রীয় উদ্ভাবনা বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে জার্মান লেখক Rudolph Erich Raspe-র (১৭৩৭-৯৪) গ্রন্থ "The Travels and Surprising Adventures of Baron Munchousen "[১৯]

১৯. Mounchousen, Baron,—Narrative of his Marvellous Travels, by Rudolph Erich Raspe, Published in 1785.

The original Baron Mounchousen is said to have lived in 1720-97, to have served in the Russian-army against the Turks, and to have been in the habit of grossly exaggerating his experiences. Raspe was a German adventurer who fled to England to escape the consequences of a theft, and added to his resources by publishing in English a verson of the Barron's Narratives.

The Oxford Companion to English Literature—Compiled & Edited by—Sir Paul Harvey, Page-541.

ডমরু বা Munchousen পাশাপাশি রেখে পড়লে দু'য়ের মধ্যে কল্পনার সাদৃশ্যের আনন্দে বিস্ময় লাগবে। সে উচ্ছ্বসিত হাসির গ্রন্থ থেকে দু-একটি কাহিনী 'ডমরুচরিত'-এর সঙ্গে পড়লে ডমরু কাহিনীর গৌরব এবং ঔজ্জ্বল্য যেমন দ্বিগুণিত হবে, বাংলা ও সুদূর জার্মানের দুই শিল্পীর মধ্যে উদ্ভট কল্পনার ও তার রূপায়ণের একটা বিস্ময়কর ঐক্যও লক্ষ্য করা যাবে। এবং এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠার ভূমি ও আলো পাবে যে, উৎকেন্দ্রিকতার প্রসন্ন উচ্চহাসি নানাদেশেই হাস্যরসের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহ্যময় স্বমহিম ধারা রচনা করেছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ডমরুচরিতের পাশে Munchousen-এর গল্পস্থাপনা অবান্তর উপস্থাপনা হবে না।

ত্রৈলোক্যনাথের মত Mounchousen-ও তাঁর উদ্ভট কল্পনার হাস্যময় গল্পকে রূপ দিতে গিয়ে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টির উল্লেখযোগ্য কৌশলটি আয়ত্ত করেছেন। Chapter V-এর যে গল্পটি উদ্ধৃত করা হচ্ছে, তার আরম্ভে গভীর গম্ভীরভাবে শোনালেন, উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মানুষ কি করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারে। নিন্দা করলেন তাদের যারা ভাগ্যের ওপর, দৈবের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে। এই গুরু-গম্ভীর সর্বস্বীকৃত মতের স্বপক্ষে পাঠকও যখন সায় দিতে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস-উন্মুখ মনের মধ্যে চোলাই করে দিলেন কল্পনার চরম উদ্ভটতার হাসির কাহিনীটিকে।

CHAPTER—V

All these narrow and lucky escape, gentlemen, were chances turned to advantage by presence of mind and vigorous exertions, which, taken together, as everybody knows, make the fortunate sportsman, sailor and soldier, but he would be a very blamable and imprudent sportsman, admiral, or general, who would always depend upon chance and his stars, without troubling himself about those arts which are their particular persuits, and without providing the very best implements, which insure success. I was not blamable wither way ; for I have always been as remarkable for the excelleney of horses, dogs, guns and swords, as far the proper manner

of using and managing them, so that upon the whole I may hope to be remembered in the forest, upon the turf, and in the field. I shall not enter here into any detail of my stables, kennel, or armoury, but a favourite bites of mine I cannot help mentioning to you; she was a greyhound, and I never had or saw a better. She grew old in my service and was not remarkable for her size, but rather for her uncommon swiftness. I always coursed with her. Had you seen her you must have admired her, and would not have wondered at my predilection, and at my coursing her so much. She ran so fast, so much, and so long in my service, that she actually ran off her legs; so that, in the latter part of her life, I was under the necessity of working and using her only as a terrier, in which quality she still served me many years.

Coursing one day a hare, which appeared to me uncommonly big, I pitied my poor bitch, being big with pups, yet she could course as far as ever I could follow her on horse back. At once I heard a cry as it were of a pack of hounds—but so weak and faint that I hardly knew what to make of it. Coming up to them, I was greatly surprised. The hare had littered in running, the same had happened to my bitch in coursing, and there were just as many leverets as pups. By instinct the former ran, the latter coursed and thus I found myself in possession at once of six hares, and as many dogs, at the end of a course which had only begun with one.

I remember this, my wonderful bitch, with the same pleasure and tenderness as a Lithuanian horse, which no money could have bought. He became mine by an accident which gave me an opportunity of showing my horsemanship to a great advantage. I was at count Probossky's noble country seat in Lithuania and remained with the ladies at tea in the drawing room, while the gentlemen were down in the yarn, to see a young horse of blood which had just arrived

from the stud. We suddenly heard a noise of distress; I hastened down stairs, and found the horse so unruly, that nobody durst approach or mount him. The most resolute horseman stood dismayed and a ghost, despondency was expressed in every countenance, when, in on leap, I was on his back, took by surprise, and worked him quite into gentleness and obedience, with the best display of horsemanship I was master of. Fully to show this to the ladies, and save them unnecessary trouble, I forced him to leap in at one of the open window of the tearoom, walked round several times, pace, trot, and gallop, and at last made him mount the tea-table, there to repeat his lessons in a pretty style of miniature which was exceedingly pleasing to the ladies, for he performed them amazingly well, and did not break either cup or saucer. It placed me so high in their opinion, and so well in that of the noble lord, that, with his usual politeness, he begged I would accept of this young horse, and ride him full career to conquest and honour in the campaign against the Turks, which was soon to be opened, under the command of Count Munich.

I could not indeed have received a more agreeable present, nor a more ominous are at the opening of that campaign, in which I made my apprenticeship as a soldier. A horse so gentle, so spirited, and so fierce—at once a Lamb and a Bucephalus, put me always in mind of the soldier's and the gentlemen's duty, of young Alexander, and of the astonishing things he performed in the field.

We took the field, among several other reasons, it seems, with an intention to retrieve the character of the Russian arms, which had been blemished a little by Czar Peter's last campaign on the Pruth; and this we fully accomplished by several very fatiguing and glorious campaigns under the command of that great general I mentioned before.

Modesty forbids individuals to arrogate to themselves great success or victories, the glory of which is generally engrossed by the commander—nay, which melt gunpowder but at the field-days and reviews of their troops, never saw a field of battle, or an enemy in battle array.

Nor do I claim any particular share of glory in the great engagement, with the enemy. We all did our duty, which, in the soldier's, and gentleman's language, is a very comprehensive word, of great honour, meaning, and import, and of which the generality of idle quidnuncs and coffee-house politicians can hardly form any but a very mean and contemptible idea. However, having had the command of a body of pussors, I went upon several expeditions, with discretionary powers ; and the success I then met with is, I think, fairly and only to be placed to my account, and to that of the grave fellows whom I led on to conquest and to victory We had very hot wave once in the van of the army, when we drove the turks into Oczakow. My spirited the Lithuanian had almost brought me into a scrape ; I had an advanced fare-post, and saw the enemy coming against me in a cloud of dust, which left me rather uncertain about their actual numbers and real intentions ; to wrap myself up in a similar cloud advanced my knowledge, or answered the end for which I had been sent out, therefore I let my flankers on both wings spread to the right and left and make what dust they could, and I myself led on straight upon the enemy, to have a nearer sight of them ; in this I was gratified, for they stood and fought, till, for fear of my flankers, they began to move off rather disorderly. This was the moment to fall upon them with spirit, we broke them entirely—made a terrible havoc amongst them, and drove them not only back to a walked town in their rear, but even through it contrary to our most sanguine expectation.

The swiftness of my Lithuanian enabled me to be formost in the pursuit, and seeing the evening fairly flying through the opposite gate, I thought to be prudent to stop in the market place, to order the men to rendezvous. I stopped, gentlemen but judge of my astonishment when in this market place I saw not one of my pussors about me! Are they scouring the other streets? Or what is become of them? They could not be far off, and must, at all events, soon join me. In that expectation I walked my panting Lithuanian to a spring in this market place, and let him drink. He drank uncommonly, with an eagerness not to be satisfied, but natural enough; for when I looked round for the men, what should I see, gentlemen! The hind part of the poor creature —croup and legs were missing, as if he had been cut in two, and the water ran out as it came in, without refreshing or doing him any good! How it could have happened was quite a mystery to me, till I returned with him to the town gate. There I saw, that when I rushed in pell-mell with the flying enemy, they had dropped the portcullis (a heavy falling door, with sharp spikes at the bottom, let down suddenly to prevent the entrance of an enemy into a fortified town) unperceived by me, which had totally cut off his hind part, that still lay quivering on the outside of the gate. It would have been an irreparable loss, had not our farries contrived to bring both parts together while hot. He sewed them up with springs and young shoots of laurels that were at hand; the wound healed, and, what could not have happened but to so glorious a horse, the springs took root in his body, grew up, and formed a bower over me; so that after-words I could go upon many other expeditions in the shade of my own and my horse's laurels.

এই কাহিনীকে পাছে পাঠকসমাজ আজগুবি বলে বসেন, সেজন্য রাস্পে গল্প আরম্ভ করবার আগে, এ গল্পের বিষয়ে নিঃসন্দেহ করতে গিয়ে পাঠকের কাছে একটি আবেদন করলেন।

TO THE PUBLIC

Having heard, for the first time, that my adventure, have been doubted, and looked upon as joker, I feel bound to come forward and vindicate my character for veracity, by paying three shillings at the Mansion House of this great city for the affidavite hereto offended.

This I have been forced into in regard of my own honour, and though I have retired for many years from public and private life, I hope that this, my last edition, will place me in a proper light with my readers.

To the Public

At Title city of London, England.

We, the undersigned, as true believers in the profit, do most solemnly affirm, that all the adventures of our friend Baron Munchaousen, in whatever country they may lie, are positive and simple facts. And, as we have been believed, whose adventures are tenfold more wonderful, so do we hope all true believers will give him their full faith and credence.

Sworn at the Mansion	Gulliver X
House, 9th Nov. Last, in	Sindbad X
the absence of the Lord Major.	Aladdin X

রাস্‌পে তাঁর গল্পের শুরুতেই উৎকল্পনার হাস্যকে সম্ভব ও বিশ্বাস্য করে তুলবার যারপরনাই চেষ্টা করে হাসিকে উদ্বেল করে তুললেন। গ্রন্থে গল্পে গল্পে সেই হাস্য-তরঙ্গকেই উচ্চরোল ও বিচিত্র করা হয়েছে। অনুরূপ সাফাই গেয়ে নিয়েছেন H.G. Wells তাঁর 'The Flattner Story'র ক্ষেত্রে। ত্রৈলোক্যনাথ অনুরূপ কৌশল প্রয়োগ করেছেন গল্পের পরিশেষে। গল্প সমাপ্ত হলে ইয়াররা আজগুবি উদ্ভট বলে গল্পকে যখন অবিশ্বাস করিতে চেয়েছে, ডমরু নির্বিকার চিত্তে ধা করে একটা প্রমাণ বার করে অবিশ্বাসকে ঢাকতে চেয়েছেন। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, ডমরু প্রমাণ সঙ্গে করে প্রস্তুত হয়েই গল্পের আসরে

নামতেন।[১] কিন্তু সে প্রমাণটুকু অত বড় আজগুবিটাকে ঢাকবার পক্ষে এত অকিঞ্চিৎকর যে তা শ্রোতাদের হাসিকেই চতুর্গুণ করেছে। যখন অত বড় মিথ্যাটাকে দ্রুত প্রমাণ দিয়ে ঢাকতে পারেননি, তখনই ডমরুধর রাগ প্রকাশ করেছেন, গল্প না বলার ভয় দেখিয়েছেন, শ্রোতার রসবোধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

'দেখ লম্বোদর। সকল কথার খোঁচ ধরিও না।' (চতুর্থ গল্প)

লম্বোদর বলিলেন—'এ সমুদয় তোমার আজগুবি গল্প।' ডমরুধর উত্তর করিলেন—'সমুদয় মিথ্যা কথা, হিংসায় লোকে কিনা বলে।' (দ্বিতীয় গল্প)

শ্রোতা পুরোহিত যখন ভূতের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করতে নারাজ, ডমরুধর ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—'পুরোহিত মহাশয়, আপনি সাদাসিদে লোক, আপনি এ সব কথা বুঝিতে পারিবেন না।' (তৃতীয় গল্প)

যে ময়ুর চড়ে ডমরু পৃথিবী ঘুরেছেন, সে ময়ূরের কথা যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণ করবার জন্য ডমরু খড়ি দিয়ে শানের ওপর ছবি এঁকে দেখালেন। "ময়ূরের ছবি দেখিতে সকলে তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ছবি দেখিয়া লম্বোদর একটু হাসিলেন,—কুপিত হইয়া ডমরুধর বলিলেন—'হাসিও না। এ তোমাদের পৃথিবীর ক্যাঁক্ কেঁকে পেখম ধরা ময়ূব নহে। এ আসল কার্তিকের কৈলাসি-ময়ুর।" (চতুর্থ গল্প)

ডমরুর রাগ দেখে ইয়াররা গল্প শোনার আনন্দ পাছে নষ্ট হয়ে যায়, সে আশঙ্কায় উদ্গত হাসিকে চেপে রেখেছে এবং আজগুবি উদ্ভট গল্পকেই সত্য বলে মেনে নিয়েছে। এবং কি Munchaousen, কি ডমরুধর তাঁরা তাদের গম্ভীর ভাবের পর্দার আড়ালে শ্রোতাদের রুদ্ধহাসি উজ্জ্বল-উচ্ছল চোখ দেখে মুখ লুকিয়ে নিজেরাও হেসেছেন। আর ইয়াররাও হেসেছেন ডমরুকে, Munchaousen'কে লুকিয়ে। এবং আসরের বাইরে অপেক্ষমান যুগ যুগের শ্রোতা পাঠকের দল এই কথক ও ইয়ারদের সপক্ষেই উচ্চ হাসির কলরব করে উঠেছেন। উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ কৌশল এখানেই।

১। "এই আমার পায়ে এখনও রাহুর কামড়ের দাগ রহিয়াছে।" সত্য সত্যই ডমরুধরের পায়ে একটা কাটা দাগ আছে, তা দেখিয়া সকলে অবাক। (চতুর্থ গল্প)

"প্রমাণ? নিশ্চয়ই আছে। কোমরের ব্যথার জন্ম এই দেখ সেই কুমীরের দাঁত আমি পরিয়া আছি।" (দ্বিতীয় গল্প)

উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যসৃষ্টি করতে গিয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র হিসেবে একটি বৈঠকী পরিবেশকে সকলেই বেছে নিয়েছেন। এই আসরে পশ্চাৎক্ষেপণ (Flash back) কৌশল নিয়ে উদ্ভটতার হাস্যময় বীজ ছড়ানো হয়। ত্রৈলোক্যনাথের ইয়ারদের নিয়ে একটি গ্রামীণ বৈঠক যেমন সৃষ্ট হয়েছে Munchousen-ও gentlemenদের নিয়ে একটি আসর গড়ে নিয়েছেন। সেই সব gentle-menদের বার বার সম্বোধন করে Manchousen'র গল্প নতুন নতুন মোড় নিয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ কোন গল্পে (যেমন 'লুল্লু') নিজেই গল্পকথক হয়েছেন, আড্ডাধারী হয়েছেন। আবার 'ডমরুচরিত', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় 'এক ঠেঙো ছকু' ইত্যাদিতে একজন আড্ডাধারী বসিয়ে তার মুখে পশ্চাৎ-ক্ষেপণ রীতিতে গল্পাসর জমিয়েছেন। Raspe, Munchousen'কে আসর-কর্তা করে তার মুখে পশ্চাৎক্ষেপণ রীতিতে গল্প শুনিয়েছেন।

এই রীতি আশ্রয়ের বড় সুযোগ হল কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ। শ্রোতা অতীতের সঙ্গে পরিচিত নয় বলেই তার মনে অতীতকে সহজ বিশ্বাস্য করে তোলা যেমন সহজসাধ্য, অনুরূপ সহজ সেই আবরণটি বিনষ্ট করা। শ্রোতার অতীত অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে লেখক দুহাতে grossly exaggeration কিংবা উদ্ভট কল্পনার গেণ্ডুয়া খেলতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এই রীতি আশ্রয়ে লেখার কথ্যভঙ্গিটি প্রাঞ্জল হয়ে আসে। এই নিপুণ কথ্যভঙ্গিটির আয়ত্তীকরণেই আসরের জমজমাট প্রাণ-উচ্ছলতা বিধৃত হয়। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির প্রশস্ত ভূমি যদি হয় আসর বা বৈঠক, তাহলে সেই ভূমির প্রাণশক্তি হল সু-আয়ত্ত কথ্যভঙ্গিটি। আর এই কথ্যভঙ্গিটি সঞ্চারিত করতে গিয়ে পশ্চাৎক্ষেপণ রীতিকে অনেকেই অতি-অনুকূল রীতি বলে গ্রহণ করেছেন। দীনবন্ধু, ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, বর্তমান কালের প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ ভাবে উপলক্ষ একটি আসরে হাসি বিকীর্ণ করে গেছেন। সুদূর জার্মান দেশের Raspe-ও সেই রীতিকেই আশ্রয় করেছেন।

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্পকৌশল আয়ত্তের এই ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাস্‌পের এই সাদৃশ্য হাস্যরসের পংক্তি-ভোজে উৎকল্পনার হাস্যরসকে আন্তর্দেশিক একটি সাহিত্যধারা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু সর্বাধিক আনন্দ ও কৌতূহল জাগিয়েছে Raspe ও ত্রৈলোক্যনাথের দুটি গল্প। Munchaousen'র Chapter V-এর গল্পের ঘোড়ার দ্বিখণ্ডিত দেহের সঙ্গে

ডমরুধরের পঞ্চম গল্পের ডমরুর ও চঞ্চলার গাইগোরুর দ্বিখণ্ডনে কল্পনার সমান্তরাল ঐক্য একবার লক্ষণীয় হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের কুমীর শিকারের গল্পের সঙ্গে (যেখানে কুমীরের পেটের মধ্যে বসে সাঁওতালমাগী বেগুনের ঝুড়ির উপর বসে সেজেগুজে বেগুন বেচছে) অথবা ডমরুর চতুর্থ পরিচ্ছেদের গল্পের সঙ্গে (যেখানে ডমরুধর স্বয়ং পীর গোরাচাঁদের বাঘের পেটের এক কোণে গায়ে সোডা মেখে বসে হরিণ মহিষ জীর্ণ হতে দেখছে এবং নিজের বিরক্তির কথা ভাবছে) Munchaousen'র VIII Chapter-এর গল্পের (যেখানে Munchaousen মাছের পেটের মধ্যে নাচছে, খেলছে) আরেকবার উৎকাল্পনিক উদ্ভাবনী শক্তির ঐক্য লক্ষ্য করা যাবে।

CHAPTER VIII

I was once in great danger of being lost in a most singular manner in the Mediterranean ; I was bathing in that pleasant sea near Marseilles one summer's afternoon, when I discovered a very large fish, with his jaws quite extended, approaching me with the greatest velocity ; there was no time to be lost, nor could I possibly avoid him. I immediately reduced myself to as small a size as possible, by closing my feet and placing my hands also near my side, in which position I passed directly between his jaws, and into his stomach, where I remained some time in total darkness, and comfortably warm, as you may imagine ; at last it occurred to me, that by giving him pain he would be glad to get rid of me : as I had plenty of room, I played my franks, such as tumbling, hop, step and jump, but nothing seemed to disturb him so much as the quick motion of my feet in attempting to dance a horupape , soon after I began he put me out by sudden fits and starts ; I preserved ; at last he roared hurridly, and stood up almost perpendicularly in the water ; with his head and shoulders exposed, by which he was discovered by the people on board

an Italian trader, then sailing by, who harpooned him in a few minutes. As soon as he was brought on board I heared the crew consulting how they should cut him up, so as to preserve the greatest quantity of oil. As I understood Italian, I was in most dreadful apprehensions that their weapons employed in this business should destroy me also ; therefore I stood as near the centre as possible, for there was room enough for a dozen men in this creature's stomach, and I naturally imagined they would begin with the extremities , however, my fear were soon disposed for they began by opening the bottom of the belly. As soon as I perceived a glammering of light I called out lustily to be released from a situation in which I was now almost suffocated. It is impossible for me to do justice to the degree and kind of astonishment which sat upon every countenance at hearing a human voice issue from a fish, but more so at seeing a naked man walk upright out of his body ; in short, gentlemen, I told them the whole story, as I have done you whilst amazement struck them dumb.

After taking some refreshment, and jumping into the sea to cleanse myself, I swam to my clothes, which lay where I had left them on the shore. As near as I can calculate, I was near four hours and a half confined in the stomach of this animal.

দুই দূরদেশের হাস্যস্রষ্টার মধ্যে এই ঐক্য প্রশ্ন জাগায়—'ত্রৈলোক্যনাথ রাস্‌পে পড়েছেন কিনা।'

ত্রৈলোক্যনাথ রাস্‌পে পড়েছেন কিনা বলা কঠিন। প্রথমত, ত্রৈলোক্যনাথের কর্মমুখর জীবনে অধ্যয়নের যথেষ্ট অবসর ঘটেছে, সে কথা তাঁর জীবনীতে পাইনি। ইংরেজী তিনি ভালো জানতেন। ইংরেজী ভাষায় তাঁর প্রবন্ধ[1] সেদিন সুপরিচিত ছিল। কিন্তু তাঁর ইংরেজী সাহিত্য-আলোচনা বা সাহিত্য-অধ্যয়ন তথ্যসমর্থিত নয়।

1. (i) A Hand Book of Indian Product (1883)
   (ii) A List of Indian Economic Product (1883-84)
   (iii) Art M. S of India (1888)
   (iv) A Visit to Europe (1889)

দ্বিতীয়ত, রাস্‌পের অমূল্য গ্রন্থখানা বাংলাদেশে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে এসেছে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে (২৬-৭-২১—গ্রন্থের ওপরে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী ছাপ থেকে)। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ত্রৈলোক্যনাথ-এর মৃত্যু ঘটে (১৯১৯ খৃঃ)। ডমরুচরিত প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। অবশ্য ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীর তারিখ থেকে একথা বলা হয়তো সঠিক হবে না যে উক্ত তারিখের পূর্বে রাস্‌পের রচনা বাংলাদেশে পৌঁছয়নি। অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রাস্‌পের রচনা থাকতে পারে। 'সন্দেশ' পত্রিকার লেখক শ্রীসুবিনয় রায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে Munchaousen ছিল। তার প্রমাণ 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩২৯ সালের বৈশাখ, জৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যায় তিনি 'The Travels and Surprising Adventure of Baron Munchaousen' থেকে কিছু গল্পের অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি রাস্‌পের নামোল্লেখ না করে নিজের নামে এই অপূর্ব গল্পগুলি চালিয়েছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় রাস্‌পে কারও কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আবদ্ধ ছিলেন। উৎসাহী পাঠক-বর্গের মধ্যে রাস্‌পে সুপরিচিত থাকলে সুবিনয়বাবু রাস্‌পের নামোল্লেখ না করবার সাহস পেতেন না। যাহোক ১৯২১ খৃষ্টাব্দ থেকে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরীতে রাস্‌পের গ্রন্থখানার অন্তর্ভুক্তির অর্থ সেদিন থেকে রাস্‌পে সর্বসাধারণের পঠনের ছাড়পত্র পেয়েছেন। কিন্তু লক্ষণীয় ১৯২১-এর বহু আগে ১৮৯২-তে প্রথম ত্রৈলোক্যনাথ যে 'কঙ্কাবতী' রচনা করেন, তার মধ্যে চন্দ্রলোক নিয়ে যে কল্পনার উদ্ভট উদ্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রেও দুই স্রষ্টার মধ্যে ঐক্য রয়েছে। 'কঙ্কাবতী'র 'চাঁদের মূল শিকড়' উদ্ধৃতি-অংশের পাশে Munchaousen-র Chapter VI রেখে পড়লে এই সমান্তরাল কল্পনা উপভোগ করা যাবে।

Munchaousen একবার একযুদ্ধে বন্দী হয়ে বিজেতার দাসে পরিণত হন। সেখানে একদিন এক ভাল্লুক মারতে গিয়ে হাতের hatchet-টা ভাল্লুককে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু hatchet-টা ওপরে উঠতে উঠতে চাঁদে গিয়ে ঠেকল। ভাবনায় পড়লেন বন্দী দাস Munchaousen, পরক্ষণেই তাঁর সুখ্যাত উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করলেন। তিনি দ্রুত কিছু Turkey bean মাটিতে পুঁতে দিলেন। মুহূর্তে Turkey bean উদ্ভিন্ন হয়ে বাড়তে শুরু করল। বেড়ে বেড়ে চাঁদের একটা প্রান্তের সঙ্গে গিয়ে মিলল। Munchaousen তখন সেই লতা বেয়ে বেয়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছলেন। চাঁদে পৌঁছে দেখলেন সেখানকার

শুকনো খড় ও জঞ্জালের মধ্যে তার hatchet পড়ে রয়েছে। সেটা হাতে নিয়ে নামতে গিয়ে তিনি পড়লেন মহাভাবনায়। দেখলেন রোদের তাপে Turkey bean শুকিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি করে মহাদুশ্চিন্তার মধ্যে Munchaousen বিকীর্ণ খড় নিয়ে একটা দড়ি পাকিয়ে ফেললেন। চাঁদের আর এক প্রান্তের উঁচু একটা স্থানের সঙ্গে সে-দড়ি বেঁধে, তা ধরে মাটিতে নামলেন। ত্রৈলোক্যনাথের 'চাঁদের মূল শিকড়' গল্প তুলনায় আরও সরস ও হাস্যময়। কিন্তু দুজনার কল্পনাই যে উদ্ভট পথে চন্দ্রলোক পর্যন্ত গিয়েছে, ঐক্য সেখানেই। বস্তুত এক্ষেত্রে Jack and the Bean Tree-র রূপকথার গল্প দুজনকেই প্রভাবিত করেছে। এদেশ ওদেশ সকল দেশেই চাঁদ নিয়ে রূপকথার যে সৃষ্টি, রূপকথার সেই গল্পই শিল্পীর মনে বহিঃপ্রেরণারূপে কাজ করেছে।

উৎকল্পনার হাস্যরসধারা যে দেশে দেশে একটি সাহিত্যধারা রূপে পরিগণিত হয়েছে তারই উদাহরণ হিসেবে আমেরিকান লেখক Erick Knight-এর 'The Flying Yorkshire Man'-এর সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার সবিস্ময় ঐক্যের প্রসঙ্গ স্মরণ করা যেতে পারে।

ডমরুধরের সত্তার দ্বিধাবিভক্তির সঙ্গে (প্রথম গল্প চতুর্থ পরিচ্ছেদ, এবং তৃতীয় গল্প তৃতীয় পরিচ্ছেদ) Erick Knight-এর 'Samy Small's Better Half'-এর আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। অথচ ত্রৈলোক্যনাথ যে Erick Knight পড়েননি; তার প্রমাণ 'The Flying Yorkshire Man' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী রচনা। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টিশক্তি তার বহু আগে মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে নীরব সমাধিমগ্ন। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে যে কুমীরের পেটে বেগুনওয়ালীর অবস্থান কল্পনা, বাঘের পেটে ডমরুর অবস্থান কল্পনা তার সঙ্গে 'কার্লো কলোদী'র পিনোচ্চিও'র কল্পনার ঐক্য রয়েছে। 'পিনোচ্চিও'-তেও মাছের পেটে বসবাসের বিবরণ রয়েছে। অথচ ত্রৈলোক্যনাথ যে 'কার্লো কলোদী' পড়েননি, তা তথ্য সমর্থিত।

বস্তুত উৎকেন্দ্রিতার হাস্যরসের প্রতি দেশকাল নির্বিশেষে সকল মানুষেরই যে একটি স্বাভাবিক বাসনা রয়েছে, সেই ভাসমান বাসনাটিকে Raspe যেমন আশ্রয় করেছেন, ত্রৈলোক্যনাথও আশ্রয় করেছেন। Erick Knight যেমন আশ্রয় করেছেন H. G. Wells, Edward Lear, Lewis Carroll-ও আশ্রয় করেছেন। সেই সূত্রেই পরস্পরের মধ্যে ঘটনা-কাহিনীচরিত্র

উদ্ভাবনায় একটা বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সাদৃশ্যকে একের ওপর অন্যের প্রভাব বলে প্রমাণিত করবার সশ্রম চেষ্টা না করে কল্পনার মৌলিক উদ্ভাবনার আন্তর্দেশিক ঐক্য বলে স্বীকার করাই সাহিত্যবিজ্ঞানসম্মত।

Raspe, Carroll, Lear, Knight, Wells—এঁদের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনার ঐক্য এই সত্যটি প্রমাণ করে যে, বিশ্ব সাহিত্যের বিচিত্র সুন্দর মণিকোঠায় বাংলার উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের সংযোজনাটি সগৌরব প্রতিষ্ঠার দাবী রাখে। ত্রৈলোক্যনাথের লুপ্ত. 'ডমরুচরিত'-এর যদি অনুবাদ ঘটে, সকল দেশের হাস্যপ্রিয় সাহিত্যপাঠক বাংলা সাহিত্যের এক নূতন কাব্যধারা সৃষ্টির স্বাদ ও সন্ধান পাবেন। রঁলা একদা বাংলা সাহিত্যকে বিদেশের কাছ থেকে তার প্রাপ্য-স্বীকৃতি আদায়ের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন—"আপনারা যেমন আমার জ'া ক্রিস্তফ-কে বাংলায় অনুবাদ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন, তেমনি আমি চাই আপনাদের আধুনিক সাহিত্য—উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়ে তাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি আদায় করুক।"[১] উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুকুমার রায় প্রমুখ যেমন পাঠকের হাস্যরসবোধে জনাদর লাভ করেছেন, তেমনি অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিদেশী পাঠকমনের উৎকল্পনার কৌতূহলেও প্রতিষ্ঠার্জন করে—হাস্যরস সৃষ্টিতে বাংলা সাহিত্য যে দীন নয়,—এই প্রাপ্য স্বীকৃতি আদায় করতে পারেন।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ এই যে একটি আড্ডাখানা স্থাপন করে গিয়েছেন, তাকে যুগানুযায়ী সংস্কার করে, গ্রাম থেকে সহরে নিয়ে এসে, রবীন্দ্রনাথ উৎকল্পনার গল্প শুনিয়েছেন; রাজশেখর বসু, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টারা সেখানে বসে আড্ডা জমিয়েছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের এই গ্রামীণ আড্ডায় দ্রবীভূত তারার নেশা থেকে, গাঁজা তামাকের ধোঁয়া থেকে যে গল্প জমেছে, তার প্রসাধনকলায় এই গ্রামীণতারই ছাপ। গ্রাম্য আড্ডাখানার ঋজু আনন্দের মত ত্রৈলোক্যনাথের কাহিনীও চলেছে পারিপাট্যহীন সহজ ঋজুগতিতে। মহাদেববাবু, ডমরুধর, ছকু, ঘনশ্যাম গ্রামের দশজন ইয়ার নিয়ে যে ভাষায় গল্প করে, স্ফূর্তি করে, ত্রৈলোক্যনাথ

১। 'কল্লোল' পত্রিকার লেখক ও পাঠকদের সম্ভাষণের উত্তরে রোঁলা-র চিঠি—ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫।

তেমনটিই তার গল্পগ্রন্থে ধরে রেখেছেন। কেবল বাইরের দশজনার কাছে পরিবেশনের জন্য ব্যাকরণ একটু শুদ্ধ করেছেন, দু-একস্থানে একটু অদলবদল করেছেন। ফলে একটা আস্ত গ্রাম্য আড্ডাখানা তার ভাষা, হাস্য, ফূর্তি, তার গালাগালি, তার ইয়ার্কি, মস্করা নিয়ে এককথায় স্বরূপ ও সজীবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ডমরুধর, নেই-আঁকড়ে দাদা, কিংবা নয়নচাঁদ এরা শঠ, বুদ্ধিমান, বন্ধুবৎসল, ফূর্তিবাজ। কোথাও তাদের আত্মগোপনাত্মকতার কিংবা আত্ম-প্রকাশোন্মুখতার চেষ্টা নেই। ডমরুর তৎপর উত্তরদানে, 'নেই-আঁকড়ে দাদা'র যমজব্দ করবার কৌশলে তাদের মধ্যে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রকাশ ঘটেছে, সে যেন চরিত্রের বিশেষ একদিক হয়েই এসেছে। চরিত্র ছাড়িয়ে তাদের বুদ্ধি গল্পে বক্তব্যের অতিরিক্ত একটা বুদ্ধিবিলাসের জৌলুস ছড়িয়ে গ্রামীণ আড্ডাখানাকে সর্বগ্রাসী নগরাক্রমণে আক্রান্ত করতে পারেনি।

ত্রৈলোক্যনাথের চণ্ডীমণ্ডপ ও গ্রামের আটচালার আড্ডাখানার পাশে রাজ-শেখর বসুর বৈঠকখানা বা ঢাকুরিয়া লেক বা চায়ের দোকানের নাগরিক আড্ডা-খানা দাঁড় করিয়ে দেখলেই ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডাখানার এই গ্রামীণ স্বাদ ও স্বরূপ স্পষ্ট হবে। বাংলার গ্রাম এবং বাংলার নগর মিলিয়ে যেমন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ছবি, তেমনি ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখরকে মিলিয়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকল্পনার হাস্যরসের আড্ডাখানার পূর্ণাঙ্গ চিত্রদর্শন। আধুনিক মনের নগর দৃষ্টি-উন্মুখতা আজ যেমন কৃষিবিদ্যার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোন্মুখ হয়ে উঠেছে, তেমনি বর্তমানের বাঙালী পাঠকের নাগরীমন ত্রৈলোক্যনাথের গ্রামীণ আড্ডাখানার মানুষগুলোর শক্ত চোয়াল ও অনড় দাঁতের উচ্চহাস্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডমরুচরিতকে প্রকাশ-মূল্য দিয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার এই গ্রামীণ আড্ডাখানার চিত্র দেখাবার চেষ্টা করা গেল। তার আরেক প্রান্ত যে রাজশেখরে প্রোথিত আছে যথাসময়ে তার স্বরূপ দেখাবার চেষ্টা করা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১৮৬১-১৯৪১)

জন্মতারিখ অনুসারে ত্রৈলোক্যনাথের পর রবীন্দ্রনাথের নাম করতে হয়। কল্পনার অতিরঞ্জনের খেলা থেকে যে হাসির সৃষ্টি, সে-খেলায় রবীন্দ্রনাথও অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর এই উৎকল্পনাপ্রিয়তাই 'কঙ্কাবতী'র দ্বিতীয়ভাগের উদ্ভট কল্পনাকে প্রশংসা করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের মত তিনিও বেপরোয়া কল্পনার কলম ধরেছেন পরিণত বয়সে। 'খাপছাড়া', 'সে'-র রচনাকাল কবির ৭৫।৭৬ বৎসরের বয়ঃকাল। অবশ্য প্রথমদিকে 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে ও 'হিং টিং ছট', 'জুতা আবিষ্কার' কবিতায় কল্পনার উদ্ভটতা লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু তা রূপকের বাইরে রূপ হয়ে আসতে পারেনি। রূপ হয়ে এলো ১৯৩৬-৩৭-এ পূর্বোক্ত পদ্য ও গদ্য গ্রন্থে।

ত্রৈলোক্যনাথ কি রাজশেখর বসু, সাহিত্য আসরে তাঁরা বিলম্বাগত। কিন্তু যখন তাঁরা উপস্থিত হলেন, অসম্ভব কল্পনার মৌলিকতার খেলায় মেতে উঠলেন। ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষেত্রে এই খেলাই তাঁর প্রধান পরিচয়। রাজশেখরের ক্ষেত্রে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি অন্যতম প্রধান সৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য সাধনার দীর্ঘকালসীমায় এই জাতীয় রচনায় কলম ধরলেন জীবনের শেষ দশকে।

রবীন্দ্রনাথের হাস্যসৃষ্টির মৌলচরিত্র অনুসরণ করে তাকে ১২৯৯ সাল পর্যন্ত একটা যুগ এবং পরবর্তী আমৃত্যু একটা যুগ—এই দুই যুগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে। এই বিভাগের মধ্যে উৎকল্পনার হাস্য দ্বিতীয় যুগে বিকশিত হয়েছে। প্রথম যুগে উৎকল্পনার প্রসন্ন হাস্যের অনুপস্থিতির কারণ স্পষ্ট। এ-যুগের হাস্যসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ব্যঙ্গ ও আঘাত প্রবণতার পথে এগিয়েছেন; এর বাইরে স্বরুচিবিরুদ্ধ ব্যক্তিগত আক্রমণেরও পথ তিনি আশ্রয় করেছেন। এর পেছনে ছিল সমকালীন সমাজপট। হিন্দুয়ানির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার প্রীতি-প্রাবল্য, অন্ধগোঁড়ামি, বিজ্ঞান-বুদ্ধির অভাব এবং পাণ্ডিত্য প্রকাশের ভান

রবীন্দ্রনাথকে অসহিষ্ণু করেছে। বিশেষ করে শশধর তর্কচূড়ামণি ও তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ-র নব্যহিন্দু ধর্মবিজ্ঞানের আন্দোলন কবিকে ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে তাল ঠুকে নামতে বাধ্য করেছে। "এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে।····· সেই সময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম আপনার কৌলীন্য প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ······আমি তখন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম। আমার তখনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে তাহার পরিচয় আছে। তাহার কতক বা ব্যঙ্গ কাব্যে, কতক বা কৌতুকনাট্যে, কতক বা তখনকার 'সঞ্জীবনী' কাগজে পত্র-আকারে বাহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া তখন মল্লভূমিতে আসিতে তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছিল।"[১]

এই আন্দোলনকে তিনি নানাভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র গদ্যপত্রে, 'মানসী', 'সোনার তরী'র কবিতায়, 'হাস্য-কৌতুকে' ও 'ব্যঙ্গ-কৌতুকে', 'বালক', 'ভারতী', 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা তীব্র ব্যঙ্গের যুগই রচনা করেছেন।

এই তৎপরতার মধ্যে আঘাতদাহমুক্ত উৎকল্পনার প্রসন্ন হাসির সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। উৎকল্পনা এ-যুগে যেখানে এসেছে, স্বভাবতই তা এসেছে আঘাত বিদ্রূপের রূপে। যেমন 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'হিং টিং ছট' (১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯১) কবিতাটি। ১২৯৮-এ রচিত 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রবন্ধের গদ্যরূপে যে আঘাত কবি করেছেন, ১২৯৯-এ 'হিং টিং ছট'এ তারই কবিতারূপ দিয়েছেন মাত্র। এ-কবিতায় রাজা হবুচন্দ্রের স্বপ্নদর্শন একটা উদ্ভট হাস্যকর উদ্ভাবনা। কিন্তু তার অন্তরালে জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি-র পরমত অসহিষ্ণুতা ও বিজ্ঞান-বুদ্ধির অভাবের ওপর স্পষ্ট বিদ্রূপ রয়েছে। গৌড়ীয় সাধুর হিং টিং ছট-এর যে ব্যাখ্যা—

'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনস্মৃতি।

আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি।
আর্ণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ীশক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট,
সংক্ষেপে বলিতে গেলে—হিং টিং ছট।"—

এই ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তৎকালীন পণ্ডিতদের অর্থহীন বাক্‌সর্বস্বতার ভণ্ডামীকে কবি প্রকট ব্যঙ্গ করেছেন।

অবশ্য এই ব্যঙ্গভূমি কবির স্বভাব ভূমি ছিল না। একদিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অপরদিকে তাঁর চরিত্রের কোমলপ্রাণতা ও স্নিগ্ধ পরিহাস-প্রিয়তা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চাবুক চালনার পক্ষে ছিল পরধর্ম। এক্ষেত্রে যে তাঁকে বাধ্য হয়ে নামতে হয়েছে, সে-কথা তিনিই স্বীকার করেছেন। এইজন্যই ১২৯৯ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যঙ্গ-হাসির প্রাবল্যের মধ্যেও কবি মাঝে মাঝে কৌতুকের দিকে ঝুঁকেছিলেন। মানসীর 'শ্রাবণের পত্র', 'ছিন্নপত্রের' পত্রালাপ 'হাস্যকৌতুক'-এ ব্যঙ্গশ্লেষের কশাঘাতের মধ্যেও কয়েকটি নাটিকায় বিশুদ্ধ আমোদ রয়েছে। ১২৯২-তে 'বালক' পত্রিকায় তিনি যে বলেছেন, "সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভাল করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না—"[২] এই আমোদ প্রবণতা ১২৯১-তে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিল 'গোড়ায় গলদ'-এ। 'গোড়ায় গলদ' হৃদয়হীন আঘাত ও শ্লেষ বিদ্রূপ থেকে মুক্ত কৌতুক-হাস্যের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রহসন রূপে। 'গোড়ায় গলদ'-এর পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ কৌতুক-হাস্যের ধারায় অবগাহন করলেন। এরই এক আশু ফলশ্রুতি 'খামখেয়ালী সভা'র প্রতিষ্ঠা। ১৩০৩-৪এ ঠাকুর-বাড়ীতে মূলত রবীন্দ্রনাথ-এর উৎসাহেই 'খামখেয়ালী সভা'র প্রতিষ্ঠা হল। তিনিই ছিলেন এই সভার প্রধান পুরুষ। এখানে বহু সিরিয়াস আলোচনা, কবিতা, গল্প, গানের সঙ্গে ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক হাসির নাটক 'বিনিপয়সার ভোজ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' তিনি রচনা করেন। 'গোড়ায়-গলদ'-এর মার্জিত সংস্করণ 'শেষরক্ষা'য় (১৩৩৫), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৩০৩), ও 'চিরকুমার সভা' (১৩৩২)-য়, 'গল্পগুচ্ছ'এর গল্পে, 'প্রহাসিনী' (১৩৪৫), 'গল্পস্বল্প' (১৩৪৭)-এ,

২. বালক, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২, পৃঃ ৮৯।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত ১৩৪৮-এর 'ছড়া'য় কৌতুকহাসিই মুখ্যফলশ্রুতি রচনা করেছে। হাস্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সাধনার প্রথমার্ধ যদি হয় ব্যঙ্গবিদ্রূপের যুগ, দ্বিতীয়ার্ধ, মুখ্যত কৌতুক-হাস্যের যুগ। বলাবাহুল্য এই দ্বিতীয় যুগেই রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের ত্রৈলোক্য উৎস-ধারায় কলম ধরেছেন। কিন্তু এ-যুগে যে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি, তার মধ্যেও দুটি ধারা লক্ষণীয়। একশ্রেণীর উৎকল্পনার রচনা আছে যেখানে নির্ভেজাল প্রসন্ন হাসিই ফলশ্রুতি রচনা করেছে। আরেক শ্রেণীর রচনায় কল্পনার অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু বিশুদ্ধতা নেই। কল্পনার খেয়ালরসের আবরণে কৌতুকের খোঁচা ও কটাক্ষ তখনও মুছে যায়নি। যেমন 'ইচ্ছাপূরণ' গল্প, 'জুতা আবিষ্কার' কবিতা।

'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে (১৩০২) মানবমনের একটা দুর্বল দিক নিয়ে কৌতুকের প্রকাশ। এ গল্পে বক্তব্যের ভার রয়েছে। প্রতি শিশুর মধ্যে যে পিতা হয়ে যথেচ্ছাচারের ও যথেচ্ছবিহারের ইচ্ছা রয়েছে এবং প্রতি পিতার মধ্যে যে 'শৈশবের সদ্ব্যবহার হল না, আহা শৈশব যদি ফিরিয়ে পাই তবে এক মুহূর্তেও নষ্ট না করে তাকে কাজে লাগাই'—এই দীর্ঘনিশ্বাস রয়েছে, সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ গল্পে রূপ দিয়েছেন! পিতাপুত্রের বয়স বদলের ইচ্ছাপ্রকাশ, ইচ্ছা-পূরণ ঠাকরুণের সে-পথে গমন ও বরদান এবং পিতার পুত্রের বয়সে রূপান্তর ও পুত্রের পিতার বয়সে উত্তরণ—ইত্যাদি ঘটনা-উদ্ভাবনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উৎকল্পনা শক্তির মৌলিকতা রয়েছে। রূপকথার আমেজের সঙ্গে অসম্ভব কথার হাসি জড়িয়ে একটা বিশেষ আনন্দও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন কল্পনাকে যথেচ্ছবিহারী করলেন, অপরদিকে পিতাপুত্রের ক্ষেত্রে এই ইচ্ছার প্রতিক্রিয়াটাকে কৌতুকের সূক্ষ্ম পীড়নে অশ্রুসিক্ত করে, তাসের আড্ডায়, পুকুরঘাটে, পিতাপুত্রকে পদে পদে অপদস্থ করে এবং তাদের জীবনে ইচ্ছা-ঠাকরুণের বরকে অভিশাপ করে তুলে এই নীতিশিক্ষাটা দিলেন যে বয়সের ধর্ম দুর্লঙ্ঘ্য। প্রসঙ্গত রাজশেখর বসুর 'ধুস্তুরীমায়া' গল্প উল্লেখ করা যায়। সেখানে দুই বুড়োর রূপকথার মধ্যে অনুরূপ গল্পাকাশ রচিত হয়েছে। ইচ্ছাপূরণ দেবীর স্থানে এ-গল্পে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী এসে দুই বুড়োর যৌবনলাভের অত্যদ্ভুত পথ দেখালেন। সেখানেও মানবচরিত্রের অনুরূপ একটা সত্যের ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু এই সত্যটাকে উপসংহার করে সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন সক্রিয় চেষ্টা নেই। বৃদ্ধদ্বয়ের যৌবন ফিরিয়ে পাবার হাস্যময় উদ্ভটতা এবং যৌবন

হারাবার আরও হাস্যময় ঘটনা পরিবেশনে লেখক ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অধিকন্তু তিনি তৎপর হয়েছেন কিভাবে উদ্ধববাবু ঘরে ফিরে তার দুর্দান্তস্বভাবা স্ত্রীকে ফোকলাকুমীরের কল্পিতকাহিনী শোনাবেন—তারই উদ্ভাবনা বিষয়ে। মানবচরিত্রের এই দুর্বলতার চরম সত্যটি কল্পনার এই হাস্যমুখর বিকাশের মধ্যে কখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পে কাহিনী এগিয়েছে এই দুর্বলতা কতখানি হাস্যকর—এই তাত্ত্বিক উপসংহারে পৌছতে। রবীন্দ্রনাথের গল্পকথনে যেখানে বয়সের সীমা লঙ্ঘনকারীদের অপরিশেষ লাঞ্ছনা, শারীরিক পীড়ন ও মুক্তিচেষ্টার কান্না রয়েছে, রাজশেখর-এর গল্পে রয়েছে বয়সের সীমালঙ্ঘনকারীদের নিয়ে একই সঙ্গে উচ্চহাসি। 'ধুস্তরীমায়া'র দুই বৃদ্ধ তাদের গল্পটা অন্যকে শোনাতে গিয়ে নিজেরাও হো হো করে হেসে উঠবেন। ইচ্ছাপূরণ গল্পের পিতাপুত্র যদি গল্পটা স্মরণ করতে পারতেন (কারণ দেবীর বরে তাঁরা পূর্বকাহিনী বিস্মৃত হয়েছেন) তাহলে স্ব-স্ব অপদস্থতা মনে করে অনুরূপ সরব নির্মোহ হাসি হাসতে পারবেন না। আর সেখানেই 'ধুস্তরীমায়া' যখন উৎকল্পনার ফলশ্রুতি রচনা করেছে, 'ইচ্ছাপূরণ' রচনা করেছে কৌতুক হাস্যের ফলশ্রুতি। 'ধুস্তরীমায়া'য় অসম্ভবতা রূপময় দেহ লাভ করেছে। 'ইচ্ছাপূরণে'র উৎকল্পনা রূপক বা প্রতীক হয়ে উঠেছে।

'কল্পনা' কাব্যের অন্তর্গত 'জুতা অবিষ্কার' (১৩০৪) কবিতাটিতে উৎকাল্পনিক একটি কাঠামোর মধ্যে রাজকর্মচারীদের নিবুর্দ্ধিতা ও অন্তসার শূন্যতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কৌতুক করেছেন। তবে 'হিং টিং ছট'-এর প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গের তীব্রতা এখানে নেই।

কিন্তু জীবনের শেষ দশকের হাস্যসৃষ্টিতে যেখানে কল্পনার অতিরঞ্জনের খেলা রয়েছে, সেখানে তা অন্তরঙ্গে বহিরঙ্গে প্রসন্ন হাস্য নিয়ে এসেছে। এই সময়কার রবীন্দ্রনাথের হাস্যাত্মক রচনার বৈশিষ্ট্য হল তিনি হাল্কা লিখনে উৎসাহী ও একাগ্র হয়েছেন। কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধিকে খেলিয়ে, কৈশোরসুলভ চাপল্য সঞ্চারিত করে, ৭৬ বছরের প্রবীণ কবি একটু 'খ্যাপামি' করবার আনন্দে মশগুল হয়েছেন। পূর্ববর্তী যুগে 'ইচ্ছাপূরণ' ও 'জুতা আবিষ্কারে'র মত গল্প কবিতায়ও তিনি কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির সংমিশ্রণে হাস্য উদ্ভিন্ন করেছেন। কিন্তু সেখানে বুদ্ধি শ্রেণীমানুষ সম্বন্ধে, যুগের সমস্যা, চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন। কিন্তু প্রবীণ বয়সে বুদ্ধি নিয়ে 'জ্যাঠামো' তিনি করেননি। বিয়ের আসরে বরের রায়বেশে নাচ,

রেল এঞ্জিনে জলের বদলে মদ ঢেলে দিয়ে রঙ্গ দেখা—এ-সবকিছুর মধ্যে রয়েছে কৈশোরের দুষ্টামি। কিন্তু তাকে রক্ষা করেছে মহান স্রষ্টার কল্পনা ও শৈল্পিক চাতুর্য। ফলতঃ চিরতর নবীনতার স্মরণীয়তার প্রকোষ্ঠে তা স্থান করে নিয়েছে।

শেষ দশকে 'খাপছাড়া' ও 'সে' গ্রন্থের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে কবি যে অবতীর্ণ .হলেন, এর একটা পশ্চাৎ আয়োজন রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সচল প্রতিভা। 'বলাকা'র অন্যকোথা অন্য কোনখানের অন্বেষণ কবির কাব্যের বহিরঙ্গ-অন্তরঙ্গব্যাপি চলেছে। কবি নিজে তাকে বাসাবদলের পালা বলে অভিহিত করেছেন। বাসাবদলের এই যে পালা তার প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি হলে লক্ষ্য করা যাবে, বাসান্তরে যাবার পূর্বে কবির মননে ও হৃদয়ে একটা কর্মসূচীর সাড়া পড়ে যেত। কবি যেসময়ে 'খাপছাড়া' ও 'সে' লিখেছেন তার কাছাকাছি সময় থেকেই তিনি ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট হন। সাদা কাগজের ওপর আঁচড় টানার, অথবা লেখাকে কাটাকুটি করার খেয়ালী মন থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবির সৃষ্টি। কোন বিষয়কে পূর্ব থেকে ভেবে না এঁকে, মনের খেয়াল-খেলার প্রেরণায় কোন অজ্ঞাতকুলশীল চেহারাকে চলিত কলমের মুখে খাড়া করার নেশা ১৯২৩ থেকে আমৃত্যু কবিকে পেয়ে বসেছিল। ছবি আঁকার আঙ্গিকের বাঁধাধরা নিয়ম, যে সনাতনী প্রথা, কবির খেয়ালী তুলি তাকে ভেঙেছে। কিন্তু খেয়াল বলে তা এলোমেলো নয়। তার পেছনে রেখার বিজ্ঞান-নিষ্ঠা কাজ করেছে। নয়তো এলোমেলো রেখা যে-সে টানতে পারে। খেয়ালী আঁচড়ে রূপাতীতের অভিব্যক্তি ঘটেছে। জীবনের গতিস্থিতির অভিব্যক্তি ঘটেছে। আঁদ্রে জিদ, পল ভ্যালেরী এই খেয়ালের মধ্যে ইউরোপীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের সন্ধান-আর্তিকে লক্ষ্য করেছেন। রেখা নিয়ে এই যুগে কবির এই যে খেলা, তাই তাঁকে 'খাপছাড়া', 'সে'-র খেয়ালী লেখায় নামিয়েছে। 'সে' গ্রন্থের শুরুতে গল্প বলতে বসে একজায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"একদিন ঝমাঝম বৃষ্টি। বসে বসে ছবি আঁকছি।... ..দরজায় পড়ল ঠেলা। খুলে দেখি ডাকাত নয়, দৈত্য নয়, কোটালের পুত্তুর নয় সেই লোকটা।"

কবি তখন রেখার খেলা বন্ধ করে উদ্ভট চরিত্রের সেই লোকটার গান শুনতে বসলেন। এর থেকে এই সত্যটিই পরিষ্কার যে রেখার খেয়াল খেলাই রবীন্দ্রনাথকে মাঝে মাঝে লেখার খেয়াল খেলায় নামিয়েছে। দ্বিতীয়ত, চিত্রের আঙ্গিকে সনাতনী রীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ রয়েছে, সে-বিদ্রোহই

কবিকে বহু-অনুশীলিত উপন্যাস, কাব্য, নাটক, প্রবন্ধের পথ থেকে খাপছাড়া ও আবোল তাবোলের রাজ্যে উত্তীর্ণ করেছে। এই খেয়ালের সঙ্গে কবিমনের প্রবল কৌতুক—হাস্যপ্রবণতা, স্বভাবের উদারতা ও কোমলতা এবং সর্বোপরি তাঁর বিস্ময়কর কল্পনাশক্তি যুক্ত হয়ে উৎকেন্দ্রিকতার প্রসন্ন হাস্যের রূপ নিল 'সে' এবং 'খাপছাড়া'তে। এই দুয়ের পশ্চাৎভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে এই সময়ের বিজ্ঞাননিষ্ঠা। 'সে' ও 'খাপছাড়া'র কাছাকাছি সময় থেকে কবি বিজ্ঞান-চর্চা করেছেন—বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ পঠন ও অনুধ্যান চলেছে। রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন আইনস্টাইন, মিলেকান থেকে জীনস্, এডিংটন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের রচনা। ফ্রয়েড, এডলার ইয়ং-এর রচনা পড়েছেন। ১৯৩৭-এ তিনি পরমাণুভিত্তিক 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই একই বছরে প্রকাশিত হ'ল 'সে'। তার মাত্র কয়েকমাস আগে 'খাপছাড়া'। এই বিজ্ঞাননিষ্ঠা তাঁর উৎকল্পনার হাস্যদেহকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে দেখা যাবে। পূর্বেই দেখান হয়েছে উৎকল্পনার সৃষ্টির পেছনে বিজ্ঞানী মন কি ভূমিকা পালন করে। mathematical precisionই হল বিজ্ঞানরীতি। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির পেছনে এই বিজ্ঞানরীতি দাঁড়িয়ে অসম্ভব কথা ও কল্পনার চালটাকে শাসিত করে। সে-জন্যই 'যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।' ওদেশের Lear, Raspe, H. G. Wells, Carroll, এদেশের ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়, রাজশেখর বসু সকলেই যে বিজ্ঞানীমনের অধিকারী ছিলেন, তা হল উদ্ঘাটিত সত্য। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও সেই সত্যটাই তাঁর উৎকল্পনার হাস্যকে একটা 'harmonious madness' দান করে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রলাপেতে সফলতা' দান করে তাকে শিল্পসীমায় উত্তীর্ণ করেছে। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা ও চিত্রচর্চা এবং একই সময়ে 'সে', 'খাপছাড়া'র রচনা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানসসূত্রে দুই গ্রথিত। আর সেজন্যই রবীন্দ্র-উৎকল্পনার আলোচনায় এই পটভূমির সংবাদ অত্যাবশ্যক।

১৩৪৫-এ প্রকাশিত 'প্রহাসিনী' কাব্যের মুখবন্ধ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> "আমার জীবনকক্ষে জানি না কী হেতু
> মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু—
> তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি

ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।

প্রহাসিনীর দু'বছর পূর্বে এই খ্যাপা ধূমকেতু কবীর গাম্ভীর্যের ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে দিয়ে একগুচ্ছ প্রলাপ বকিয়ে নিয়েছে। 'খাপছাড়া' (১৩৪৩ মাঘ, প্রথম মুদ্রণ) তারই ফসল। সেখানে বৃদ্ধের খোলস খসে পড়েছে। তাঁর মন 'খ্যাপামীর প্রান্তিক ছুঁয়ে' সকল প্রলাপে রূপ পেয়েছে। এই গ্রন্থ কবি উৎসর্গ করলেন এমন একজন মানুষকে যিনি অনাসৃষ্টির কল্পনার হাস্যরচনায় অদ্বিতীয়—তিনি রাজশেখর বসু, ছদ্মনামে পরশুরাম।

পূর্বেই বলা হয়েছে 'খাপছাড়া'র খ্যাপামি মিশ্র জাতের। কিছু কবিতা আছে যেখানে খ্যাপামি একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, অথবা মানুষের স্বভাব, খেয়াল, কোন একটা বিশেষ চরিত্র নিয়ে একটু ঠাট্টা রসিকতা করে উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টি করেছে। যেমন ১১ নং কবিতার ভজা-নবাইর সাধারণ কিছুতে মজা পাবার স্বভাব, ৩ নং কবিতার মতিলাল নন্দীর মত ফন্দিবাজ পড়ুয়ার চরিত্র কিংবা ২৮ নং কবিতার জিতেনের কথার মধ্যে আশ্চর্য বলার মুদ্রাদোষ,—এ সবই আমাদের পরিচিত। এই পরিচিত স্বভাব চরিত্র নিয়ে কবির ক্ষণকালের ঠাট্টা এখানে হাসি জাগিয়েছে। নীচের কবিতাটিতে--

৮৯

জান তুমি রাত্তিরে
নাই মোর সাথী আর।
ছোটবউ, জেগে থেকো
হাতে রেখো হাতিয়ার।
যদি করে ডাকাতি
পারি নে যে তাকাতেই,
আছে এক ভাঙা বেত
আছে ছেঁড়া ছাতি আর।
ভাঙতে চায় না ঘুম,
তা না হলে দুমাদুম
লাগাতেম কিল ঘুষি
চালাতেম লাথি আর।

এরকম বীরপুরুষ আমরা অনেক দেখেছি, তার সাহস নিয়ে কবি একটু রসিকতা করেছেন। অসম্ভব কোন কল্পনার সংস্থান দ্বারা রসের সৃষ্টি এখানে হয়নি।

দ্বিতীয় এক জাতের কবিতা রয়েছে 'খাপছাড়া'র। হাসির অন্তরে বাঁকা মন্তব্য, শ্লেষ, কবির সচেতন বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বনে তাদের প্রকাশ। ১২ নং কবিতায় টেরিটি বাজারের গোরা বোষ্টমবাবাকে নিয়ে হাস্যচ্ছলে কবি ব্যঙ্গ করেছেন। ২০ নং কবিতাটিতে আধুনিক কবিতা নিয়ে হাসির তলে কবির বাঁকা মন্তব্য লক্ষণীয়।

২০

মন উড়ু উড়ু, চোখ ঢুলু ঢুলু
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলু থালু ভাষা, ভাব এলোমেলো
ছন্দটা নির্বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে 'এতো নয় সোজা।
বুঝি কি বুঝিনে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক।'

এ কবিতা মোটেই খাপছাড়া নয়। এ জাতীয় কবিতা থেকে প্রমাণিত হয় রবীন্দ্রনাথ সবসময় নিজের ব্যক্তিত্ব ও সচেতন বুদ্ধি বা চিন্তাকে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারেননি। যখন তা পারেননি, তখনই 'খাপছাড়া' কথাটা রূপক হয়ে এসেছে, আর তার অন্তরে প্রকাশিত হয়েছে পূর্বকথিত একটা অর্থ বা শ্লেষ বা বুদ্ধির সচেতনতা।

তৃতীয় একশ্রেণীর কবিতা রয়েছে 'খাপছাড়া'য়। শব্দ ও অর্থ নিয়ে অপ্রত্যাশিত খেলা এবং অন্ত্যমিলের আকস্মিকতা সৃষ্টি করে কবি এইজাতের কবিতায় হাসিয়েছেন। যেমন—

হাস্যদমনকারী গুরু—
নাম যে বশীশ্বর,
কোথা থেকে জুটল তাহার
ছাত্র হসীশ্বর।

হাসিটা তার অপর্যাপ্ত
তরঙ্গে তার বাতাস ব্যাপ্ত
পরীক্ষাতে মাকা যে তাই
কাটেন মসীশ্বর।
ডাকি সরস্বতী মাকে—
'ত্রাণ করো এই ছেলেটাকে
মাষ্টারিতে ভর্তি করো
হাস্য রসীশ্বর।'

৭৩ নং কবিতায় বরিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, নরিষ্ঠ, দ্রড়িষ্ঠ জাতীয় মিল নিয়ে কবি খেলা করে হাসিয়েছেন। সংযোজনের ৪নং কবিতাটিতে পাঠক যখন মিলের আর প্রত্যাশা করতে পারছেন না, তখনও কবি মিল দিচ্ছেন। এ যেন পাঠকের সঙ্গে কবির মিল দিতে পারার একশ্রেণীর খেলা। তাতে করে হাসি হয়েছে স্বতস্ফূর্ত।

এরই পাশে উৎকল্পনার বিশুদ্ধ হাসির কবিতাগুচ্ছ রয়েছে। কবি-কল্পনার খ্যাপামি অসম্ভব যত চিত্র চরিত্র উদ্ভাবন করে, অসম্ভবের কাহিনী ও ঘটনার সংস্থানের দ্বারা হাস্যসৃষ্টি করেছে। ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়ের উৎকল্পনার হাস্য-ধারা-পথে কবি এখানে অগ্রসর হয়েছেন। ১, ৫, ১৯, ২৩, ২৪, ৪৬, ৪৭, ৬১, ৬৭ সংযোজনের ১০, ১১, ১৫ নং কবিতা এই জাতের কবিতা।

৫নং কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ দাড়ির এক দেবতা উদ্ভাবন করলেন। কিন্তু দাড়ীশ্বরকে মানত করে হাবল কেন যে গোঁপ-গাঁ গেল তা জানে কবির খেয়ালী কল্পনা। শেয়ালকাঁটা পাখির খাবলে হাবলের দাড়ি যখন ভদ্রসীমার মাত্রা ছাড়াল তখন সে-দাড়ি কাটবার জন্ত ক্ষুর-খাঁড়া-বটি-কোদাল-সাবল-করাত নিয়ে কবি হুলুস্থুলু বাধিয়ে এক উচ্ছ্বসিত হাস্যসৃষ্টি করলেন।

দাড়ীশ্বরকে মানত করে
গোঁপ-গাঁ গেল হাবল—
স্বপ্নে শেয়ালকাঁটা-পাখি
গালে মারল খাবল।
দেখতে দেখতে ছাড়ায় দাড়ি
ভদ্রসীমার মাত্রা—

নাপিত খুঁজতে করল হাবল
রাওলপিণ্ডি যাত্রা ;
উরদু ভাষায় হাজাম এসে
কল আবল-তাবল।
তিরিশটা ক্ষুর একে একে
ভাঙল যখন পটাৎ
কামারটুলি থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ
যা হাতে পায় খাঁড়া বঁটি
কোদাল করাত সাবল ;

ছড়ার সঙ্গে উৎকল্পনার এই জাতীয় সৃষ্টির পার্থক্য রয়েছে ; ছড়া মৌখিক সাহিত্য-ধারা-জাত। ছন্দের মায়াঘোর সৃষ্টি ছড়ার উদ্দেশ্য ; এর বাঁধনটাই এলোমেলো। কবির কোন সচেতনা ছড়ার চিত্র বা ভাবকে পারম্পর্যে বেঁধে দেয় না। অসংলগ্ন কথা বলতে পারা সত্ত্বেও ছড়া যেখানে সার্থক হয় না, দেখা যাবে ছন্দের মায়াঘোর সৃষ্টিতে কবি সেখানে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছেন। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে সচেতন কবিমন উদ্ভট খেয়ালকে বিন্যস্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় অসম্ভবের রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে এলোমেলো কথাকে একটা বাঁধনে বেঁধে দিতে হয়। উদ্ধৃত কবিতাটিতে কবির অসম্ভব কল্পনা হাবলের দাড়ির মতই সম্ভাব্যতার ও সর্বরকম যুক্তি বুদ্ধির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু কবি তাকে যে ভাবে পারম্পর্যে সাজিয়ে হাসি সৃষ্টি করেছেন সেটা দেখা যাক।

দাড়ি এবং গোঁপ নিয়ে কবি যখন উদ্ভট কিছু করতে চাইলেন তখন অতি সহজেই তাঁর খেয়ালী মন শেয়ালকাঁটা-পাখি নামে একটা জীবের চিত্র উদ্ভাবন করতে পারল। কারণ একমুখ লম্বা শক্ত দাড়ি গোঁপের ছবি মনে রাখলে শেয়ালকাঁটার মত পালকবিশিষ্ট একটা পাখির চিত্র পারম্পর্য সূত্রেই কবি-মনের উৎকল্পনায় জেগে উঠবে। আর এই অদ্ভুত পাখিটির পক্ষে হাবলের গালে খাবল মেরে একমুখ অভদ্র দাড়ি গজিয়ে দেওয়া কিছুই নয়। এ-হেন দাড়ি কাটবার জন্য পৃথিবীর যে-কোন দেশেই হাবল যেতে পারত। কিন্তু রাওলপিণ্ডিটা এনেছেন একদিকে ছন্দ রক্ষা করতে, অন্যদিকে রাওলপিণ্ডি কথাটার নিজস্ব যে ওজন আছে তা হাবলের এ-হেন দাড়ির গৌরবকে রক্ষা

করেছে। রাওলপিণ্ডি যখন কবিকল্পনায় এল, হাজমের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। আর হাজম এলে একান্ত স্বাভাবিক ভাবে আসবে উর্দুভাষা। এই প্রাগৈতিহাসিক দাড়ি কাটতে তিরিশটা ক্ষুর যে ভাঙবে তা সকলেই স্বীকার করবেন। 'পটাং' শব্দটি খুব সচেতন প্রয়োগজাত। শেয়ালকাঁটা-পাখির খাবড়ায় যে দাঁড়ি গজিয়েছে, তাকে নির্মূল করা যে কতখানি শক্ত কাজ, সেই কথাটা বোঝাতে 'পটাং' শব্দটা এল। অর্থাৎ এই অদ্ভুত দাড়ির কাছে রাওলপিণ্ডির তিরিশখানা ক্ষুর 'পটাং'। রাওলপিণ্ডি যখন হাবলের দাড়ি কাটতে 'ফেল' করল, তখন কবি ভাবতে লাগলেন কোথায় পাওয়া যাবে নামকরা দাড়িকাটার অস্ত্র। কুমারটুলীর প্রতিমার খ্যাতি কবির মনে পড়ল। খেয়াল-রসে যে কবি মগ্ন হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এই মনে পড়াটাই যথেষ্ট। কুমারটুলীর অনুরূপতায় অনায়াসেই এসে পড়ল কামারটুলী। রাওলপিণ্ডি থেকে এক ঝটকায় কবি এলেন কামারটুলীতে। ওই যে যে ছত্রটি—

'কামারটুলী থেকে নাপিত
আনল তখন হঠাৎ—'

এই হঠাৎ' শব্দটির প্রয়োগ বড চমৎকার। 'পটাং'-এর সঙ্গে শুধু মিলের প্রয়োজনে শব্দটি আসেনি। কামারটুলী কথাটা মনে পড়ার বিদ্যুৎ গতিকে এবং সাবল-করাত নিয়ে দাড়িকাটার উদ্ভট অভিযানটা প্রকাশ করতেই 'হঠাৎ' শব্দ কবি প্রয়োগ করেছেন।

উৎকল্পনার রসরূপটা বাইরে থেকে যতই এলোমেলো অসংলগ্ন মনে হোক, ভেতরে সে এইভাবে কবিমনের সচেতনা নিয়ে গড়ে ওঠে। এইভাবে কবির উদ্ভাবিত চিত্রগুলি, কবির খেয়ালী সব কল্পনা, একটা পারম্পর্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে থাকে। তাতেই উৎকল্পনার রসরূপটি গড়ে ওঠে। ১নং কবিতাটিতে ক্ষান্তবুড়ীর দিদিশাশুড়ীদের আজগুবি আচরণের চিত্র সৃষ্টি করে কবি দেখালেন অসম্ভব কল্পনায় কতদূর এগিয়ে নিটোল অসূয়ামুক্ত এবং উচ্ছ্বসিত হাসি সৃষ্টি করা যায়। ২৪নং কবিতায় বিয়ের আসরে বরের রায়বেশে নৃত্য এবং ঠাট্টা করে শ্যালীর মাথায় গাট্টা মারার কাহিনী বাস্তব জগতে কোনকালে কোন যুগে কোন দেশে সম্ভব নয়। আরও অসম্ভব একটি গাট্টায় শ্যালীর মূর্ছা এবং তজ্জনিত মেয়ের শোকে শ্বশুরের ক্রন্দন। বিয়ের আসরে এর সম্ভাব্যতা কেবল কবিকল্পনায়। সে-জন্যই এই বর যে গাট্টা মেরেছে তার ব্যথা দেবার ক্ষমতাও অসম্ভব। আর

সেই কারণেই শ্বশুরের শোকটাও আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য, উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে তা নিমজ্জিত। ৬১নং কবিতায় শ্যালী বলে ভৎ‍র্সনা শুনে স্ত্রীর বোনের যে 'মনাগুণের' সৃষ্টি হয়েছে, এবং বেঁচে থাকার আনন্দ যে-ভাবে তাঁর মন থেকে ফুরিয়ে গেছে, উৎকল্পনার হাস্যরসের ক্ষেত্রে তার তুলনা হয় না।

স্ত্রীর বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
'শ্যালী' বলে ভৎ‍র্সনা
করেছিল বনমালী।
এতবড় গালি শুনে
জ্বলে মরে মনাগুণে
আফিম সে খাবে কি না
সাত মাস ভাবে খালি
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি।

৬৭নং কবিতায় ভূত হয়ে বড়ো কোলাব্যাঙের আবির্ভাব। এক পা টেবিলে রেখে আরেক পা বনমালী খুড়োর কাঁধে তুলে দিয়ে

'উত্তর দেয় না সে
বলে শুধু কোলাব্যাঙ—'

এমন হাস্যমুখর উদ্ভট ভৌতিক চিত্র খুব কম লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অথবা হাঁচতে গিয়ে কারো যে পা মচ্‌কে যেতে পারে, সে-দুর্ঘটনার কথা রবীন্দ্রনাথই নতুন শোনালেন—

দোতলায় ধুপ্‌-ধাপ হেমবাবু দেয় লাফ্‌,
মা বলেন, একি খেলা ভূতের নাচন নেচে?
নাকি সুরে বলে হেমা, 'চলতে যে পারি নে, মা।
সকালে সর্দি লেগে যেমনি উঠেছি হেঁচে
অমনি যে খচ্‌ করে পা আমার মচ্‌কেছে।

মনের কতখানি প্রসন্ন স্ফূর্তিময়তা থেকে এ-জাতের কবিতা জন্ম নিতে পারে তা বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রসিক পাঠকের কাছে রাখে না। এই খেয়ালী প্রসন্নতা থেকেই বাংলা কবিতার ভূমিতে সুকুমার রায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি

নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। সাহিত্যের বিচিত্রমুখী ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার যুগে বাংলা সাহিত্যের এই রসধারা রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রশ্নাতীত দাবী রাখে।

কল্পনার অসম্ভবতা থেকেই আরেক গুচ্ছের কবিতা এসেছে। যেমন ৪, ১৮, ২৯, ৩০, ৩২, ৪০, ৭১ সংখ্যক কবিতা। কিন্তু উৎকল্পনার পূর্ব জাতের সঙ্গে এই শ্রেণীর পার্থক্য রয়েছে। এই গুচ্ছের কবিতায় কবির অসম্ভব কল্পনার মধ্যে রয়েছে ঘোরতর পীড়ন। কল্পনার নিষ্ঠুরতা থেকে যে হাসি সৃষ্টি করা যায় রবীন্দ্রনাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে এই কবিতাগুলি স্বাদে স্বতন্ত্র এক কবিতা-গুচ্ছ হয়ে উঠেছে। যেমন—

॥ ৪ ॥

কাঁচড়াপাড়াতে এক
ছিল রাজপুত্তর,
রাজকন্যারে লিখে
পায় না সে উত্তর।
টিকিটের দাম দিয়ে
রাজ্য বিকাবে কি-এ,
রেগে মেগে শেষকালে
বলে ওঠে —দুত্তোর।
ডাক বাবুটিকে দিল
মুখে ডাল কুত্তোর।

অথবা

॥ ২১ ॥

"শুনব হাতির হাঁচি
এই বলে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে
ফেরে সারা দেশটা।
শুঁড়ে সুড়সুড়ি দিতে
নিয়ে গেল কঞ্চি
সাত জালা নস্যিও
রেখে ছিল সঞ্চি।

জল কাদা ভেঙে ভেঙে
করেছিল চেষ্টা—
হেঁচে দু-হাজার হাঁচি
মরে গেল শেষটা।"

রাজকন্যা-পাগল রাজপুত্তরের নিরপরাধ ডাকবাবুকে ডালকুত্তার মুখে দেবার অনায়াস নির্মমতার মধ্যে এবং হাতির হাঁচি গুণতে গিয়ে কৌতূহলী খ্যাপা কেষ্টার হেঁচে হেঁচে মরে যাওয়াটার মধ্যে যে হাসি তা বড় নিষ্ঠুরতার বিনিময়ে সৃষ্টি। এ-গুচ্ছের কবিতাকে নিষ্ঠুর কল্পনার হাসির কবিতা বলা যেতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে এ-জাতের কবিতা Ruthless Rhymes বলে পরিচিত। Edward Lear, Langford Read, Harry Graham—নিষ্ঠুরতা থেকে এ-জাতের কৌতুকের হাসি সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

"Grand papa fell down a dram
Couldn't scramble out again
Now he's floating down the sewer,
There's one Grand papa the fewer". (Harry Graham)

Langford Read-এর একটি limerick তুলে অজিত দত্ত মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যে Ruthless Rhymes-এর উদাহরণ দিয়েছেন।

"There was one young lady of Riga,
Who went for a ride on a tiger ;
They returned from the ride
With the lady inside ;
And a smile on the face of the tiger."

বাঘের এই তৃপ্তির হাসিটি বড় নিষ্ঠুর কল্পনার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-উদ্ধৃত ২৯ নং কবিতাটির সঙ্গে Langford Read-এর লিমারিকটির কল্পনাগত ঐক্য থাকলেও, নিষ্ঠুরতার দিক থেকে ইংরেজী কবিতাটিই ঘোরতর।

Ruthless Rhymes রচনায় Edward Lear-ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ; যেমন—

"There was an Old Man of Madras
Who rode on a cream coloured ass
But the length of its car
So promoted his fear,
That it killed that Old Man of Madras."

অথবা "There was an Old Man of East
Who gave all his children a feast
But they all ate so much
And their conduct was such
That it killed that Old Man of the East."

রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র কবিতাগুলো প্রসঙ্গত Lear-এর Nonsense Rhymesকে মনে করিয়ে দেয়। খাপছাড়ার মত Lear-এর এই Rhymes-ও বিমিশ্র রচনা। সেখানে নিষ্ঠুর হাসির কবিতা যেমন রয়েছে, তারই সঙ্গে মানুষের বিচিত্র স্বভাব, আরও বিচিত্র খেয়াল নিয়ে উৎকল্পনার নির্মল হাসির অজস্র Rhymes রয়েছে। Lear-এর লিমারিকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র বহু কবিতার স্বাদৈক্য যেমন রয়েছে. Lear-এর লিমারিকের গঠনটাও রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কবিতায় গ্রহণ করেছেন। লিমারিকের গঠনের বিশিষ্টতা রয়েছে। Nursery Rhymes, Hickary Dickary Dock সম্ভবত প্রাচীন লিমারিক হলেও Edward Lear-এর হাতেই লিমারিক পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে একটা সাহিত্য-ধারার সৃষ্টি করেছে। এই ধারায় Rossetti, Swinburn, Ruskin তাঁদের শক্তির যোগান দিয়েছেন। পরবর্তী Langford Read, Harry Graham — এই ধারার চর্চা করে লিমারিককে আরও সমৃদ্ধ করে তোলেন। সনেটের চতুর্দশ পদের মত লিমারিক-এ পাঁচটি পদ থাকে। কবি তাঁর ভাবনাকে এই পঞ্চপদে রূপ দেবেন। Rhyme Scheme-টি এইভাবে থাকে A, A, B, B, A— Everyman's Encyclopaedia লিমারিকের গঠন সম্বন্ধে বলেছেন— "Limerick—Metrical frivolity of 5 lines of verse of which 1st, 2nd and 5th rhymes with an intermediate distich."

মিলের ক্ষেত্রে দেখা যায় লিমারিকে দুটি শব্দকে ১ম, ২য়, ৫ম চরণে তিনবার খেলিয়ে, কখনও তিনটি শব্দকে তিনটি চরণে খেলিয়ে মিল-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়। Lear স্বয়ং উভয়বিধ পন্থায় লিমারিক রচনা করেছেন। যেমন—

দুটি শব্দ খেলিয়ে—

"There was an Old Man of *Nepaul*
From his horse had a terrible *fall*
But though split quite in two
By some very strong glue
They mended that Man of *Nepaul*."

তিনটি শব্দ খেলিয়ে—

"There was an Old Man of the *Coast*
Who placidly sat on a *post*
But when it was cold
He relinquished his hold
And called for some hot butter *toast*."

"Everyman's Encyclopaedia" লিমারিকের উদাহরণ দিতে গিয়ে Langford Read-এর নিম্নোক্ত তিনটি মিলের লিমারিকটি গ্রহণ করেছেন—

"All hail to the Tour of *Limerick*
Which provides a cognoman, *generic*
For a species of verse
Which for better or worse
Is supported by layman and *Cleric*

রবীন্দ্রনাথকে লিমারিক আকর্ষণ করেনি তা নয়, কিন্তু তিনি তিনটির বেশি লিমারিক রচনা করেন নি। এ-জাতীয় তিনটি কবিতায় তিনি দুটি এবং তিনটি মিল উভয়কেই গ্রহণ করেছেন। এই লিমারিক তিনটি রয়েছে 'খাপছাড়া'র সংযোজনী অংশে।

॥ ৬ ॥

গিন্নীর কানে শোনা ঘটে অতি সহজেই
গিনি সোনা এনে দেব 'কানে কানে কহ যেই।'
না হলে তোমারি কানে, দুগ্র'হ টেনে আনে
অনেক কঠিন শোনা—চুপ করে রহ যেই। (দুটি মিল)

॥ ১৪ ॥

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।
আপিসেতে খেটে মরা, তার চেয়ে ঝুলি ধরা
ঢের ভালো—একথায় নাই কোন সন্দ। (তিনটি মিল)

॥ ১৮ ॥

মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে একি ভুল—
ধান পাকাবার মাঝে ফোটে বেলফুল।
হঠাৎ আনাড়ি কবি তুলি হাতে আঁকে ছবি
অকারণে কাঁচা কাজে পেকে যায় চুল। (তিনটি মিল)

লিমারিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ সার্থকতা অর্জন করতে পারতেন। বিশেষ করে লিমারিকের গঠন-বৈশিষ্ট্য তিনি নিখুঁত আয়ত্ত করেছিলেন। আর 'খাপছাড়া'র যে প্রসন্ন হাস্যমুখর মেজাজ সেখানে লিমারিকের নির্ভুল কাঠামোতে হাস্যরস সঞ্চারিত করতে পারা অনায়াস সহজ ছিল কবির পক্ষে। তথাপি রবীন্দ্রনাথ তিনটির বেশী লিমারিক কেন যে রচনা করলেন না, তা লক্ষ্যগোচর হওয়া স্বাভাবিক।

'খাপছাড়া'র কয়েকটি কবিতা পড়তে গিয়ে পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি লিমারিক লিখতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেছেন। সংযোজনার ১১, ১৬, ১৯, ২০ সংখ্যক কবিতায় তিনি লিমারিক লিখতে গিয়ে স্বতন্ত্র এক জাতের কবিতা লিখে ফেলেছেন। এই কটি কবিতায় লিমারিকের intermediate distich রক্ষা করা হয়েছে। Rhyme Scheme-এর পথেও এগিয়েছেন। কিন্তু পাঁচটি পদে শেষ না করে কবি তাঁর বক্তব্যকে ছটি পদে শেষ করেছেন। এবং এই ষষ্ঠপদে তিনি সচেতনভাবে এমন এক বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছেন যাতে এই কটি কবিতা বাংলা সাহিত্যে একটা স্বতন্ত্র গঠনের ও ভিন্ন স্বাদের কবিতা হয়ে উঠেছে।

॥ ১১ ॥

গাড়িতে মদের পিপে ছিল তেরো-চোদ্দো,
এঞ্জিনে জল দিতে দিল ভুলে মদ্য।
    চাকাগুলো ধেয়ে করে ধান খেত ধ্বংসন
    বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে 'কোথা কানু জংশন'—
ট্রেন করে মাতলামি নেহাত অবোধ্য,
সাবধান করে দিতে কবি লেখে পদ্য।

॥ ১৬ ॥

কনে দেখা হয়ে গেছে, নাম তার চন্দনা
তোমারে মানাবে ভায়া, অতিশয় মন্দ না।
    লোকে বলে খিট্‌খিটে,
    মেজাজটা নয় মিঠে—
দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা।
কুঁজো হোক, কালো হোক, কালাও না, অন্ধ না।

॥ ১৯ ॥

পেনসিল টেনেছিনু হপ্তায় সাতদিন,
রবার ঘষেছি শেষে তিনমাস রাতদিন।
কাগজ হয়েছে সাদা,
সংশোধনের বাধা
ঘুচে গেছে, এইবার শিক্ষক হাতদিন—
কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন।

॥ ২০ ॥

বলিয়া দিনু মামারে—
তোমারি ঐ চেহারাখানি কেন গো দিলে আমারে।
তখনো আমি জন্মিনি তো,
নেহাত ছিনু অপরিচিত,
আগে ভাগেই শাস্তি এমন, একথা মনে ঘা মারে।
হাড় কখানা চামড়া দিয়ে ঢেকেছে যেন চামারে।

লিমারিকের রস-সার্থকতা নির্ভর করে ছন্দের বা মিলের ওপর ততটা নয়, যতটা চমক সৃষ্টির ওপর। চমক দিয়ে লিমারিক হাস্যসৃষ্টি করে, আবেদন সৃষ্টি করে। পূর্ব উদ্ধৃত Langford Read-এর Riga-র যে Young Lady-র লিমারিকটা, ওর সমস্ত রসটুকু জমা রয়েছে শেষ ছত্রের চমকে যেখানে Lady-কে পেটে পুরে বাঘ মৃদু হাসছে (smile)। অথবা Lear-এর পূর্ব উদ্ধৃত যে লিমারিকটি—

"There was an Old Man of the coast
Who placidly sat on a post
But when it was cold
He relinquished his hold
And called for some hot butter toast."

—এখানে coast-এর Old Man post-এর ওপর placidly বসে পাইপ টানছে—এই চিত্রটিই হাস্যকর। কিন্তু Lear এতে শেষ চমক হানলেন যেখানে 'post'-এর ওপর বসে তিনি হেঁকে বলছেন গরম রুটি মাখন লে-আও। অবশ্য লিমারিকে চমকটা যে শেষ ছত্রেই আসবে, তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

যেখানেই আমুক চমক সৃষ্টিতেই যে এজাতীয় কবিতার রস-সন্ধান নিহিত তা রসিক পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করবেন।

রবীন্দ্রনাথের এই যে ছয় পদের কবিতাগুলো, এদের প্রতিটির রস সার্থকতা নির্ভর করছে ষষ্ঠপদে এক একটি চকিত মন্তব্য সৃষ্টির ওপর। উল্লিখিত চারটি কবিতার প্রত্যেকটিতে কবি পঞ্চমপদে এসে থেমে যেতে পারতেন। তাতে লিমারিকের গঠনরীতি ও রসপূর্ণতা ব্যাহত হত না। ১৬ নং কবিতাটিতে কবি যদি পঞ্চম চরণে থেমে যেতেন, লিমারিকের বহিরঙ্গ গঠন যেমন রক্ষিত হত, তৎ-সঙ্গে খিট্‌খিটে মেজাজের কনেকে পছন্দ করার সপক্ষে কবি যে মোক্ষম যুক্তি দিয়েছেন—

—দেবী ভেবে নেই তারে করিলে বা বন্দনা—

তাতে হাস্যসৃষ্টির লিমারিক-সুলভ চমক সৃষ্টিও সার্থক হত। কিন্তু কবি অতিরিক্ত ষষ্ঠপদটিতে একটি চকিত মন্তব্য বসিয়ে দিয়ে

'কুঁজো হোক, কালো হোক, কালাও না, অন্ধ না।—

কনের পক্ষ নিয়ে হাস্যকে আরও তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করে দিলেন।

১৯ নং কবিতাটিতে ছবি-আঁকিয়ে ছাত্র সাত দিন ধরে পেন্‌সিল টেনে এবং তিনমাস ধরে রবার ঘষে একখানা ছবি অঙ্কনে ব্যর্থ হয়ে শিক্ষকের স্মরণ নিয়েছে। এখানে যদি কবিতাটি শেষ হত, পঞ্চপদের লিমারিক হতে পারত। কিন্তু কবি ষষ্ঠ পদটিতে একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে—হাসিকে সরব করেছেন।

'কিন্তু ছবির কোণে স্বাক্ষর বাদ দিন'—অর্থাৎ গুরুর স্বাক্ষর না থাকলে ওটি ছাত্রের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করবে।

ভাগ্নে মামার চেহারা পায়—এই প্রবাদ-সত্যটিকে আশ্রয় করে- ২০নং কবিতাটি রচিত। এখানেও ষষ্ঠ পদটি এসে—

'হাড় কখানা চামড়া দিয়ে ঢেকেছে যেন চামারে'—

মামাবাবুর চেহারার উত্তরাধিকার-ক্ষমতাকে নিয়ে ভাগ্নের রসিকতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

এই চারটি কবিতার মধ্যে ১৬, ১৯, ২০ সংখ্যক-এ কল্পনার খেলা নেই। উৎকল্পনার কবিতা ১১নং কবিতা। এঞ্জিনে জলের পরিবর্তে তেরো-চোদ্দ পিপা মদ ভুলে ঢেলে দিলে কি কি অঘটন ঘটতে পারে সেই কল্পিত অদ্ভুত খেয়ালী পরীক্ষাটা করতে গিয়ে এ কবিতার হাস্যসৃষ্টি করেছেন কবি। এ

ক্ষেত্রেও কবি 'ট্রেন করে মাতলামি নেহাত অবোধ্য' বলে পঞ্চম পদে শেষ করলে কবিতাটি চমৎকার একটি লিমারিক হত। "বাঁশি ডাকে কেঁদে কেঁদে কোথা কান্ন্ জংশন"—এই ছত্রটিতে লিমারিক-সুলভ সার্থক চমক সৃষ্টি রয়েছে। কিন্তু এ-রকম ভুল কখনও কারও না ঘটে, সে বিষয়ে 'সাবধান করে দিতে কবি লেখে পন্থ'—ষষ্ঠ পদের এই সতর্কবাণী দিয়ে কবি হাস্যকে বর্ধিত করেছেন।

উল্লিখিত চারটি কবিতার ক্ষেত্রেই পঞ্চম পদে সম্ভাব্য সমাপ্তির হাস্যকে ষষ্ঠপদের এক একটি মন্তব্য দ্বারা টেনে নিয়ে কবি হাসির বেগকে বাড়িয়েছেন। আর সেটাই ছিল কবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

লিমারিক লিখতে গিয়ে form-এর নেশায় মত্ত রবীন্দ্রনাথকে এই কৌতূহল পেয়ে বসেছিল যে A A B B A—লিমারিকের এই যে Rhyme Scheme এর সঙ্গে আরেকটি পদ জুড়ে দিয়ে এবং সে পদটিকে বুদ্ধিচটুল একটি চকিত মন্তব্যে গঠিত করে A A B B A A—এই Rhyme Scheme-এর কবিতা রচনা করলে কেমন দাঁড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের এই পরীক্ষার পথে উপযুক্ত প্রতিভার হস্তক্ষেপ ইংরেজী সাহিত্যে পাঁচপদের লিমারিকের মত বাংলা সাহিত্যে ছয় পদের এক বিশেষ জাতের ও বিশেষ স্বাদের কবিতার ধারা সৃষ্টি করতে পারে। শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন রীতির হাসির কবিতার সম্ভাবনা দেখিয়েছেন।

এদিকে রবীন্দ্র সাহিত্যের কৌতূহলী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রসঙ্গত লক্ষ্য করব Edward Lear-এর সঙ্গে 'খাপছাড়া'র স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটাও কিন্তু স্পষ্ট। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে আমরা সম্যক্ অনুধাবনের চেষ্টা করে আসছি তাঁর জীবনী থেকে, চিঠিপত্র থেকে, তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ থেকে। সেখানে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চিন্তা, ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত। সে-সব কিছুকে প্রচ্ছন্ন রেখে খাপছাড়ার রাজ্যে এলেন কবি। উৎকল্পনার এই রাজ্য সৃষ্টিতে তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ, সুকুমার রায়, Lear, Carroll তারই সঙ্গে form-এর নিত্যনূতন নেশা কবিকে খাপছাড়ার জগতে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু এ-রাজ্যে কবিকে বেশ সচেতন ভাবে তাঁর এই ব্যক্তিত্ব গোপনের কাজটি করতে হয়েছে। অতবড় মৌলিক প্রতিভা বলেই তা পেরেছেন। কিন্তু তিনি নিজেও যে একটা পরীক্ষার স্তরে বসে এ-কাজ করেছেন, এবং প্রতিক্ষণেই সার্থকতা বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন তা

নিজেই বলেছেন বিভিন্ন ভাবে। যেমন 'খাপছাড়া'র মুখবন্ধে বলেছেন—'যা তা লেখা তেমন সহজ নয়তো।' অন্যত্র বলেছেন, 'অবচেতন মনের রচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য।'

রবীন্দ্রনাথের জীবনসীমার একটা অধ্যায় আমাদের এই বাস্তব জগতের নিয়মশৃঙ্খলা, গভীর-গম্ভীরতা, নানাবিধ মূল্যবোধের মধ্যে বিচরণ করছে। সেখানে প্রকৃতিলোক, মানবলোক, অধ্যাত্মলোকে, দেশ ও জাতি এবং আন্তর্জাতিক ভাব-ধারণায় তাঁর প্রকাশ। কিন্তু আর একটা অধ্যায় সমস্ত ভারত্ব লঘু করে উনুনে শাড়ি বিছিয়ে, হাঁড়িগুলো আলনায় সাজিয়ে খুশী হয়ে হেসে উঠেছে। কিন্তু এই পৃথুল প্রথম জীবনটার ছায়া কেঁপে গেছে দ্বিতীয় জীবনে।

Lear-এর এরকম দুটো জীবন ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মত তাঁর জীবনী আমরা জানি না। আমরা জানি Lear খাপছাড়া জগতেরই নাগরিক। আমরা তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মতই একটা অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্ট মানুষ বলে ধরে নিয়েছি। আর তিনি নিজেই নিজের সেই বর্ণনা দিয়েছেন।—

"His body is perfectly spherical
He weareth a runcible hat."

সুতরাং Lear-এর খাপছাড়া রাজ্যে বিচরণের যে অনায়াস সহজতা, রবীন্দ্রনাথে তা পাওয়া কঠিন। সে সহজতা Lewis Carroll-এও ছিল না। কারণ Lear-এর মত অসম্ভবের জগৎ তাঁর জন্মভূমি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বা Carroll-এর এই রাজ্যে বিচরণায় বেশ নৈপুণ্য রয়েছে। কিন্তু সে নৈপুণ্য তাঁদের বহু অনুশীলনে আয়ত্ত করতে হয়েছে।

'খাপছাড়া'র কয়েক মাস পরে রচিত হয় 'সে' (প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৪৪)। 'সে' গ্রন্থখানা হল **'উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির স্বরূপ** কি'—সেই জিজ্ঞাসার গল্পময় ব্যাখ্যা। Modern Literature গ্রন্থে G. K. Chesterton, 'A Defence of Nonsense' নামে একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রবন্ধে যেমন উৎকল্পনার সাহিত্যের সপক্ষতা করেছেন, 'সে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উৎকাল্পনিক হাস্য-শিল্পধারার অনুকূলে বিশ্লেষণাত্মক ও বিস্তৃত গল্পময় ব্যাখ্যা করেছেন। 'সে' হল উৎকল্পনার বিশুদ্ধ হাসির সমর্থনে রচিত একটি গল্পময় প্রবন্ধ।

'খাপছাড়া'য় কবির সচেতন বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব অসম্ভবের রাজ্যসৃষ্টির সার্থকতা

বিষয়ে যে সন্দেহ প্রকাশ করছে, সেই সন্দেহ থেকেই 'সে' গ্রন্থের সৃষ্টি। 'খাপছাড়া'য় উদ্ভট কল্পনা থেকে হাসাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, সচেতন বুদ্ধিকে প্রচ্ছন্ন রেখে এ-হাসি সৃষ্টি করা সহজ নয়। 'সে' গ্রন্থে এই সত্যটাই দেখালেন নানান অসম্ভব কল্পনার গল্প বলে এবং সে-সব গল্পের হাসাবার শক্তি বিচার করে।

'সে' গ্রন্থের প্রধান গল্পকথক 'আমি'। শ্রোতা পুপুদি, 'সে' কখনও অপ্রধান গল্পকথকের ভূমিকায় এসেছে। মূলত এই 'সে' হল লেখকের আজগুবি গল্পের মূল অবলম্বন, অসম্ভব গল্পের বহুরূপী। লেখকের ভাষায় 'সে' হল 'নামহারা বানানো মানুষ', 'কেবল বাক্য দিয়ে তৈরি'। রবীন্দ্রনাথের মনে যত-রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা এসেছে 'সর্বনামধারী' এই 'সে' চরিত্রটিকে আশ্রয় করে তাকে গল্পরূপ দিয়ে লেখক পুপুদিকে এবং পাঠক সমাজকে শুনিয়েছেন। যেমন শুনিয়েছেন ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর কল্পনার অসম্ভবতার কথা ডমরু-ছকু প্রভৃতির মুখ দিয়ে, Raspe যেমন শুনিয়েছেন Munchaousen-এর মুখ দিয়ে।

'সে' গ্রন্থে ১৪টি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে 'যা সৃষ্টিছাড়া বড়োবাজারে, বহুবাজারে .এমন কি নিমতলাতেও যার গতি নেই'—তা নিয়ে গল্প তৈরির প্রস্তুতির কথা। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে নবম অধ্যায় পর্যন্ত 'সে' এবং 'আমি' পরম উৎসাহে পুপুদিকে অসম্ভব কল্পনার গল্প বলেছে। তাদের উদ্দেশ্য এই গল্প বলে পুপুদিকে হাসান। তার মন জয় করা। আর লেখক রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য এই গল্পগুলো লিখে পাঠককে দেখান যে—উৎকল্পনার হাস্যরস ঠিক কখন সৃষ্ট হয়, তার যথার্থ স্বরূপটি কি। তার প্রমাণ, প্রতিটি গল্পের শেষে দেখা গেল 'সে' ও 'আমি'র গল্প শুনে পুপুদির চোখে-মুখে নির্ভেজাল প্রসন্ন হাসি না খেলে, তার চোখে কখনও জল এসেছে, কখনও পুপুদি গল্পের অসম্ভবতাকে বিশ্বাস করে ফেলেছে, কখনও বা রাগে ব্যথায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে, আবার কখনও গল্প পুপুদিকে ভাবিয়ে তুলেছে। ব্যর্থ হয়ে 'সে' বলেছে, 'যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে তাকে হাসানো সোজা নয়।' 'আমি' তার গল্প শেষ করে বিমর্ষ হয়ে কখনও চুপ করে রয়েছে, কখনও পুপুদির মুখে তাকিয়ে নিজের গল্প সম্বন্ধে বলেছে, 'এ-কাহিনীটা পুপুদির কাছে একটুও পছন্দসই হয়নি।' বস্তুত অসম্ভব কল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্প-চাতুর্য নিহিত রয়েছে অবিশ্বাস থেকে মজা আহরণের দুরূহ কৌশলের মধ্যে। এই কৌশলটি আয়ত্ত করা যে সোজা নয়,

এই সত্যটিই 'সে' গ্রন্থে নানান অসম্ভব গল্প বলে, এবং গল্পশেষে পুপুদির কষ্টি-পাথরে সে-সব গল্পের হাসাবার শক্তি বিচার করে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন। 'সে' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি করতে মুখ্যত কলম ধরেননি, উৎকল্পনার হাস্যের স্বরূপ সন্ধানে তিনি প্রয়াসী হয়েছেন। এ-কথা প্রমাণ করে দেখান যেতে পারে।

পুপুদিকে হাসাবার উদ্দেশ্যে, 'আমি' প্রথমে হুঁহাউ দ্বীপের মানুষের নস্যি নিয়ে পেট ভরার এক অসম্ভব গল্প বলল। পুপুদি এ-হেন অবিশ্বাস্য গল্প শুনে কপাল কুচকে বললে, 'এ কখনো হয়? নস্যি নিয়ে পেট ভরে?' পুপুদির প্রশ্নের ভঙ্গীতে গল্পটা ভালো না লাগার সুর। এ গল্পে পুপুদিকে হাসাতে গিয়ে 'আমি' যে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ, অবিশ্বাস্য উদ্ভাবনের উপাদান নির্বাচনে 'আমি' ভুল করেছে। নস্যি বস্তুটিকে নিয়ে কল্পনার জগতে এগুনো যায় না। নস্যির ঝাঁঝ, নস্যির অভিজ্ঞতা অসম্ভবের রাজ্যে না নিয়ে পরিচিত সত্যের ঘরে পৌছে দিতে চায়। সে-জন্যই নস্যি দিয়ে পেট ভরার কাহিনীটার মধ্যে পুপুদি হাসবার মত মজার কিছু খুঁজে পায়নি। 'আমি' ও 'সে'-কেন্দ্রিক পুপুদির গল্পাসরের বাইরে অপেক্ষমান যে পাঠকসমাজ তারাও পুপুদির সঙ্গে একমত। আর রবীন্দ্রনাথ দেখালেন **অবিশ্বাস্য হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না**। অতএব উৎকল্পনার হাস্যরসের স্বরূপ সন্ধানে 'এহ বাহ্য আগে চল আর'।

প্রথমবারের ব্যর্থতা থেকে দ্বিতীয় এক অসম্ভব গল্প তৈরির চেষ্টা হল। দ্বিতীয় গল্প হো হো ওরফে শিবুরামের মানুষ হবার গল্প। শেয়াল মানুষের কাছে এসে মানুষ হবার দাবী করছে—এ-কল্পনা অসম্ভব, উদ্ভট। কিন্তু এই উৎকল্পনা যখন গল্পরূপ পেল, দেখা গেল গল্পটা ব্যঙ্গে ও কারুণ্যে ভরে উঠেছে। মানুষ হতে এসে ল্যাজ হারিয়ে শিবুর যে কান্না,—"আমার ল্যাজ কই। আমার ল্যাজ কই,"—তা শুনে পুপুদি হাসল তো না-ই, বলে উঠল—'কী অন্যায়, ভারী অন্যায়। আচ্ছা দাদামশায়, ওর মাসিও ওকে নেবে না ঘরে?' 'খাপছাড়া'র আলোচনা প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'যা তা লেখা তেমন সহজ-নয় তো', তারই যেন প্রতিধ্বনি করে 'সে' বলল 'এই যে রিপোর্টটা পড়ে শোনালে, ওটাতো আগাগোড়া ব্যঙ্গ, প্রবীণ বয়সের জ্যাঠামি। দেখলে না পুপুদির মুখ কিরকম গম্ভীর? বোধহয় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।...... মজা করছ মনে কর, কিন্তু তোমার ঠাট্টা গায়ে ঠেকলে ঝামার মতো লাগে। এর

আগে তোমাকে অনেকবার সতর্ক করে দিয়েছি—হাসতে গিয়ে, হাসাতে গিয়ে পরকাল খুইয়ো না। ল্যাজকাটা শেয়ালের কথা শুনে পুপুদিদির চোখ জলে ভরে এসেছিল, দেখতে পাওনি বুঝি? বল তো আজই তাকে আমি একটুখানি হাসিয়ে দিই গে—বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভ্যাজাল নেই।'

এই দ্বিতীয় গল্পে রবীন্দ্রনাথ আরেকবার দেখালেন,—**অসম্ভব কল্পনা হলেই অসম্ভবের গল্প হয় না, এ-জগতের সচেতন-বুদ্ধিকে সজাগ রেখে অসম্ভবের গল্প বলা দুঃসাধ্য।**

পুপুদিকে বিশুদ্ধ হাসি হাসাবার জন্য স্বয়ং 'সে' তৃতীয় গল্প তৈরি করল। এলো গেছোবাবার অদ্ভুত কল্পনা, এবং আরও অদ্ভুত তার আচরণ। কিন্তু গল্পশেষে এবারও ব্যর্থতা। পুপুদিদি এবার গেছোবাবাকে এমন বিশ্বাস করে বসল যে তার সন্ধান করতে বুঝি স্বয়ং 'সে'কেই পাঠায়। 'আমি' হেসে 'সে'কে বলল—'ওহে কমবুদ্ধি হাসাতে পারলে?' 'সে' ব্যথিত হয়ে বলল, 'না, যে মানুষ সবই বিনা বিচারে বিশ্বাস করতে পারে, তাকে হাসানো সোজা নয়।'

এই তিনটি অসম্ভব গল্পের হাসাবার শক্তির ব্যর্থতা দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির একটি সূত্রসন্ধান দিলেন। তিনি দেখালেন এলোমেলো অসম্ভব কথা হলেই উৎকল্পনার হাস্যরসের গল্প জমে না। উৎকল্পনার নিজস্ব একটা চলার পথ আছে। সে পথ বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে অবিশ্বাসের দিকে চলে গেছে। ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিতে'র কাতিকেয়র ময়ুরটি যদি ডমরুকে তার ঘরের চালে নামিয়ে দিত, তাহলে অসম্ভবের হাস্যরসের গল্প জমত না। কারণ দেবসেনাপতি কাত্তিকেয়ের ময়ূরের পিঠে ডমরুকে দেখে গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা ভক্তি ও ভয়ে একটা দূরত্ব রচনা করতেন। 'ডমরুচরিতে'র ময়ুরটি তাই আকাশ থেকে ডমরুকে পাখা ঝাপটে ফেলে দিয়ে তাকে আরও অসম্ভবের পেটে (পীর গোরাচাঁদের ভীষণাকৃতি বাঘের পেটে) ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং বাঘের পেট থেকে লেখক এক অতি-অদ্ভুত পন্থায় ডমরুকে বার করে উচ্ছ্বসিত বিশুদ্ধ এক হাস্যসৃষ্টি করেছেন। অথবা 'খাপছাড়া'র বরটি যদি সত্যই অসম্ভবের বিবাহের আসর থেকে প্রতিবেশীর বিয়ের আসরে উঠে আসত তবে শ্যালক এবং প্রতিবেশীরা তাকে তাড়িয়ে ছাড়ত, নববধূ অশ্রুমোচন করত, শ্বশুর শাশুড়ি মেয়ের শোকে একটা কিছু ঘটনা ঘটাত। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে তাকে অবিশ্বাসের জগতেই রেখে দিয়েছেন। কিন্তু 'সে'-র এই তিনটি

গল্প অসম্ভবের রেখা পেরিয়ে সীমার জগতের বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, অনুভূতির মধ্যে ধরা দিয়েছে। ফলে গল্পত্রয় অসম্ভব জগতের বিশুদ্ধ হাস্যশক্তি হারিয়ে ফেলেছে—চোখে জল ভরে এসেছে, ব্যঙ্গ আঘাতের ব্যথা দিয়েছে, শ্রোতা অসম্ভবকে বিশ্বাস করে বসেছে। অসম্ভবের কল্পনা সত্যের ঘরে পৌঁছেছে বলেই 'সে' ও 'আমি' এত চেষ্টা করেও পুপুদিদিকে হাসাতে ব্যর্থ হয়েছে।

পূর্বোক্ত তিনটি গল্পকেই রবীন্দ্রনাথ অসম্ভব কল্পনার যথার্থ স্বরূপ সন্ধানের সোপান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। চতুর্থ গল্পে এসে 'আমি' তথা রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন, 'বিশ্বাস না করিয়েও মজা লাগাতে পারা যায় কি-না।' চতুর্থ গল্প সেই পরীক্ষাজাত। এ-গল্প 'সে' এবং 'আমি'র কনে দেখতে যাওয়া এবং 'সে'র বিয়ের গল্প। শেয়ালের ডাকে চমকে উঠে পুতুলালের গাড়ি সমেত পুকুরে-পড়া এবং পিঠের ওপর ব্যাঙের নাচে বহুদিনের পিঠের বাত সেরে যাওয়ার মধ্যে পুপুদি মজা পেয়েছে এবং তার মজা পাওয়ার মাত্রা বহুগুণিত হয়েছে গল্পের শেষে যেখানে 'সে'-র নতুন বউ ভোর সাড়ে চারটায় উঠে বরকে নিয়ে বাজারে গিয়েছে মানকচু কিনতে। পুপুদি এ-গল্প শুনে খুব খুশি। 'খাপছাড়া'য় অদ্ভুত বরটি বিয়ের আসরে রায়বেশে নাচ নাচতে নাচতে শ্যালীর মাথায় গাট্টা বসিয়ে দিয়েছে, 'সে'-র চতুর্থ গল্পে তারই যোগ্য এই কনেটি সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রনাথ। যে কনে বিয়ের পরই বরকে ভোর না হতে মানকচু কিনতে বাজারে নিয়ে যেতে পারে, সে এক মৌলিক সৃষ্টি। 'খাপছাড়া'র বরের ঠাট্টা, বা 'সে'-র কনের এই বরকে জব্দ করার গুণ হল এই যে তা হো হো-র গল্পের মত গায়ে ঠেকলে ঝামার মত লাগে না। তার কারণ এ-গল্পের গতি অবিশ্বাসের দিকে। তাতে করেই ঠাট্টার আঘাতটুকু মুছে গেছে।

পর পর তিনটি গল্পের ব্যর্থতার পর চতুর্থ গল্প বলে পুপুদিদিকে হাসাতে পারায় রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিপাদ্যে এলেন যে বিশ্বাস না করিয়ে খুশি করতে পারার মধ্যেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কৌশল নিহিত। কিন্তু এই প্রতিপাদ্য স-উদাহরণ প্রতিপন্ন হলেও রবীন্দ্রনাথ একে আরও একটু যাচাই করে গ্রহণ করতে চাইলেন। তার কারণ রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টিকে চতুর্থ গল্পের শিল্পগুণ ফাঁকি দিতে পারেনি। এ-গল্পের চালটা নিঃসন্দিগ্ধভাবে অসম্ভব গল্পের হাস্যরসের চাল হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ, Raspe, Lear, Carroll, রাজশেখর বসু প্রমুখ স্রষ্টা অবিশ্বাসের জগৎ থেকেই রস আহরণ করে উৎকল্পনার

হাস্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু উৎকল্পনার চালটা এখানে একটু লঘু হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চাল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন বলেই গল্পের 'সে'-কে নিজের বিরুদ্ধে সমালোচকের ভূমিকায় দাঁড় করিয়ে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্পরূপটির অভ্রান্ত কারিগরি সম্বন্ধে স্রষ্টাদের আরও সতর্ক করে দিলেন। 'সে' সমালোচনা করল— চতুর্থ গল্প অসম্ভব গল্প হয়নি, হয়েছে যা-তা। কারণ হোক না অসম্ভব তারও তো একটা বাঁধুনি থাকা চাই। এলোমেলো অসম্ভব তো যে সে বানাতে পারে।' 'সে'-র এই সমালোচনা 'আমি' শুনলেন। শুনে সমালোচক 'সে'-কে একটা উদাহরণ দিতে বললেন। 'সে' তখন যথার্থ অসম্ভব গল্পের নমুনা স্বরূপ তাস্‌মানিয়াতে তাস খেলার নেমন্তন্নর গল্প বলল। কিন্তু শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরাঙ্কুনা, পামকুনি দেবী, কিষ্টিনাবুর, ঘেরিউনামু ইত্যাদি ব্যক্তি ও বস্তুর বিদ্‌ঘুটে নামের ওপর হোঁচট খেতে খেতে 'আমি হাঁপিয়ে উঠে বলল, 'থামো থামো।' পাঠকেরও একই অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ এ-গল্প থেকে দেখালেন 'সে' চালের লঘুত্বটা দূর করতে গিয়ে উৎকল্পনার স্বরূপটা ভুল করেছে। হার মেনে 'সে' অসম্ভব গল্পের স্বতন্ত্র একটা সংজ্ঞা উপস্থাপিত করল —'বিশ্বাস করবার অতীত যা, তাকেও বিশ্বাস করবার যোগ্য করতে পার যদি তা হলেই অদ্ভুত রসের গল্প জমে। নেহাত বাজারে চলতি ছেলে ভোলাবার সস্তা অত্যুক্তি যদি তুমি বানাতে থাক তাহলে তোমার অপযশ হবে, এই আমি বলে রাখলুম।'

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব প্রতিপাদ্যের পাশে 'সে'-র এই সংজ্ঞা রেখে আবার গল্প দিয়ে তার বিচার করলেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সবরকম জিজ্ঞাসার বিচার করে অসম্ভব গল্পের যথার্থ স্বরূপটি দেখাতে চাচ্ছেন। পুপুদিকে 'সে' তার সংজ্ঞানুসৃত গল্প বলেছে চারটি। ৬,৭,৮,৯ অধ্যায়-ধৃত এই চারটি গল্প শুনে পুপুদি হাসল তো না-ই, বরং বিশ্বাস করবার অতীতকে বিশ্বাস করে বসে পুপুদির কখনও প্রশ্ন জাগল, কখনও বিশ্বাস করতে পুপুদির বিষম খটকা লাগল। আবার পাতু গেঁজেলের সঙ্গে 'সে'-র গা বিনিময়ের অবিশ্বাস্য গল্প পুপুদি এতদূর বিশ্বাস করে বসল যে পরের দিন 'সে'-কে মুখোমুখি দেখে একেবারে হিষ্টিরিয়া। হাতে চোখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠে দিদি বললে, 'যাও যাও, গাঁজাখোরের গা চুরি করে আমার গাড়িতে উঠতে পাবে না।' অষ্টম গল্পে 'সে'-র অনুরোধে তার গা ফিরিয়ে দিয়ে নবম গল্পে 'আমি' গুলিবিদ্ধ 'সে'র মাথার খুলির মধ্যে বাঁদরের মগজ ঢুকিয়ে

দিয়ে বিশ্বাসের অতীতকে বিশ্বাস্য করার চরম গল্প ফাঁদলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-গল্পের পরিণতিতে 'সে'-ই বাধা দিয়ে গল্প মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছে। দশম অধ্যায় থেকে অসম্ভবের গল্প আর জমেনি। 'সে' তার মগজ বদলের পরদিন থেকে গল্প জোগানোর কাজে ইস্তফা দিয়েছে। দশম থেকে চতুর্দশ অধ্যায় পর্যন্ত গল্পগুলো পুপুদির শৈশবের স্মৃতিকথা। তারই সূত্রে সুকুমারের কথা, মাষ্টারমশাই'র কথা এসেছে। সুকুমার ও পুপুদির গোপন হৃদয়-বিনিময়ের বেদনায় 'সে' গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটেছে।

অতএব 'সে-র সংজ্ঞা প্রতিপাদ্য হিসাবে দাঁড়াল না। **বিশ্বাস না করিয়ে মজা লাগাতে পারার মধ্যেই অসম্ভব গল্পের শিল্পচাতুর্য নিহিত**—এই প্রতিপাদ্যই জয়ী হল। রবীন্দ্রনাথ 'সে'-র সমালোচনা ও ব্যর্থতা থেকে এই সতর্কবাদ গ্রহণ করলেন যে অসম্ভব গল্পের চাল সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। সেই সতর্কতার পথেই উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কারিগরি নিহিত।

'সে' গ্রন্থখানা উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির সূত্র গ্রন্থ। বিচিত্র গল্প আশ্রয় করে রবীন্দ্রনাথ 'নেতিনেতি' করে উৎকল্পনার হাস্যরূপের স্বরূপে পৌছেছেন। যেমন পৌছেছেন সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্যাত্মার স্বরূপ উদ্ঘাটনে। সকল দেশের সাহিত্যেই এ-জাতীয় গল্পময় প্রবন্ধ গ্রন্থ দুর্লভ।

বাংলা সাহিত্যে অসম্ভব গল্পের হাস্যরসের যে ধারা ত্রৈলোক্যনাথ এনে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থে তার শিল্প ব্যাকরণ তৈরি করে এই ধারার সাহিত্যমূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সর্বদেশের সর্বকালের Nonsense Literature-এর পক্ষে 'সে'-গ্রন্থকে অনুবাদ করে 'A Defence of Nonsense' নামে তুলে ধরা যায়।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা যে ধারায় বিচরণ করে রসসৃষ্টি করেছে, যে-কাব্যধারার স্বরূপ সূত্র সযতনে তিনি রচনা করেছেন, উৎকল্পনার সেই রসধারা আজ আর বাংলা সাহিত্যরসিক ও সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টির বাইরে থাকতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(১৮৭১-১৯৫১)

রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথকে 'বাংলা দেশের সরস্বতীর বরপুত্রে'র আসনে সর্বাগ্রে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু যে অবনীন্দ্রনাথকে তিনি এই আসন দিয়েছেন, সমস্ত ভারতকে তিনি চিত্রকলার মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধিতে সক্ষম করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করছে'।[১] এই পরিচয়ই অবনীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয়। তিনি প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ চিত্রশিল্পী। দ্বিতীয়তঃ তিনি সাহিত্যিক। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে পরিচিত তাঁর বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল, শকুন্তলা, রাজকাহিনী, ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, ইত্যাদি গ্রন্থ সম্ভারে। গভীর উপলব্ধি, কল্পনার মুক্তি, ইতিহাস ও রূপকথার নবরূপায়ণ-কৌশল, প্রাঞ্জল সরসতা ও কবিত্বের সম্পদের সঙ্গে ভাষার চিত্রগুণ সৃষ্টি-ক্ষমতা বাঙালী পাঠককে মুগ্ধ করেছে। গদ্যে ছন্দস্পন্দ ও ব্যঞ্জনা এনে দিয়ে কাব্যসীমায় তাকে উত্তীর্ণ করবার ক্ষমতায় রসিক পাঠক তাঁর রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যরচনার এই গুণগত মূল্যের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে গদ্য কবিতা রচনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[২]

কিন্তু এ-সব রচনার বাইরে সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের আরেকটা পরিচয় রয়েছে। সে-পরিচয় বহন করছে তাঁর 'ভূতপতরীর দেশে', 'বাদশাহী গল্প(১)', 'বাদশাহী গল্প (২)', 'রাসধারী' নাটক। এখানে অবনীন্দ্রনাথ হাস্যরসিক লেখক। তিনি যেমন শিল্পকে রীতিবন্ধের অনড় আলংকারিক অথবা জটিল চরিত্র থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, রসসৃষ্টি আর অনুভূতি প্রকাশের তাগিদে শিল্পের অবাধ স্বাধীনতাদান তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা ছিল, অনুরূপ কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে অসম্ভব আজগুবির রাজ্য সৃষ্টি করবার বাসনায় তিনি কলম ধরেছিলেন।

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'ঘরোয়া'র ভূমিকা।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'পুনশ্চ'র ভূমিকা।

'বুড়ো আংলা', 'খাজাঞ্চির খাতা', 'মারুতির পুঁথি', 'চাই বুড়োর পুঁথি' প্রমুখ রচনার রাজ্যটি এই মুক্তকল্পনা ও অবাধ স্বাধীনতার রাজ্য। কিন্তু এই অপূর্ব রাজ্যে রূপকথার একটি আবহ রচিত হবার ফলে হাসি কোথাও প্রাধান্য পায়নি। কিন্তু 'ভূতপতরীর দেশে', 'বাদশাহী গল্প' ও 'রাসধারী' নাটকে তিনি কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতার দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করতে উৎসুক হলেন। উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা এই অবনীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে সুপরিচিত নন।

ত্রৈলোক্যনাথ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি ভূত-মানুষ, রূপকথা-ইতিহাস কথা, সমাজকথা নিয়ে তিনি এক বিমিশ্র প্রক্রিয়ায় আজব গল্প-রাজ্য রচনা করেছিলেন। আজগুবি অদ্ভুতের এই রাজ্যটা বাংলা দেশে প্রসন্ন উচ্চহাসির নতুন স্বাদ এনে দিয়েছিল। ত্রৈলোক্যনাথের সেই পথ অবনীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণের বারান্দায় বসে কাটুম কুটুম ছবি আঁকতে আঁকতে তিনি কল্পনাকে সম্ভব-অসম্ভবের জগতে উধাও করে দিতেন। সেই জগতে বসে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ যেমন ছবি এঁকেছেন, হাসির উচ্ছ্বসিত গল্পও রচনা করেছেন। রীতিবন্ধের অনড় ইতিহাস ভেঙে অবনীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন হারুন্-অল্-রসিদ এবং আওরঙ্গজেব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, একই পাঠশালায় ছাত্র ছিলেন তারা। হারুন্দে পারস্য উপন্যাসের সঙ্গে ডিটেকটিভ বই পড়তে ভালোবাসতেন এবং উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতা এসেছিলেন।'[৩]

অবনীন্দ্রনাথ-এ ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখরের উত্তরসূরিত্ব হল উৎকল্পনার এই প্রবল মৌলিকতায় এবং তার সহাস্য অনাবিল হাস্যসৃষ্টির ক্ষমতায়। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির কৌশল হচ্ছে এই প্রবল অবিশ্বাসের পথে তীব্র অসঙ্গতি সৃষ্টিরই কৌশল। ত্রৈলোক্যনাথ, রাজশেখর বসু, রাস্‌পে এই নৈপুণ্য আয়ত্ত করেছেন। ক্যারল—তাঁর কাহিনী সৃষ্টিতে এই কৌশল সার্থক আয়ত্ত করতে পারেননি বলেই তাঁর উৎকল্পনার সৃষ্টিতে রূপকথার অনুপ্রবেশ হাসির উচ্ছ্বাসের পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উল্লিখিত রচনাগুলিতে এই কৌশলের সার্থক অধিকারী।

অবনীন্দ্রনাথের একটি বৈঠকী-মেজাজ ছিল। যেমন ছিল ত্রৈলোক্যনাথের, রাজশেখর বসুর। রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে 'খামখেয়ালী সভা'র (১৮৯৬-৯৭) উল্লেখ করা হয়েছে, সভার ঐ নামকরণ অবনীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত। অবশ্য খামখেয়ালী

৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভূতপতরীর দেশ।

সভায় তিনি খেয়াল রসের কোন সৃষ্টি পরিবেশন করেননি, বরং যা করেছেন, তা ভিন্ন রসের। যেমন 'দেবী প্রতিমা' গল্প। কিন্তু তার খেয়ালী মেজাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই সভা, এবং পরবর্তীকালে সৃষ্টিরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। 'বাদশাহী গল্পে' যে দাদামশাই গল্পকথক, তিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং বাদশাহ তাঁর পৌত্র সুমিতেন্দ্রনাথ। দাদামশাই ছারপোকার পিঠে চড়ে ভুবনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও-এ লেগে গুস্তিঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এই গুস্তিঘর যে কি পদার্থ তার উত্তর শ্রোতাদের কাছে দাদামশাই পরিষ্কার করেননি। পাঠকের কাছেও তা পরিষ্কার নয়। এখানে দুই নাককাটা মূর্তি এসে দাদামশাইর দুহাত দুদিক থেকে ধরে বলল—

'আমরা কিন্তু ধরেছি ঠিক। আপনি অবনীবাবু না হয়ে যায় না। শিল্প-প্রাণ, শিল্প-প্রদীপ, শিল্পাচার্য, আমরা আপনার—' এই বলে অবনীবাবুকে তারা অদ্ভুত সব সংগ্রহ দেখাতে লাগল। সেই উদ্ভট সংগ্রহশালাটি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক সামগ্রী বলেই তার একাংশ তুলে ধরে দেখানো যেতে পারে—

'—দেখেন, সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল-দাঁত
সিলোনে পাওয়া মাটির তলায়—পাঁচ হাত।
আমি বললেম। এটা কি ? যেন গুলে পোড়া শীতল পাটি।
—আজ্ঞে না, নটী বেহুলার মেখুলা মাটি।
—ওটা কি, শাঁখা ভাঙা নাকি ?
—লখিন্দরের মালাই-চাকি।
—কি একটা গজালের মতন ?
—লৌহদণ্ড মুনির দাঁতন।
—এটা বুঝি কাকের পালক ?
—আজ্ঞে না, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক।
—এটি কাঁচপোকার ডানা না ?
—আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষ্মণ সেনের পেলেট ভাঙা।
—এটা যে দেখি ভাঙা বোতল।
—আজ্ঞে না মশায়, সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল।
—ও যে পড়ল, একটা কাগজের চিরকুট ?

—আহা, উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোন একটুকু
করকোষ্ঠি ভাষায় লেখা—শুকে দেখেন,
লোধ-রেণুর গন্ধ পাবেন—অতাল্প খুব।

এখানে প্রচ্ছন্ন একটা বক্তব্য হয়তো চোখে পড়তে পারে, কিন্তু তা ঘোড়ার আক্কেল দাঁত, লখিন্দরের মালাইচাকি, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার পালকের দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের মধ্যে হাস্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এখানে এক একটি জিজ্ঞাসু প্রশ্নের অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব উত্তর দিয়ে হাস্যসৃষ্টির একটা কৌশল দেখিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে এ-জাতের হাস্যমুখর গল্প খুব কমই আছে।

অবনীন্দ্রনাথের 'বাদশাহী গল্পে'র সঙ্গে অধিকাংশ পাঠক যেমন পরিচিত নন, অনুরূপ নন 'রাসধারী' নামক চর্ভট্টি নাটকখানার সঙ্গে। রাসধারী বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের একক নাটক। রূপকথার একটা কাহিনী কি কৌশলে অসম্ভবের কল্পনার হাস্যকাহিনী হয়ে উঠতে পারে, রাসধারী তারও নজির। ক্ষীরের পুতুলের সঙ্গে এর কাহিনীগত ঐক্য রয়েছে। কিন্তু রচনারীতিতে ক্ষীরের পুতুল রূপকথা; রাসধারী উৎকল্পনার হাস্যকথা। ক্ষীরের পুতুলের যেমন বানরের সাহায্যে দুয়োরাণী সুয়োরাণী হয়ে উঠেছেন, এখানেও ভালুক ও রাস-ধারীর সাহায্যে দুয়োরাণী তাঁর সৌভাগ্য ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু যে পন্থায় এরা দুয়োকে সুয়ো করেছেন, সেই পন্থা অবলম্বনে রূপকথার শৈলী নেই। ক্ষীরের পুতুলের বানরের কৌশল, ষষ্ঠী ঠাকুরুণ, সুমেরুদেশ, সে-দেশের ছেলের মেলা, দুয়োরাণীর দুঃখ, সুয়োরাণীর ঐশ্বর্য ও ঈর্ষা—এ-সব শব্দ ও চিত্রকল্পের পরিকল্পনা দিয়ে লেখক প্রতিপদে রূপকথাকে বাঁচিয়ে চলেছেন। রাসধারীতে অনুরূপ রূপকথা বাঁচিয়ে চলাটা নেই। রাজ্যের সমস্ত সোনাকে মাছ-পাখি-প্রজাপতি করে উড়িয়ে দিয়ে, আর সোনাশূন্য রাজ্যের রাজ-মন্ত্রী-রাজপণ্ডিত ভাঁড়মশাই-কে সোনায় খাটো করার সঙ্গে সঙ্গে বহরে খাটো করে এক কিম্ভূত অবস্থা সৃষ্টি করে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাকে হাস্যরসে মুক্তি দিয়েছেন—

'রাজা—কই গোপাল, জোব্বাটা দাও না।

ভাঁড়—একি, মহারাজের গায়ে জোব্বাটা যে বড় ঢিলে হল।

মন্ত্রী—তাইতো, হাতদুটো যে মাটিতে লুটিয়ে যাচ্ছে।

পণ্ডিত—পশ্চাতের দিকে রাজবেশ যে ময়ূরপুচ্ছের মত লম্বমান রইল দেখি।

রাজা—একি ব্যাপার? আমি এত ছোট হয়ে গেলাম, এর মানে কি?

মন্ত্রী—তাই তো, মহারাজ তো আমাদের বড়ই ছিলেন।

পণ্ডিত—এ যে বামুন অবতারটি বোধ হচ্ছে।

রাজা—মন্ত্রী, শীঘ্র দর্জি ডাক, গজ এনে মেপে দেখ, আমার মনে হচ্ছে আমি ক্রমে ছোট হচ্ছি। বিলম্ব করছ কেন?

মন্ত্রী—মহারাজ, রাজার হুড়কোতে তো হাত যায় না, মনে হচ্ছে যেন আকাশে উঠে গেছে।

সকলে—তাই তো। আমরা সবাই যে হাতে বহরে খাটো হয়ে গেছি।

রাজা—এখন উপায় কি?

মন্ত্রী—আমার তো বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

পণ্ডিত—সভায় চলুন, বিচার বিতর্ক করে উপায় স্থির করা যাবে।

রাজা—এখন এসব থেকে বার হই কি করে? সভা তো দূরের কথা।

মন্ত্রী—তাই তো।

পণ্ডিত—এ যে আমরা পিঞ্জরের মধ্যে মায়ামৃগের মত বদ্ধ হলাম।

রাজা—গোপাল ভাঁড়, তুমি কি ঠাওরালে শুনি?

ভাঁড়—দেশে সোনা নেই, তাই আমরা খাটো হয়ে গেলাম।'

শেষ কথাটার যে প্রচ্ছন্ন তাৎপর্যটুকু ও খোঁচাটুকু রয়েছে তাকে অসম্ভবের সংস্থানের দ্বারা হাস্যময় করে তুলবারই শিল্পকৌশল লেখক আয়ত্ত করেছেন। ততোধিক চরিত্রগুলিও নাট্যগুণান্বিত হয়ে উঠেছে। রাজপণ্ডিত তাঁর শাস্ত্রানুশাসন ও ছুঁৎমার্গের সঙ্গে অর্থলোলুপতা নিয়ে, ভাঁড় মশাই অর্থলোলুপতার সঙ্গে তাঁর রসিকতা নিয়ে সবিশেষ নাট্যচরিত্রের মর্যাদা পেয়েছেন। নাট্যগুণে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে হাস্যকে প্রাণবন্ত করেছে।

এদের সঙ্গে 'খাজাঞ্চির খাতা', 'বুড়ো আংলা'র রসগত পার্থক্য লক্ষণীয়। 'খাজাঞ্চির খাতা', 'বুড়ো আংলা'—এই দুখানা গ্রন্থেও আজগুবি অদ্ভুত বহু কাহিনী—চরিত্র জড় হয়েছে, বাস্তব অবাস্তব, সম্ভব-অসম্ভব একসঙ্গে মিলেমিশে আছে। চেনা জগৎটার খাজাঞ্চি মশাই, সনাতন-সোনা-আঙ্‌টি, লালদিঘির সঙ্গে শিবঠাকুর, পিদুম হাতে পরীরা, ভুষুণ্ডি কাগামশায়—একাসনে বসেছে। বুড়ো আংলায় রিদয়ের বুড়ো আংলায় পরিণতি, ও নানা উদ্ভট দশা বিপর্যয় একত্র হয়ে এক অদ্ভুত রাজ্য গড়ে চলেছে। কিন্তু পূর্বেকার বাদশাহী গল্প, রাসধারী,

ভূতপতরীর দেশের মত এই দুখানা গ্রন্থ উৎকল্পনার হাস্যজগতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। তার কারণ এক্ষেত্রে লেখক অসম্ভব-অবিশ্বাস্য কিছু দিয়ে অসঙ্গতির হাস্যসৃষ্টি না করে আমাদের কল্পনাকে বহুদূরে এক স্বপ্নময় জগতে প্রসারিত করে দিতে চেয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হলে প্রত্যেকের মনের সিন্দুকে যে একটি করে লুকোনো দেরাজ আছে, একখানা সবুজ পাতা আছে, যার সন্ধান অনেকে বুড়ো হয়ে ঘরে গেলেও পায় না—অসম্ভবের সংস্থানের দ্বারা এই দুই গ্রন্থে সেই লুকোনো দেরাজ ও গুপ্ত খাতাখানার সন্ধান দিতে চেয়েছেন লেখক। তারই সন্ধানে খাজাঞ্চির খাতায় একতলার ওপরের জানালাপথে পাঠকমন উড়ে যাত্রার আসর ও গ্রীণরুম হয়ে জম্বুদ্বীপ শ্বেতদ্বীপের স্বপ্নলোকে যাত্রা করেছে। বুড়ো আংলায় আমতলি ছেড়ে মেঘনা নদীর মোহানা হয়ে হরিংঘাটা, গঙ্গাসাগর বাঁয়ে ফেলে, আসামের জঙ্গল, গারো পাহাড, খাসিয়া পাহাড় ডাইনে রেখে, ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁকে বাঁকে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতের উপর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলগিরির উত্তর গা ঘেঁষে সিধে পশ্চিমমুখে মানস সরোবরে আমাদের কল্পনা ডানা মেলেছে। আজগুবির স্বপ্নরাজ্যে কল্পনার এই অবাধ বিচরণের অনুকূলে এসেছে অবনীন্দ্রনাথের কবিত্ব। তাঁর গল্পের পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর কবিত্ব গল্প রচনার মধ্যে শ্যাম শোভময় মনোমুগ্ধকর এক একটা দ্বীপের মত অবস্থান করে পাঠকমনকে গল্পধারা থেকে বার বার বিচ্যুত করেছে। বস্তুত নালক, শকুন্তলা, খাজাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা প্রমুখ রচনায় অবনীন্দ্রনাথ কথার রসের মোহে পড়েছেন। বস্তুত এই মোহ, এই স্বপ্নময় জগৎ সৃষ্টি, কবিত্বের এই অকৃপণ উপস্থিতি অবনীন্দ্রনাথের অসম্ভব কল্পনার অন্যান্য রচনাকে উৎকল্পনার হাস্য জগতে উত্তীর্ণ হতে দেয়নি।

রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার প্রসঙ্গে বলেছেন—'তাঁর লেখাগুলো কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা পায়নি।'[৪] 'অবনীন্দ্রনাথের এই কখানা গ্রন্থও উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল কবিত্বের অঢেল বিস্তারের জন্যে তাতে উৎকাল্পনিকতার হাস্যরসের মাত্রা রক্ষা পায় নি। এই কবিত্বের জন্যই সমালোচক সংশয় প্রকাশ করেছেন, অবনীন্দ্রনাথকে ঠিক হাস্য-রসিক লেখক বলে বর্ণনা করা যায় কিনা।'[৫]

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'পুনশ্চ'র ভূমিকা।

৫. অজিত দত্ত—বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস।

অবনীন্দ্রনাথের 'বাদশাহী গল্প', 'রাসধারী', 'ভূতপতরীর দেশে'র সঙ্গে পরিচিত না হলে এই সংশয় একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। কিন্তু উক্ত তিনটি রচনায় তিনি হাস্যরসের সৃষ্টিতে অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। কল্পনার যথেচ্ছ বিহারকে কবিত্বলোকে ও স্বপ্নরাজ্যে বল্গাহীন মুক্তি না দিয়ে তাকে উৎকল্পনার হাস্যরসের সৃষ্টিকৌশলে আকর্ষণ করেছেন। কবিত্ব হাস্যরসকে তখনই আঘাত করে যখন তা হাসির মধ্যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে স্থান করে নিয়ে পাঠক মনে দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন সৃষ্টি করে চলে। সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল' কাব্যে কবিত্ব আছে কিন্তু তা হাসির অনুগামী হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথের উল্লিখিত রচনাত্রয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপটাই ঘটেছে। যথেষ্ট সচেতনতা নিয়ে তিনি যে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির শিল্পরূপকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন তা লক্ষ্য করবার মত। সৃজনশীল রচনায় চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকেই কথা বলবার মাধ্যমরূপে অবলম্বন করেছেন। নালক, শকুন্তলা, বুড়ো আংলা অপূর্ব চিত্রশালা। কিন্তু উৎকল্পনার সৃজনশীল উক্ত রচনাত্রয়ে তিনি চিত্ররীতিকে প্রাধান্য দেননি। কারণ তিনি সচেতন ছিলেন, ওপথে কবিত্বের অনুপ্রবেশ অবারিত হবে। সুতরাং তিনি এক্ষেত্রে প্রধানতঃ কথার রসের ওপর নির্ভর করলেন, দ্বিতীয়তঃ চিত্রের ওপর। যেমন বাদশাহী গল্পের উদ্ধৃত অংশটি। এক্ষেত্রে অদ্ভুত অনায়াস চমক দিয়ে অসঙ্গতি সৃষ্টি করেছেন। আর চমক সৃষ্টি করলেন এক একটি কথা অবলীলাক্রমে জুড়ে দিয়ে। তাতেই ফুটে উঠেছে লৌহদণ্ড মুনির গজালের মত দাঁতনের ছবি। লক্ষ্মণ সেনের কাঁচপোকার ডানার মত ভাঙা প্লেটের ছবি। এবং এই কথার ছবি ছয় থেকে ষাট বছরের মানুষকে সরব হাস্যে উচ্চকিত করেছে। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে বিশুদ্ধতার জগতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন কতিপয় শিল্পী। যে কজন পেরেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন।

সপ্তম অধ্যায়

[রাজশেখর বসু]

(১৮৮০-১৯৬০)

ত্রৈলোক্যনাথ কল্পনার অতিরঞ্জনের সাহায্যে যে প্রসন্ন উতরোল হাসির ধারা বাংলা সাহিত্যে এনে দিলেন, রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন, বাংলার বহু উল্লেখ্য সাহিত্য-ব্যক্তিত্বও সে-ধারাকে সমাদরে স্বীয় প্রতিভার মধ্যে অনুস্যুত করে নিয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে হঠাৎ বা ভুঁইফোঁড় বলে কিছু নেই। বিজ্ঞানের জগতে হাক্‌স্‌লে যেমন বলেছেন 'Chance and accident are alias of ignorance'—সাহিত্যের ইতিহাসেও দৈবাৎ বা হঠাৎ বলে কিছু বিশ্বাস করা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। ত্রৈলোক্যনাথের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের যে বিকাশ ঘটেছে, তার জন্য পরবর্তী স্রষ্টারা ত্রৈলোক্যনাথের কাছে ঋণী। উত্তর-সূরীদের রচনায় স্বাদাঙ্কুরের যে স্বাভাবিক বিভিন্নতা দেখা দেবে, তা একদিকে যেমন প্রতিভার স্বকীয়তার জন্য, অন্যদিকে সময়ের ব্যবধানের জন্য।

রাজশেখর বসু ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যধারাতেই রূপ ও রসের যোগান দিয়ে বাংলা সাহিত্যের উৎকল্পনার হাস্যরসের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন।

তিনি প্রধানত ও প্রথমত হাসির গল্পকার। তাঁর গল্পজগতে বিচিত্র হাসির স্বাদাঙ্কুর। ব্যঙ্গ-প্রেম-এর হাসির পাশেই রয়েছে বুদ্ধি উৎস মেজাজের হাসি, কথা নিয়ে যাদুখেলার হাসি, তারই সঙ্গে রয়েছে স্নিগ্ধ সজল হিউমারের হাসি, কৌতুকের সরব হাসির সঙ্গে সহাবস্থান করেছে উৎকল্পনার প্রসন্ন-নির্ভর উচ্চ হাসির গল্পমালা।

রাজশেখর বসু তাঁর প্রকাশিত গল্পের মধ্যে[১] ২৮টি গল্পে[২] কল্পনার এই হাস্যকর অসম্ভব খেলাকে রূপ দিয়ে উৎকল্পনার হাসিকে সাহিত্যমূল্যে গৌরবান্বিত করে তুলেছেন।

১, প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ও গল্প সংখ্যা :—১। গড্ডালিকা (১৩৩২) ৬, কজ্জলী (১৩৩৫) ৬, হনুমানের স্বপ্ন (১৩৪৪) ১০, গল্পকল্প (১৩৫৭) ১০, ধুস্তরীমায়া ইত্যাদি গল্প (১৩৫৯) ১২, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (১৩৬০) ১১, নীলতারা (১৩৬৩) ১৩, আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প (১৩৬৪) ১৫, চমৎকুমারী ইত্যাদি গল্প (১৩৬৫) ১৫।

২. উৎকেন্দ্রিকতার হাসির গল্প সংখ্যা :—গড্ডালিকা ১, কজ্জলী ৩, হনুমানের স্বপ্ন ৪, গল্পকল্প ৫, ধুস্তরীমায়া-৭, কৃষ্ণকলি-২, নীলতারা-২, আনন্দীবাঈ-২, চমৎকুমারী—২।

উৎকল্পনার হাসি রাজশেখরের গল্পে এসেছে দুটি ধারায়। প্রথম ধারায় ৮টি, দ্বিতীয় ধারায় ২০টি গল্প।

প্রথম শ্রেণীর (৮টি গল্পে) উৎকেন্দ্রিকতার হাসি এসেছে গল্পদেহের বহিরঙ্গ শিল্প-কাঠামো হয়ে। তলায় এসে পড়েছে ভার। বক্তব্যটাকে সরস করে বলতে গিয়ে উৎকেন্দ্রিকতার পরিবেশটা সৃষ্টি করেছেন। ফলে বেপরোয়া কল্পনার খেলা গল্পের বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে একটা সর্বব্যাপী বিশুদ্ধ হাসি সৃষ্টি করতে পারেনি। যেমন 'কজ্জলী'র 'উলটপুরাণ'; 'হনুমানের স্বপ্নে'র 'দশ-করণের বাণপ্রস্থ'; 'নীলতারা'র 'নিধিরামের নির্বন্ধ'; 'ধুস্তরীমায়া'র 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'গল্পকল্প'র 'গামানুষ জাতির কথা', 'রামরাজ্য' এবং 'তিনবিধাতা'। 'উলটপুরাণ'-এ ভারতের বুকে ইংরেজ অধিকারের ইতিহাসটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে ইংলণ্ডের বুকে ভারত সরকারের রাজত্ব কল্পনা করে উৎকেন্দ্রিক কল্পনার অসঙ্গতিকর হাস্যের কাঠামো সৃষ্টি করেছেন। এই উৎকল্পনার ছদ্মবেশের তলে ভারতের ওপর ব্রিটিশের শোষণ চিত্র দেখিয়েছেন, টার্নকোট-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশপ্রেমের ভণ্ডামিকে পরিহাস করেছেন। উৎকেন্দ্রিকতার কাঠামোর তলে বক্তব্যের এই ভার স্পষ্ট উপলব্ধ। 'দশকরণের বাণপ্রস্থ' গল্পে উৎকেন্দ্রিকতা এসেছে দশকরণ এবং ব্রহ্মার কথোপকথনে। কিন্তু এর তলে জীবননীতি ও আত্মা-ইন্দ্রিয়ের গভীর কথা এসেছে। বিশেষ করে গল্পের শেষ অংশে বক্তব্যের গভীরতার কাছে সকল রকম তরলতা ও হাসি স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিধিরামের 'নিবন্ধ'-এ মৃত্যুর পর বিধাতার সঙ্গে নিধিরামের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উদ্ভট বাতাবরণটির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দুজনের আলাপের মধ্য দিয়ে দেশকল্যাণের পন্থা নির্দেশে, মানব চরিত্রের শোধনের পন্থা নির্দেশে একটি প্রবন্ধের মেজাজ সৃষ্টি হয়েছে। 'রামরাজ্য'-এ উৎকল্পনার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন প্রেতচক্রের বৈঠকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু পবননন্দন শ্রীহনুমানকে ডেকে এনে গণতন্ত্র দিয়ে একটি লঘু প্রবন্ধের অবকাশ সৃষ্টি করেছেন। 'গামানুষ জাতির' উদ্ভট কল্পনার তলে বিশ্বের যুদ্ধোন্মুখ শক্তিবর্গের রাষ্ট্রনীতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে একটি গভীর প্রবন্ধের অবকাশ। 'গন্ধমাদন বৈঠক'-এ উৎকেন্দ্রিকতা এসেছে অপ্রত্যাশিত একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি কৌশলে। 'পুরানে সাতজন চির-জীবির নাম পাওয়া যায়—অশ্বত্থামা বলির্ব্যাসোহনুমাংশ্চ বিভীষণঃ, কৃপপরশুরামশ্চ সপ্তৈতে চিরজীবিনঃ। এরা একবার একত্র হয়েছিলেন।' গল্পের উদ্ভটতা এই সাত

চিরজীবীর একত্র মিলন ঘটনা। কিন্তু তাঁদের আলোচনা বৈঠকে ধর্ম-যুদ্ধ-রাষ্ট্র নিয়ে একটা প্রবন্ধের বীজ উপ্ত হয়েছে। 'তিন বিধাতা' গল্পে একদিন ব্রহ্মা, গড এবং আল্লাকে এবং এক পীরকে হিন্দুকুশ পর্বতে সমবেত করে রাজশেখর বসু কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার কাঠামোটা রচনা করেছেন। তিন বিধাতার এই সমবেত হওয়ার কারণ—বিশ্বশান্তি, মানবনীতির জন্য ঐশ্বরিক লেভেলের 'টক' বসানো। কিন্তু এই ঐশ্বরিক লেভেলের টক-এ তিন বিধাতার মধ্যে ধর্মমতের পারস্পরিক খাওয়া-খাওয়ি ও মতের আরোপণ করার উদ্ভট দৃশ্যটি দেখিয়ে রাজশেখর উচ্চস্তরের আলোচনার প্রহসনরূপটি তুলে ধরেছেন।

রাজশেখরের এই শ্রেণীর গল্প থেকে উৎকল্পনার বহিঃ কাঠামোটি তুলে নিলে প্রাঞ্জল সরস বাক্‌বিভূতির এক একটি রচনা বেরিয়ে পড়বে।

রাজশেখরের উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যরসের আঠাশটি গল্পের মধ্যে এই কয়টি গল্পে তাঁর শিল্পিমানসের গভীর সত্তার সঞ্চরণ ঘটেছে। এবং আরও একটু তলিয়ে দেখলে সমাজ ও জীবনের ওপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দূরপ্রসারী প্রভাব রাজশেখরের শিল্পিমনকে যে কিভাবে আলোড়িত করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'নিধিরামের নির্বন্ধ', 'গন্ধমাদন বৈঠক', 'গান্ধানুষ জাতির কথা', রামরাজ্য', 'তিন বিধাতা'—এই গল্প কটিতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর শিবিরবিভক্ত এবং মারণাস্ত্রসঙ্কুল শক্তিবর্গের রাষ্ট্রনীতি, মানবনীতি, বিশ্বশান্তি স্থাপনের চেষ্টার প্রহসনরূপ এই পাঁচটি গল্প। মনের যে কোটিতে রাজশেখর বসু গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় পীড়িত সে-কোটির প্রকাশ ঘটেছে উৎকেন্দ্রিক কাঠামোর এই কটি গল্পে। ফলত বিশুদ্ধ হাসি এই গল্পগুচ্ছে নেই।

এই শ্রেণীর অন্তর্গত আরেকটি গল্প রয়েছে—'ষষ্ঠীর কৃপা'। অসম্ভব উদ্ভট কল্পনা এর বহিরঙ্গ হাস্যকাঠামোকে রচনা করেছে। ভেতরে রয়েছে চোখের জল, একটা তীক্ষ্ণ ও বেদনার্ত বক্তব্য। ঘর আলো করে মা ষষ্ঠীর আবির্ভাব, মানবী রূপ ধরে বেড়ালের মানবশিশু পালন, এবং গৃহস্বামীর বেড়ালে রূপান্তরের ঘটনা—এ সবই গল্পটির হাস্যকর উদ্ভট আবরণ রচনা করেছে। কিন্তু তার তলায় রয়েছে, উন্মত্ত যৌন-লালসাময় এক শিক্ষিত মমতাহীন স্বামী কি করে বছরে বছরে সন্তান দিয়ে নারীত্বের ও মাতৃত্বের নির্মম হন্তা হয়ে উঠতে পারে, তার অশ্রুভরা কাহিনী। বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বে এ-গল্পটি স্মরণ করিয়ে দেয় Maupassant-র 'Vain Beauty' গল্পকে। 'Vain Beauty'-তেও স্বামীর

শিথিল যৌনলালসা বছরে বছরে সন্তান দিয়ে মাতৃত্বের বুকভরা মাধুর্যকে, নারীত্বের শান্তি ও নারীর প্রতি পুরুষের ভালোবাসাকে ক্লেদাক্ত করে তুলেছে। বাইরে যখন জগৎটা হেসে খেলে চলেছে, সূর্যস্নাত গীর্জায় যখন আরাধনার ঘণ্টা বাজছে, গ্রামে সহরে ঋতুচক্রের বিচিত্র আবর্তন অনুভূত হচ্ছে, গল্পের নারী Countess de Mascaret তখন স্বামীর যৌনকামনার অনাকাঙ্ক্ষিত একাদশ সন্তানকে লালন করছেন, এবং দ্বাদশ সন্তানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। স্বামীর ভালোবাসাকে, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য, অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য, স্ত্রীসত্তাকে বাঁচাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন Countess de Mascaret :—"No, but I will no longer be the victim of the hateful penalty of maternity, which you have inflicted on me for eleven years! I wish to live like a woman of the world, as I have the right to do, as all woman have the right to do."

বিদ্রোহিনী স্ত্রী এক ভয়াবহ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রেমকে বাঁচালেন, মাতৃত্বকে বাঁচালেন। গল্পের শেষটা এক আলোকিত মুক্তির আনন্দে বিকশিত। রাজশেখরের ষষ্ঠীর কৃপা' গল্পের বিষয়-বক্তব্য একই। তবে এ-গল্পে নারীমনের এই বিদ্রোহ নেই, এবং মত্ত লালসার দুর্গন্ধ গহ্বরটার ওপর সূর্যালোকপাত নেই। রয়েছে লালসার কাছে এক অসহায় নারীর সমর্পিত মৃত্যু।

তথাপি রাজশেখরের সামাজিক মন উৎকল্পনার কাঠামোর অন্তরালে এ-গল্পে গভীর হয়ে যে ধরা দিয়েছে, তা সত্য। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের উপায় গ্রহণে শিক্ষিত অশিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষের অজ্ঞতা ও অনিচ্ছার ফল যে কী নির্মম হয়ে দেখা দিতে পারে, রাজশেখরের বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন সেই সত্যকে এই গল্পসৃষ্টির মধ্যে ব্যথা ও কারুণ্যে তুলে ধরেছে।

ষষ্ঠীর কৃপা' গল্পটি রাজশেখরের করুণ-হাস্যের এক শ্রেষ্ঠ গল্প।

রাজশেখরের এই শ্রেণীর আটটি গল্পের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের অমিল রয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকেন্দ্রিকতার হাসির গল্পে কোথাও বহিরঙ্গভঙ্গী হয়ে উৎকেন্দ্রিক কল্পনা আসেনি। তাঁর হাস্যসৃষ্টিতে প্রায় সর্বত্রই ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সমাজটার কথা, মানুষের ধর্ম, সংস্কারের বিকারের কথা। কিন্তু এ সবকে তিনি গল্পের অন্তরঙ্গ বক্তব্য করে তাকে উৎকেন্দ্রিকতার ছদ্মবেশ দিয়ে ঢেকে কোথাও যে প্রকাশ করেন নি, একথা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন।

পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার গল্পের বেপরোয়া হাস্যের ফলশ্রুতির মধ্যে সর্বত্রই সামাজিক পরিচয়টুকু স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে হাস্যলীন হয়ে পড়েছে। রাজশেখরের মধ্যে উৎকল্পনার হাস্যের এ-পরিচয় রয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর গল্পে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর এই আটটি গল্পের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিভেদটি স্পষ্ট।

তবে রাজশেখর বসুর এই শ্রেণীর উৎকল্পনার বহিঃ কাঠামোর অন্তর্গভীর গল্পের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বকথিত, 'হনুমদ্বাবুসংবাদ', 'বৃহল্লাঙ্গুল' জাতীয় গল্পের, অথবা Swift-এর উদ্ভট কাঠামোর অন্তর্গভীর Gulliver's Travel গ্রন্থেরও বিভেদ রয়েছে। কি বঙ্কিম, কি Swift এঁরা উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে বক্তব্যকে সহাস্য সরস করবেন বলে উদ্ভট কাঠামোটি আদৌ রচনা করেন নি। আঘাতের চাবুকটা ধরবার হাতল ওটা।

রাজশেখর বসুর উৎকেন্দ্রিকতার এই শ্রেণীর গল্পের তলে বক্তব্যের ভার, ইঙ্গিত, কটাক্ষ, এসেছে সত্য। কিন্তু তা এসেছে কান্তাসম্মিতিতে। বক্তব্যের ভার ও ধারের মধ্যে যাতে কিছু হাস্যরস সঞ্চারিত হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি উৎকেন্দ্রিকতার কাঠামোটির বিন্যাস করেছেন। শোধন বা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি ব্যস্ত উন্মুখ নন। ধর্ম রাষ্ট্র, স্বদেশ, সমাজ, মানবকল্যাণ, বিশ্বকল্যাণ—এ সবের বিকার, বিকৃতি, ভণ্ডামি, নষ্টামি তার সমাজনিবিষ্ট মনটাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিয়েছে। কিন্তু তার ওপর বিদ্রূপের কষাঘাত না হেনে, পরন্তু তা নিয়ে পরিহাস করবার জন্য তাঁর খেয়ালী মনটা কলম ধরেছে। ফলতঃ উৎকেন্দ্রিকতার এই বহিরঙ্গ কাঠামোর গল্পকটি রসিকতার বাইরে কোনোরকম ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জ্বলে উঠতে পারেনি। বঙ্কিমের এই শ্রেণীর গল্পের সংলাপ হাস্যের আস্তরণ ভেদ করে গায়ে কেটে বসেছে। রাজশেখরের উদ্ভট কাঠামোর গল্পের সংলাপ তীব্র উজ্জ্বল কিন্তু তা ক্ষত সৃষ্টি না করে হাসির আলোয় চোখ খুলে দেয়, ধিকৃত, বিকৃত, অপরাধী চেহারাটা সম্মুখে এনে দেয়। বিশেষ মানুষ বা শ্রেণীমানুষ যদি হাসতে গিয়ে লজ্জা পান, যথেষ্ট। না পেলেও রাজশেখর সংস্কার সাধনের ব্যর্থতায় উৎকণ্ঠিত নন।

বস্তুত রাজশেখর বসু পরশুরাম হলেও কোথাও তিনি কুঠার হাতে সমাজ বা মানুষ বা রাষ্ট্র ধর্মের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে আঘাত করে সংস্কার করবার জন্য অবতার হয়ে দেখা দেননি। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির বাইরে তাঁর যে বিচিত্র

হাস্যরসের পৃথুল গল্পজগৎ রয়েছে, সেক্ষেত্রেও এ মন্তব্য যেমন সত্য, উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যের ক্ষেত্রে এ-মন্তব্য নিঃসন্দেহে সত্য। 'পরশুরাম' নামটির মধ্যে তিনি যে তাঁর শিল্পিসত্তাকে স্বরূপে খুঁজে পেয়েছিলেন, সে কথাও সত্য নয়। তার প্রমাণ তিনি দ্বিতীয় রচনার প্রকাশকালেই এই ছদ্মনামটা পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। যে নামটি নিয়ে পিতৃদত্ত নাম গোপন করে সাহিত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আরেকদিন মহাভারত থেকে 'উপরিচর বসু' নামটি নিয়ে 'পরশুরাম' নামটি বাতিল করতে উৎসাহী হলেন।[৩] 'উপরিচর' নামের মধ্যেই তাঁর শিল্পিমানসের যথার্থ স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত। 'উপরিচর বসু' মর্ত্যের শক্তিশালী জীবন-প্রেমিক রাজা ছিলেন। স্ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্তীমালা এবং যষ্টি উপহার পেয়েছিলেন, সেই বিমানে চড়ে তিনি আকাশে বিচরণ করতেন বলে 'উপরিচর' বলে খ্যাত।[৪]

রাজশেখর বসুর বিজ্ঞাননিষ্ঠ মন তাঁকে যুক্তি বিচারের পথে মর্ত্যচারী করেছে। কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে হাস্যসৃষ্টির যে অপূর্ব শিল্পরথখানা তিনি পেয়েছেন, তাতে চড়ে মাঝে মাঝেই তিনি সমাজ ও জীবনটার উপরিস্তরে বিচরণ করতেন। সমাজটা ও জীবনটার অবুদ্ধি ও দুর্বুদ্ধি দেখে ওপর থেকে তার ওপর হাসি ছড়িয়ে দিতেন। হাসি ছড়িয়েছেন কখনও সংলাপের প্রাঞ্জল সরসতার মধ্য দিয়ে, মন্তব্যের চমৎকারিত্বের মধ্য দিয়ে, কখনও ইঙ্গিত কটাক্ষ করে, কখনও উদ্ভট অসম্ভব কল্পনার কাহিনী চরিত্র সৃষ্টি করে। শিল্পীর এই উপরিচরতার জন্যই আঘাত ব্যঙ্গ উপস্থিত হলেও কোথাও তা জখম করবার জন্য মারমুখো হয়ে উঠতে পারেনি। শিল্পীর এই নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির সঙ্গে লীন হয়ে আঘাত ব্যঙ্গ তীব্র জ্বালাময় হয়ে ওঠেনি। হাস্যস্রষ্টা রাজশেখর বসু আপন শিল্পিমানসের এই বিশেষ প্রবণতা ও চরিত্র সম্বন্ধে যখনই সচেতন হলেন, 'উপরিচর বসু' নামটি গ্রহণ করে 'পরশুরাম' নামটি বাতিল করলেন। 'উপরিচর বসু' নামটি রাজশেখর বসুকে তাঁর হাস্যসৃষ্টির প্রতিভার স্বভাব ধর্মের দিক থেকে যথার্থ মানিয়েছিল। সেদিক থেকে 'পরশুরাম' নামটি হাস্যপ্রতিভার পক্ষে বেমানান। তবু যে 'পরশুরাম' নামটি রয়ে গেল তার

৩. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য শ্রীরাজশেখর বসু, 'কথাসাহিত্য', রাজশেখর বসু সম্বর্ধনা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬০।

৪. সুধীরচন্দ্র সরকার—পৌরাণিক অভিধান।

পেছনে শিল্পিমনের সায় নেই, রয়েছে বহুলোকের অনুরোধ। বহুলোকের অনুরোধেই 'পরশুরাম' নামটি রাজশেখর বাতিল করতে পারেন নি! রাজশেখরের সহাস্য রসে রবীন্দ্রনাথও পরশুরামের কুঠার-এর আঘাতের তীব্র দহন, তীক্ষ্ণ আঘাতের রক্তপাত ও জ্বালা, নিধন যজ্ঞের মত্ততা লক্ষ্য করেননি। ১৯২৫-এর প্রবাসীতে তিনি লিখেছিলেন, 'পিতৃদত্ত নামের উপর তর্ক চলে না। কিন্তু স্বকৃত নামের যোগ্যতা বিচার করিবার অধিকার সমালোচকদের আছে। পরশুর অস্ত্রটা রূপধ্বংসকারীর, তাহা রূপসৃষ্টিকারীর নহে। পরশুরাম নামটা শুনিয়া পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে যে, লেখক বুঝি ধ্বংস করিবার কাজে প্রবৃত্ত। কথাটা একেবারেই সত্য নহে।...মানুষের অবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধিকে লেখক তাঁহার রচনায় আঘাত করিয়াছেন কিনা, সেটা তো তেমন করিয়া আমার নজরে পড়ে নাই।'

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রতিধ্বনি রয়েছে যেখানে তিনি স্বয়ং তাঁর পরশুরাম এই স্বকৃত নামের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।[৫]

হাস্যস্রষ্টা রাজশেখর তাঁর শিল্পিমানসের এই—'উপরিচরত্ব' ও নির্মোহতার ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিস্বভাবের উত্তরসাধক। এই দৃষ্টিভঙ্গী দুজনার হাসিতেই প্রসন্নতা সম্পাদন করেছে। দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর—কারও পক্ষেই প্রধান স্যাটায়ারিষ্ট হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

উৎকল্পনার দ্বিতীয় ধারার ২০টি গল্পে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গে উৎকল্পনার বিশুদ্ধ হাসি সঞ্চারিত হয়েছে। এই ২০টি গল্পকে কয়েকটি গুচ্ছে বিভক্ত করা যেতে পারে। একগুচ্ছে রয়েছে 'ভুশণ্ডীর মাঠে', 'বদন চৌধুরীর শোকসভা'। এখানে ত্রৈলোক্যনাথের মতই তিনি পরিচিত জগৎ ও জীবন নিয়ে উৎকল্পনার জগতে উড্ডীন হয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের মতই এসব গল্পে সমাজ সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, সামাজিক মানুষের বিচার বিকৃতি সম্পর্কে ইতস্ততঃ একটু ইঙ্গিত কটাক্ষ এসে পড়েছে। কিন্তু একদিকে স্বভাবের নৈর্ব্যক্তিকতা, আরেক দিকে কল্পনার চরম উদ্ভটতা—এই দুয়ের মধ্যে বিন্যস্ত করে ইঙ্গিত কটাক্ষকে আঘাতহীনতায়, ভারহীনতায় এবং সামঞ্জস্যে সহাস্য করে তুলেছেন।

৫. 'পরিহাস ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নিয়ে লিখিনি। কখনও কোন লোককে লক্ষ্য করে আক্রমণের জন্য কিছু লিখিনি।'—শ্রীরাজশেখর, শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কথাসাহিত্য, সম্বর্ধনা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৮।

প্রথম শ্রেণীর আলোচিত ৮টি গল্পের সঙ্গে এই জাতের গল্পের প্রভেদ হচ্ছে এই যে, পূর্বের ৮টি গল্পে উৎকল্পনা এনেছেন বক্তব্যকে প্রকাশের বহিরঙ্গ শিল্পকলা করে, অনেকটা রূপক করে। কিন্তু এই গুচ্ছের গল্পে উৎকল্পনা বহিরঙ্গ স্টাইল হয়ে আসেনি। কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতা দিয়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দ হাসি সৃষ্টি করাই লেখকের লক্ষ্য। ইঙ্গিত কটাক্ষ বা বক্তব্য তার মধ্যে এসে পড়ে লীন হয়ে গেছে। এখানে রূপক নেই, সবটাই রূপ। মাধ্যাকর্ষণহীন জগতে যেমন ভারীবস্তুও পালকের মত নির্ভার, কল্পনার উদ্ভটতার হাস্যের মধ্যে পড়ে যে কোন বক্তব্যের ভার শোলার মত লঘুত্ব লাভ করে। এইজন্যই ত্রৈলোক্যনাথের মত রাজশেখরের উৎকল্পনার এই জাতের গল্পে যেখানে ইঙ্গিত কটাক্ষ বা বক্তব্য কিছু এসেছে তা সামঞ্জস্যের উচ্ছ্বসিত হাস্যফলশ্রুতি রচনা করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথের মতই উৎকল্পনার হাসি রাজশেখর বসু সৃষ্টি করেছেন কখনও অশরীরী সত্তার ওপর মানুষের আচরণ, কামনা-বাসনা, সুখদুঃখ, মিলন-কলহ আরোপ করে। যেমন 'ভুশণ্ডীর মাঠে'। ভূতের মুখে রামনাম চির অবিশ্বাস্যের প্রবাদে দাঁড়িয়েছে। রাজশেখর ভূতের মুখে পদাবলী শুনিয়ে, খোট্টাভূতের মুখে দেশআলি গান শুনিয়ে, পাখোয়াজের একটি সুপরিচিত বোল যক্ষের মুখে শুনিয়ে এবং ফাল্গুনের মন্দনিলে ব্রহ্মদৈত্য শিবুর বিরহ এবং ডাকিনীর প্রতি তার প্রেমার্তি জাগিয়ে আমাদের ভূত-বিশ্বাস নিয়ে হাস্যকর অবিশ্বাসের হাসি সৃষ্টি করেছেন। রাজশেখরের এই ভূত-কল্পনা ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করেছে। ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু', 'নয়নচাঁদের ব্যবসা', 'বীরবালা', 'কঙ্কাবতী'র ভূত-পেত্নী-ডাকিনীর কল্পনাও ভূত সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস সংস্কারকে অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্যের আঘাতে ওলট পালট করে দিয়ে হাসি উচ্চ ও অবারিত করেছে।

এ-গল্পে উৎকল্পনার হাসিকে উচ্ছ্বসিত করতে গিয়ে অন্যান্যদের মত রাজশেখর বসুও উদ্ভট চমকসৃষ্টির কৌশল গ্রহণ করেছেন। পাঠকমনে প্রথমে স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সংস্কারের একটা আবহ সৃষ্টি করে তার ওপর একটা উদ্ভট চমক এনে তাকে ওলট পালট করে উৎকল্পনার হাসিকে তরঙ্গায়িত করেছেন। পেনেটি গ্রামের শিবু ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী নৃত্যকালীর দাম্পত্য জীবনের কলহ, বিরাগ, মিলন, অনুরাগের চিত্র এঁকে, শিয়ালদহ, কালিঘাট, শিবুর ওলাওঠা, শিবুর মৃত্যু, নৃত্যকালীর কান্না—এসব দিয়ে বিশ্বাস্য ও পরিচিত একটা গল্পপট তৈরি করে

লেখক তার ওপর ভুশণ্ডীর মাঠের উদ্ভট চমক হানলেন। পাঠক ভুশণ্ডীর মাঠে গিয়ে দেখল, পেনেটির শিবু ভট্টাচার্যই ব্রহ্মদৈত্য হয়ে এখানে বাসা নিয়েছে এবং তার বঞ্চিত শূন্যহৃদয় প্রেমনিবেদনে ব্যাকুল। লেখক দ্বিতীয় চমক হানতে প্রস্তুত হলেন। এক ডাকিনীর সঙ্গে শুক্লপক্ষের চতুর্দশীয় জ্যোৎস্নায় শিবুর পরিণয় হবে। সেই শুভক্ষণ যখন এল, চতুর্দিক যখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় প্লাবিত, ব্রহ্মদৈত্যের শূন্যপ্রাণে যখন পূর্ণতা আসন্ন, লেখক সেই শুভক্ষণে ডাকিনীর ঘোমটা সরিয়ে কেবল পাঠককে নয়, ব্রহ্মদৈত্যকে পর্যন্ত হতচকিত করে দিলেন। শিবু দেখল ঘোমটার আড়ালে ডাকিনী আর কেউ নয়, তারই মানবজন্মের গৃহিণী নৃত্যকালী। শিবু যখন প্রকৃতিস্থ হল, সেই ক্ষণে শেষচমক হানলেন গল্পস্রষ্টা। শিবুর ওপর তার তিন জন্মের তিন পত্নীর, এবং নৃত্যকালীর ওপর তার তিন জন্মের তিন স্বামীর অধিকারের নিদারুণ কলহ আনলেন। রাজশেখরের কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা এই ত্র্যহস্পর্শ-যোগ সৃষ্টি করে ভুশণ্ডীর মাঠে ভূত পেত্নীদের মধ্যে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প সৃষ্টি করে দিল, আর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে নারীত্ব ও সতীত্ব নিয়ে যে বিতর্ক প্রবল হয়ে উঠেছিল, তাকে একটি ভৌতিক সমস্যা করে পাঠকের রসচেতনায় উচ্চহাসির কোলাহল সৃষ্টি করল। গল্পের শেষে ভুশণ্ডীর মাঠের দাবানল শান্ত করতে তিনি ডেকেছেন শরৎ চাটুজ্জে ও চারু বাঁড়ুজ্জে, নরেশ সেন ও যতীন সিংহকে। এই সাহিত্যপ্রবরগণ সেদিন নারীত্ব, সতীত্ব, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা নিয়ে যে তর্ক সৃষ্টি করছিলেন, রাজশেখর তার ওপর হাসি বর্ষণ করেছেন। কিন্তু কল্পনার এহেন উদ্ভট হাস্যমুখর পরিবেশটার মধ্যে ইঙ্গিতটুকু লীন হয়ে পড়ায় হাসির কোলাহল থেকে তা স্বতন্ত্র হয়ে কোথাও নজরে পড়তে পারে নি। যেমন নজরে পড়তে পারেনি ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু' ভূতের হাস্যকাহিনীর মধ্যে পত্রিকা সম্পাদকের কথা। পত্রিকা-সম্পাদকের মতই শরৎবাবু, চারুবাবু প্রভৃতি 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র উদ্ভট কল্পনাশক্তির হাসিতে প্রসন্ন মনে যোগ দেবেন। আর সেখানেই রাজশেখর বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ উভয়ের কেউই স্যাটারিষ্ট না হয়ে উৎকল্পনার বিশুদ্ধ হাস্যের স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন।

'ধুস্তুরী মায়া' গ্রন্থের 'বদন চৌধুরীর শোকসভা'য় রাজশেখর বসু আরেকবার ভূত নিয়ে উৎকেন্দ্রিকতার উচ্চহাসি সৃষ্টি করলেন।

মর্ত্যে আয়োজিত পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় রৌরব নরক

থেকে বদন চৌধুরীর ভূতকে এবং রৌরব নরকের 'খ' বিভাগ থেকে বদন চৌধুরীর প্রতিদ্বন্দ্বী 'কালকেতু' সম্পাদক ঘনশ্যাম ঘোষালের ভূতকে নামিয়ে এনে উৎকেন্দ্রিকতার উচ্চহাসি সৃষ্টির ভূমিকাটি প্রস্তুত করলেন। শোকসভায় লোক সমাগম হয়েছে। সভাপতি গোবর্ধন মিত্র, অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ, প্রধান বক্তা প্রবীণ অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী। বদন চৌধুরীর ভূত প্রধান বক্তার পিছনে, এবং ঘনশ্যামের ভূত সভাপতির পিছনে এসে দাঁড়ালেন। যমদূত কাকজঙ্ঘ এবং ভৃঙ্গরোল নিজ নিজ ভূতের কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াল। সভার কাজ সঙ্গীত ও কবিতাপাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হল। রাজশেখর বসু প্রস্তুত হলেন তাঁর উদ্ভট চমক সৃষ্টির কৌশল নিয়ে। সভাপতি তাঁর ভাষণটি পড়বার উপক্রম করলেন। এমন সময় ঘনশ্যামের ভূত তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন। যমদূত ভৃঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম জেঁকে বসলেন। ফল যা হল তা শোকসভায় প্রলয় সৃষ্টির অনুকূল। শোকসভায় বদন চৌধুরীকে প্রশংসা করতে এসে সভাপতি তার শ্রাদ্ধ করলেন,—বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতাম। যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন সে নিজের ঢাক নিজে পিটেছে। এখন সে মরেছে, তবু আমরা রেহাই পাইনি।...বদন স্বর্গে যায়নি। নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর ছ্যাচড় হারামজাদা লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর এ্যাসেম্‌ব্লিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে। পারমিটে আর কালোবাজারের লক্ষ লক্ষ টাকা—

'বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাকজঙ্ঘকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি' প্রধান বক্তার 'শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে এনে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মাননীয় সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ হয়ে নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদনচন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়াস কাগজী গুণ্ডা কালকেতু-সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গো-বেচারা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে—'

শোকসভায় দুই প্রেতের তাণ্ডবে 'ভুশণ্ডীর মাঠে'র মত দাবানল, জলস্তম্ভ, ভূমিকম্প শুরু হল। 'এই সময় দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র ও অঙ্গিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বললে, বেরিয়ে এস শীগ্‌গির, দু'ঘণ্টা কাবার হয়েছে। দুই প্রেতাত্মা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল, যমদূতেরা তখনই তাঁদের নিয়ে উধাও হল।'

এই উদ্ভট গল্পের মধ্যে আমাদের সুপরিচিত সামাজিক চিত্রটার ওপর কোনরকম ইঙ্গিত ব্যঙ্গের ছায়াপাত যদি কেউ লক্ষ্য করে থাকেন, পূর্বকথিত শিল্পীর প্রবল নৈর্ব্যক্তিতার সঙ্গে এবং উৎকল্পনার মৌলিকতার অনিয়ন্ত্রিত হাসির সঙ্গে তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে হাসির কল্লোলের তলে ইঙ্গিত, ব্যঙ্গের ধার বা বক্তব্যের ভার অনুভূত হতে পারেনি। বস্তুত উৎকল্পনার হাস্য-স্রোতে অশ্রু-ইঙ্গিত-ব্যঙ্গ পীড়ন এসে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তা উদ্দাম হাস্যেরই ফলশ্রুতি রচনা করে স্বতন্ত্র চেহারা হারিয়ে ফেলে। এর পশ্চাতে কাজ করে— শিল্পীর মানস গঠনের নির্মোহ প্রসন্নতা। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর উদাহরণ, রাজশেখর উদাহরণ।

'হনুমানের স্বপ্নে'র 'মহেশের মহাযাত্রা' ভূত নিয়ে তাঁর তৃতীয় গল্প। কিন্তু এ-গল্পে রাজশেখর হাসি সৃষ্টি না করে একটা ভীতি-সঞ্চারী ভৌতিক গল্পই সৃষ্টি করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর দুজনের হাসির জগতেই ভূতসমাজ মানব-সমাজের অনুকূল গুণদোষ, কামনা-বাসনা অনুকরণ করে হাস্যকর কল্পনার উৎস হয়ে রয়েছে। ভূত নিয়ে হাস্যকর কল্পনার খেলা খেলতে গিয়ে দুজনেই ইতঃস্তত ইঙ্গিত কটাক্ষ করেছেন। ত্রৈলোক্যনাথ দেখিয়েছেন ভূতরা কখনও কখনও মানুষের রূপ ধরে মানবসমাজে ঘুরে বেড়ায়। রাজশেখরের হাসির রাজ্যেও ভূতেরা কেরাণী, দোকানী, মজুর বা আর কিছুর রূপ ধরে মানবসমাজে মিশে আছে। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যজগতে ভূতসমাজ একটা বিশেষ স্বভাবে স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথে ভূত ও মানুষ প্রতিবেশীর সম্পর্কে সম্পর্কায়িত। কেবল তারা ভূত বলে মানুষের ঘরের বাইরে অন্ত্যজ হয়ে গর্তে, গাছে, পুরোন কুয়োয় ভীমতলের জলের নীচে বাস করে। তাদের সম্মান দিয়ে, সহৃদয় হয়ে তাদের ডাক দিলে তারা গোপন স্থান থেকে উঠে এসে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। মানুষের স্ত্রী হারানোর দুর্ভাগ্যের, আত্মীয় হারানোর ব্যথায় তারা সমব্যথী। যথাসাধ্য চেষ্টায় তারা স্ত্রী-উদ্ধারে, আত্মীয়-উদ্ধারে সাহায্য করে আনন্দিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার হাস্যজগতে মানুষের সঙ্গে ভূতের একটা হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছে। মানুষ আহত ভূতের সেবা করে, ভূত মানুষের সেবা করে। ভূত ও মানুষ পাশাপাশি শুয়ে চণ্ডু টানে। রাজশেখরের হাসির জগতে ভূত ও মানুষের এই হৃদয়ের যোগস্থাপনটি নেই।

রাজশেখর ভূত নিয়ে হাসিয়েছেন কিন্তু ভূতকে সুনজরে দেখেননি—'দেবতারা হচ্ছেন উদার প্রকৃতি দিলদরিয়া, কেউ তাদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে, ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন।' (মহেশের মহাযাত্রা)। ভূতকে না মানলে, ভূতকে খাটো করলে ভূতের যে অপমান হয়—ভূতসমাজের এই সেন্টিমেন্টকে রাজশেখর বোঝেন নি। ইংরেজী সাহিত্যে লুই ক্যারল ভূতদের এই সেন্টিমেন্ট বুঝেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথও বুঝেছিলেন। তিনি ভূত ও মানুষের সমাজের মধ্যে একটি সহৃদয়তার সেতু গড়ে দিয়েছেন।[৬] বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের এই চালটি স্বকীয় চাল, এবং তা তুলনারহিত।

রাজশেখরের হাস্যজগতে আন্তর্ভারত ভূতসমাজের সহাবস্থান। বাঙালী ব্রহ্মদৈত্য শিবু বা যক্ষের সঙ্গে বিহারীভূত কারিয়া পিরেত সঙ্গীতাসর বসিয়েছে। বাঙালী পেত্নী নৃত্যকালীর ওপর কারিয়া পিরেতের অধিকারকেও প্রতিষ্ঠিত করে লেখক সর্বভারতীয় ভূত-ঐক্য দেখিয়েছেন। ত্রৈলোক্যনাথে বাঙালী অবাঙালীদের সীমা ছাড়িয়ে সাহেব ভূতের কাহিনীও এসেছে। এমন কি পৃথিবীর সীমানার বাইরের গ্রহান্তরের সবুজ ভূতেরাও সহাবস্থান করেছে।[৭] ত্রৈলোক্যনাথে বিশ্বের ভূত সমাজের ঐক্য জিন্দাবাদে বর্তমান।

উদ্ভট ভৌতিক গল্পগুচ্ছের বাইরে পরিচিত জগৎ ও জীবনকে নিয়ে বেপরোয়া কল্পনার দ্বিতীয় গুচ্ছের হাসির গল্প সংখ্যা হল ছয়টি—

১। দক্ষিণরায় ... ...কজ্জলী
২। চিরঞ্জীব ... ...গল্পকল্প
৩। ধুস্তুরী মায়া ... ..ধুস্তুরী মায়া
৪। যদু ডাক্তারের পেশেন্ট ... ... ঐ
৫। কাশীনাথের জন্মান্তর ... ...আনন্দীবাঈ
৬। গুপীসায়েব ... ...চমৎকুমারী।

বিয়ে বাড়িতে যেমন এঁটো ভাঁড়, ছিন্ন কলার পাতা, রবাহূত অনাহূতের ভিড়, এলোমেলো চিৎকার—সবকিছুর ওপর একটি শুভ:বোধের আনন্দআলো বিকীর্ণ

৬. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—কঙ্কাবতী।
৭. ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—বীরবালা।

হয়ে সব বিশৃঙ্খলাকে একটি পরিপূর্ণতার আলোয় পরিব্যাপ্ত করে দেয়, অনুরূপ উৎকল্পনার হাসির গল্পেও যেখানে ইতঃস্তত বিকীর্ণ সমাজটার কথা, ইঙ্গিত কটাক্ষ, বক্তব্যের ভার এসে পড়ে তার ওপর শিল্পীর উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও মৌলিকতা এমন ব্যাপক ও নৈর্ব্যক্তিক হাসি বিতানিত করে দেয় যে তার মধ্যে ইঙ্গিত বা খোঁচা আবিষ্কার করা যায় না। ত্রৈলোক্যনাথের হাস্যসৃষ্টিতে, রাস্পের গল্পে এই সত্যটি প্রকটিত দেখেছি। রাজশেখরের পূর্বালোচিত অনেক গল্পে যেমন এই সত্যের পরিচয় রয়েছে, অপেক্ষিত আলোচনার গল্পটিতেও একই হাস্য-কৌশল উদ্ঘাটিত। এই পরিচিত জগৎটাকেই এক একটা উদ্ভট চমকে স্বাভাবিকতার গণ্ডীমুক্ত করে দিয়ে উৎকল্পনার হাসি সৃষ্টি করেছেন। কখনও এই পরিচিত পারিপার্শ্বিককে নিয়ে প্রসন্নতার হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেছেন, কখনও যেতে যেতে সমাজটা ও জীবনটার ত্রুটি বিচ্যুতি, হীনতা নীচতা দেখে কান্তাসম্মিতিতে একটু ইঙ্গিত করেছেন,—যেমন 'দক্ষিণরায়'।

'দক্ষিণরায়' গল্পে স্বদেশী আন্দোলন ও ভোটাভুটির প্রতি ইঙ্গিতটুকু কিংবা বকুলালবাবুর ব্যাঘ্র পরিণতির জন্য কারুণ্যবোধ শিল্পীর ব্যাপক নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব ও উৎকেন্দ্রিক কল্পনার হাস্য প্রকাশের মধ্যে পড়ে স্বতন্ত্র সত্তায় উপলব্ধ হতে পারল না। প্রসন্ন উচ্চহাস্যই ফলশ্রুতি রচনা করল।

'দক্ষিণরায়' গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের মর্জি অতি নৈকট্যে অনুসৃত হয়েছে। বংশীলোচনের বৈঠকখানায় কেদার চাটুজ্জে গল্পকথক, শ্রোতা হলেন বিনোদ উকিল, শালা নগেন, ভাগ্নে উদয়। প্রসঙ্গ উঠল রুদ্রপ্রয়াগের বাঘের। রুদ্রপ্রয়াগের স্থান মাহাত্ম্যে বাঘ কাউকে কিছু বলে না, কেবল সাহেব ধরে ধরে খায়। এই বাঘ কি করে স্বরাজ আনার চেষ্টা করেছিল, সেই অলৌকিক ব্যাপারটা কেদার-বাবু তার বৈঠকখানায় শোনালেন। কিন্তু কেদারবাবু যতই চেষ্টা করুন, এই অলৌকিক ব্যাপারটা না হল অলৌকিক, না হল লোমহর্ষক, পরিণতিতে ব্যাপারটা অবিশ্বাসের হাসিতে উৎকেন্দ্রিক হযে উঠল। আর সেখানেই উৎকল্পনার হাস্য-স্রষ্টার মুন্‌শিয়ানা। এই নৈপুণ্য রাজশেখর কতটা আয়ত্ত করেছেন বিশ্লেষণ করে দেখানো যেতে পারে।

গল্পের সুরুতে কেদারবাবু ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুর মতই তার গল্পের সত্যতার প্রতি পাঠকের একাগ্র ঔৎসুক্য ও বিশ্বাস আকর্ষণ করাবার ভূমিকা সৃষ্টি করলেন।

আবার এই ভূমিকা সৃষ্টি করলেন কখনও তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে বার বার 'হুঁ' বলে নীরব থেকে, কখনও কখনও পুলিশের গোয়েন্দা হরেন ঘোষালের উপস্থিতি আশঙ্কা করে। বংশীলোচনরা স্বয়ং যখন গল্পে সরকারী বিরোধিতার গন্ধ আশঙ্কা করলেন, এবং ঔৎসুক্য যখন চরমে উঠল তখনই কেদারবাবু তার 'গায়ে কাঁটা দেওয়া' অলৌকিক ব্যাপারটা স্বরু করলেন।

প্রথমে করলেন রাজা দক্ষিণরায়ের বন্দনা। তার একটি ভয়াবহ মূর্তি এঁকে গল্পের ভীতিকর বিশ্বাস্য আবহটা আরেকবার সৃষ্টি করতে চাইলেন। ত্রৈলোক্যনাথের নয়নচাঁদ নতুন এক শীতলা শুনিয়েছে, কেদারবাবু তার গৃহরক্ষিত তিনশো বছরের পুরানো রায়মঙ্গল শোনালেন,—

'নমামি দক্ষিণরায় সোদর বনে বাস
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারো মাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর,
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যত দূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পূবে বাকলা পরগণা—
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।
গোবাঘ শার্দুলচিতে লক্কড় হুড়ার
গেছো বাঘ কেলে-বাঘ বেলে-বাঘ আর
ডোরাকাটা ফোঁটাকাটা বাঘ নানা জাতি
তিন শ তেষট্টে ঘর প্রভুর যে জ্ঞাতি
প্রতি অমাবস্যা হয় প্রভুর পুণ্যাহ
যত প্রজা ভেট দেয় মহিষ বরাহ।
ধুমধাম নৃত্যগীত হয় সারা নিশি,
গাঁক গাঁক হাঁক ডাকে কাঁপে দশ দিশি।
কলাবৎ ছয় বাঘ ছত্রিশ বাঘিনী
ভাঁজেন তেতাটা তালে হালুম্ব রাগিণী।
ডেলা ডেলা পেলা দেন শ্রীদক্ষিণরায়,
হরসিত হঞা সবে কামড়িয়া খায়।
প্রভুর সেবায় হয় জীব হিংসা নিত্য,
পহরে পহরে তাঁর জ্বলে ওঠে পিত্ত।

বড় বড় জন্তু প্রভু খান অতি জল্‌দি,
হিংসার কারণে তাঁর বর্ণ হৈল হল্‌দি।
ছাগল শূয়োর গরু হিন্দু মুসলমান,
প্রভুর উদরে যাঞা সকলে সমান।
পরম পণ্ডিত তেঁহ ভেদজ্ঞান নাঞি,
সকল জীবনের প্রতি প্রভুর যে খাঁঞি।
দোহাই দক্ষিণরায় এই কর বাপা—
অন্তিমে না পাঞি যেন চরণের থাপা।'

বন্দনা শেষ করে কাহিনীতে এলেন। বকুলালবাবু নায়ক। বেকার বকুবাবুর নিদারুণ অর্থকষ্টের এক বিশ্বাস্য পরিবেশ রচনা করে, তার মধ্যে ধীরে ধীরে দক্ষিণরায়কে প্রবেশ করাতে প্রস্তুত হলেন। দক্ষিণরায়ের প্রবেশ চরম নৈপুণ্যে উজ্জ্বল। গোটা গল্পটি একটা নিস্তব্ধ অরণ্যের মত। শ্রোতৃমণ্ডলী ক্ষণে ক্ষণে উন্মুখ—এই বুঝি দক্ষিণরায় প্রবেশ করলেন। কেদারবাবুর কথা-ভঙ্গীতে দক্ষিণরায়ের প্রবেশ ক্ষণে ক্ষণে আসন্ন হয়ে উঠেছে। নগেনের মুখ থেকে বার বার বেরিয়েছে—'দক্ষিণরায়?' আর কেদারবাবু নগেনের অস্থিরতায় কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করে দক্ষিণরায়ের কৌতূহলকেই বাড়িয়ে তুলেছেন। এতবড় একটা বানানো আজগুবি গল্পকে এমন একটা বিদ্যুৎ-বৈঠকে পরিবেশন করতে গিয়ে কেদারবাবুকে বার বার এই সত্যতা ও বিশ্বাসের সাফাই গাইতে হয়েছে। এবং অরণ্যে বৃক্ষান্তরালে ব্যাঘ্রের নিঃশব্দ অগ্রসরণের মতই গল্পেও দক্ষিণরায় এতসব সত্যতার আড়ালে আড়ালে থাবা টিপে টিপে একসময় 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' হয়ে দেখা দিয়েছেন। এই 'প্রকাশের' ফলশ্রুতি যে ভীতি, বিস্ময়, আশঙ্কা না জাগিয়ে অবিশ্বাসের হাসি সৃষ্টি করেছে, তা বলা বাহুল্য।

ত্রৈলোক্যনাথের মর্জির স্বাদ এ-গল্পে আরও পরিষ্কার হয়েছে শ্রোতাদের প্রশ্নে কেদারবাবুর তৎপর উত্তরে। যেমন 'বিনোদবাবু বলিলেন, আচ্ছা চাটুজ্যে মশায়, আপনি বকুবাবুর মনের কথা জানলেন কি করে? চাটুজ্যে মশায় বলিলেন—সে তোমরা বুঝবে না। কলিকাল, কিন্তু ব্রাহ্মণ দু-চারটি এখনও আছেন। গরিব বটি, কিন্তু কাশ্যপ গোত্র, পদ্মগর্ভ ঠাকুরের সন্তান। কেদার চাটুজ্যের এই বুড়ো হাড়ে ঋষিদের গুঁড়ো বর্তমান। একটু চেষ্টা করলে লোকের হাঁড়ির খবর জানতে পারি, মনের কথা কোন ছার।' তারপর

বকুলালবাবু ঐ-রকম একমনে তপস্যা করতে লাগলেন। বকুর তপস্যার সার্থকতা পথেই পিসীর পাঁচ লাখ টাকা তার হাতে কি করে এল এবং কি করে বকু ধনী হল, চাটুজ্যে তা বিস্তারিত করে বললেন। কিন্তু শ্রোতাদের প্রশ্ন—'কই চাটুজ্যে মশাই, বাঘ কই? চাটুজ্যে তামাক টানতে টানতে বললেন, আসবে, আসবে ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলেই আসবে।'

কেদারবাবু শ্রোতাদের কৌতূহলকে এক তুঙ্গশীর্ষে পৌঁছে দিয়ে পরম নিরাসক্তিতে তামাক টানতে লাগলেন। আর বাবা দক্ষিণরায় তীব্র চুম্বক শক্তিতে শ্রোতাদের স্বমুখী টানতে লাগলেন। তামাক শেষ করে চাটুজ্যে এবার দক্ষিণরায়ের প্রবেশ-পথ করলেন।

বকুবাবুকে বঙ্গমাতা দেশের কাজে লাগালেন। সাউথ সুন্দরবনের কন্‌ষ্টিটুয়েন্সি থেকে তিনি দাঁড়িয়েছেন। আবার শুরু হল বকুলালের তপস্যা। এবার তপস্যা প্রতিদ্বন্দ্বী রামজাদুবাবুর নিধন-তপস্যা। 'এমন সময় ঘরে টুপ করে একটা শব্দ হল। নগেনের ঠোঁট নড়ে উঠল, আস্তে আস্তে বলল—দ—। চাটুজ্যে গর্জন করে বললেন—চোপরাও। ঘরে টুপ করে একটি টিকটিকি একখানা চিঠির ওপর পড়ল।' বকুবাবু চিঠি খুলে উৎফুল্ল। এ চিঠির সূত্রে এলেন রামগিধড় শর্মা। তিনি ব্যাঘ্র পার্টির সেক্রেটারী। বকুবাবু ব্যাঘ্র পার্টিতে যোগ দিলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি তাঁর সুন্দরবনের জমিদারীতে এলেন। সেখানে বাবা তাকে গভীর অমাবস্যার রাতে সৌম্য ব্রাহ্মণের মূর্তিতে দর্শন দিলেন। দ্বিতীয়বার দর্শন দিলেন দক্ষিণরায়ের পর্বত-প্রমাণ বিভীষণ রূপ ধারণ করে। লেজটি চট করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন তোমায় জাতে তুলে দিই।' দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন। বাবা বললেন—'যাও বৎস, এখন চরে খাওগে।' চাটুজ্যে হুঁকায় মনোনিবেশ করলেন। বিনোদবাবু বললেন—-তারপর?' তার পরের কাহিনী বকুবাবুর আলিপুরে বাঘের খাঁচায় উপস্থিতি। কেদারবাবু আর দেখাসাক্ষাৎ করেন না—ভদ্দরলোককে মিথ্যা লজ্জা দেওয়া।

গল্পটিকে কেদারবাবু যতই সত্য বলে, প্রত্যক্ষ বলে প্রমাণ করতে চান না কেন, ভালো কবিতার রসধ্বনির মত গল্পটিতে অবিশ্বাসের কম্পন ছড়িয়ে আছে। আর সেখানেই গল্পটিতে বকুবাবুর ব্যাঘ্র পরিণতি কিংবা ভোটাভুটি কোন বেদনা-বোধের বা ব্যঙ্গ-ইঙ্গিতের ফলশ্রুতি রচনা করতে পারে নি। বিশ্বাসের ও

ভীতির আবরণ দিয়ে প্রবল অবিশ্বাসকে ঢাকতে গিয়ে কেদারবাবু হাস্যকেই তীব্র করে তুলেছেন। গল্পটিকে বৈঠকখানার শ্রোতারা যে সকলেই অবিশ্বাস্য আজগুবি বলে হেসেছেন, তার প্রমাণ বিনোদবাবুর প্রশ্ন এবং কেদারবাবুর কৃত্রিম রুষ্ট উত্তর।

'বিনোদবাবু বললেন—আচ্ছা চাটুজ্যে মশায়, বাবা দক্ষিণরায় কখনও গুলি খেয়েছেন?

—গুলি তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

—তিনি না খান, তাঁর ভক্তরা খান নি কি?

—দেখ বিনোদ, ঠাকুর দেবতার কোন কথা নিয়ে তামাসা করো না, তাতে অপরাধ হয়। আচ্ছা বস তোমরা—আমি উঠি।'

'উঠি' বলে এদের আড়াল করে কেদার চাটুজ্যে হেসেছেন। আর কেদার বাবুর আড়ালে বৈঠকখানার সভ্যরা হেসেছেন। এবং বৈঠকখানার বাইরের বিপুল শ্রোতার দল এ-হেন আজগুবি গল্পের নৈপুণ্যে উচ্চহাসি হেসে উঠেছেন।

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির এখানেই হোল কারিগরি। ত্রৈলোক্যনাথের ধারার সগৌরব উত্তর-সাধনা রাজশেখরের রচনায়। কিন্তু 'দক্ষিণরায়' গল্পটিতে ত্রৈলোক্যনাথের মর্জি অতি নৈকট্যে অনুভূত হয়েছে। কেদার চাটুজ্যে গল্পকথন নৈপুণ্যে এবং হঠাৎ-বুদ্ধির চাতুর্যে ডমরুধরেরই উত্তর সংস্করণ।

'চিরঞ্জীব' গল্পটিতে রাজশেখর ট্রেনের একটি স্বাভাবিক খোসগাল্পিক পরিবেশে লংকুস্বামী কর্বুরঙ্গ রেড্ডির মত একটি মূর্তিমান চমককে উপস্থিত করে হাসিয়েছেন। ট্রেনের ভীড়, যাত্রার একঘেয়ে ক্লান্তির মধ্যে লংকুস্বামীর উদ্ভট আবির্ভাব একটি আনন্দ হাসির বিরামের মত। লংকুস্বামীর বয়স পাঁচ হাজার পাঁচ শ পঞ্চান্ন। একশ উনিশবার তিনি বিয়ে করেছেন। তার বর্তমান স্ত্রী স্বরাম্মা বাঈ শান্তিনিকেতনে আট বছর থেকে পড়ছেন। লংকুস্বামীর বংশধরদের সংখ্যা কয়েক লাখ। যত রেড্ডি, পিল্লে, মেনন, নাইডু আছে, যত নায়ার, চেটি, আয়ার, আয়েঙ্গার আছে, যত চাটুজ্যে বাঁড়ুয্যে ঘোষ বোস আছে, যত সিং কাপুর চোপরা মেটা, দেশাই আছে, যত শেখ, সৈয়দ, লাভাল, কুইসলিং আছে, যত চ্যাং, কিমাগুসা, ভডকুইস্কি আছে—সকলে তাঁরই বংশধর। পলাশীর যুদ্ধ তিনি দেখেছেন, পৃথ্বীরাজের পরাজয়, হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয়, আলেকজাণ্ডারের আগমন, বুদ্ধদেবের জন্ম, কুরুক্ষেত্রের-যুদ্ধ, এমনকি রাম-রাবণের যুদ্ধে তাকে

লড়তেও হয়েছে। তারক গুপ্ত, হালদার মশাই, শরৎ এবং অন্যান্য যাত্রীরা নির্বাক। 'হরিহর বাবু রোমাঞ্চিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে প্রশ্ন করলেন, আপনি কে প্রভু? গুজরাটী যাত্রীটি উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। দুই উরুতে চাপড় মেরে চেঁচিয়ে বললেন, ও হো হো হো! আমি বুঝে লিয়েছি। আপনি হচ্ছেন বিভীষণ মহারাজ, রামচন্দ্রের বরে চিরঞ্জীব হয়েছেন। এখন একটি বাত বলছি শুনেন। আমার নাম শুনে থাকবেন, লাগনচাঁদ বজাজ, নয়নসুখ ফিলম কম্পানীর মালিক। নয়া ফিলম বানাচ্ছি—রাবণ সন্হার।…আপনারা আমার কম্পানিতে জইন করুন। খুদ আমি রামচন্দ্রের পার্ট লিব। আপনি বড়দাদা রাবণের পার্ট লিবেন, সুরম্মা বাঈ সীতার পার্ট লিবেন। হজার টাকা করে মহীনা দিব। এই আমার কার্ড।…লংকুস্বামী একবার কটমট করে তাকালেন। লাগনচাঁদ থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর কার্ড হাত থেকে খসে পড়ল। এই সময় গাড়ি আসানসোল এসে থামল। সস্ত্রীক লংকুস্বামী কোনও কথা না বলে যুক্তকরে বিদায় নিলেন এবং বাঘের মতন নিঃশব্দে পা ফেলে প্লাটফর্মে নেমে পড়লেন।'

ট্রেনপথে লংকুস্বামীর বসবার জায়গা করে নেবার এ-এক কৌশল। তিনি উদ্ভট গল্পানন্দের চৌম্বক-শক্তিতে সহযাত্রীদের আকর্ষণ করে নিজের এবং স্ত্রীর স্থান করে নিলেন। তার কৌশলাশ্রয়ের প্রতিদান এই আনন্দ। পাঠক যখনই লংকুস্বামীর এই কৌশলটি ধরে ফেলবেন, হো হো করে হেসে উঠবেন। লংকুস্বামীর এই কৌশল যখন সহযাত্রীদের কাছে উদ্ঘাটিত হবে তাঁরাও এই ক্ষতিহীন মিথ্যাকথনের নৈপুণ্যে সপ্রশংস হাসি হাসবেন।

গোটা গল্পটির হাস্যসৃষ্টির কৌশল হল এই উদ্ভট চরিত্রটিকে বিপুল নিরাসক্তিতে অনায়াস পরিবেশনের কৌশল। রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন শিল্পীর আঙুলের সেখা। সে-গুণেই লংকুস্বামীর এতবড় মিথ্যা পরিচয়টা স্থূল হয়ে রসহানি ঘটায়নি।

শিল্পীর কলমের এই প্রবল নিরাসক্তি 'ধুস্তুরী মায়া' গল্পে প্রবল হাস্যে রূপ পেয়েছে। গল্পটিকে লেখক দুই বুড়োর রূপকথা বলেছেন। কিন্তু রূপকথার মোহজাল হাসির সরব উপস্থিতিতে ছিঁড়ে গেছে। দূরদর্শী বেঙ্গমা-বেঙ্গমী যারা রূপকথার রূপকার—তারা লেখকের কল্পনার বেপোরোয়া খেয়াল এবং পাঠকের আসন্ন উচ্চহাসির শব্দ আশঙ্কা করে গল্পের শুরুতেই উড়ে গেছে।

রাজশেখরের এই গল্পটিতে ত্রৈলোক্যনাথের কোন কোন কাহিনীর মত গল্পের রসমণ্ডকে দানা বাঁধাবার জন্য কেন্দ্রে একটি বক্তব্যের দরকার হয়েছে। বার্ধক্যে যৌবনের ভোগবাসনা ফিরিয়ে পাবার জন্য উদ্ধববাবুর যে-ইচ্ছা, সে-ইচ্ছা এ গল্পের বক্তব্য। কিন্তু মিছরির তালে সুতোর মত এই বক্তব্য হাস্যময় হয়ে উঠেছে। বক্তব্যটুকু গল্পটাকে মোটর গাড়ি স্টার্ট দেবার মত স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে মাত্র। তারপর গল্প চলেছে রাজশেখরের বেপরোয়া কল্পনার হাস্য-সরস পথে, আপনবেগে। সেখানে বক্তব্যের ভার সহাস্য হয়ে পাঠকমনে গুরুত্ব হারিয়েছে। রূপকথার আবিষ্টতা সেখানে কোন অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেনি।

জগবন্ধু এবং উদ্ধব দু'জনে ঢাকুরিয়ার লেকে সন্ধ্যায় বেঙ্গমাবেঙ্গমীর মুখে ইচ্ছামত যৌবন-বার্ধক্য সৃষ্টির নির্দেশ পেলেন। সে নির্দেশ-পথে ধুতরা থলির মধ্যে ছোলা পুরে রেখে অমাবস্যার এক সন্ধ্যায় গঙ্গাজলে নেমে সেই ছোলা চিবিয়ে দু'জনে বললেন—

বম মহাদেব ধুস্তরী স্বামী,
দস্তুর মত প্রস্তুত আমি।'

এক একটা ছোলায় দশ দশ বছর, তিনটি ছোলা চিবিয়ে তারা ৬৫ বছরের বার্ধক্যকে ৩৫ বছরের তারুণ্যে নামিয়ে আনলেন। বাঁধানো দাঁত খসে পড়ল, দু'পাটি নতুন দাঁত বেরিয়েছে, গায়েও জোর পাচ্ছেন। মাথায় চুল গজিয়েছে, দু'জনে তখন বউবাজারের তরুণধাম হোটেলে উঠলেন।

ধুতরার রসসিক্ত ছোলা খাইয়ে বয়স কমাবার এ হেন উদ্ভট কল্পনা আমাদের জাগরণের বুদ্ধির কাছে তুলে ধরে রাজশেখর এক তীব্র অসঙ্গতির উত্তরোল হাস্যসৃষ্টি করেছেন। এই উদ্ভট কল্পনার উত্তরফলকে আবার স্পন্দচ্ছন্দাদেবীর প্রেমকাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পূর্বের হাস্যকেই বেপরোয়া ও বিচিত্র স্বাদের করে তুলেছেন।

তরুণধাম হোটেল থেকে উদ্ধববাবুর অতৃপ্ত প্রেমের স্বার্থকতার অভিযান চলল। স্পন্দচ্ছন্দার সঙ্গে উদ্ধবের প্রেমালাপে রাজশেখর হাসির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। উদ্ধবের বিপদ হল, তিনি বয়সটা কমিয়ে হাফ্-তরুণ হয়েছেন, কিন্তু চালচলন, ফ্যাশন রয়ে গেছে সাবেক কালের। মনের বয়স কমাবার ক্ষমতা ধুস্তরী মন্ত্রের নেই। ফলে একালের বয়সের মধ্যে সাবেক কালের মনটা বলবৎ থেকে গল্পে আরেকদিক থেকে হাস্যকর অসঙ্গতি সঞ্চারিত করেছে।

এই অসঙ্গতি পথেই স্পন্দচ্ছন্দাকে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে উদ্ধব পড়লেন বিপদে। স্পন্দচ্ছন্দার সঙ্গে তার প্রেমালাপের দৃশ্যাংশ উদ্ধারের লোভ সামলান কঠিন—

'—ইয়ে, দেখুন শ্রীযুক্তেশ্বরী রাজকুমারী পণ্ডচণ্ডাদেবী—

—স্পন্দচ্ছন্দা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ স্পন্দচ্ছন্দা। দেখুন, একটি কথা গোড়াতেই নিবেদন করি। আপনার নামটা উচ্চারণ করা বড় শক্ত, আমি হেন জোয়ান মরদ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। যদি আপনাকে পদ্মীরাণী বলি তো কেমন হয়?

—স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। আমিও আপনাকে উমৃশে বলব।

—সেটা কি ভাল দেখাবে? প্রজাপতির নির্বন্ধে আমি তো আপনার স্বামী হতে পারি। হবু স্বামীকে নাম ধরে ডাকা আমাদের হিন্দু ঘরের দস্তর নয়।

স্পন্দচ্ছন্দা হি-হি করে হেসে বললেন, আপনি দেখছি অজ পাড়াগেঁয়ে।

—আমি আসল শহুরে, চার পুরুষ কলকাতায় বাস। আপনিই তো পাড়াগাঁ থেকে এসেছেন। বেশ, নাম ধরেই ডাকবেন, তাতে আমার ক্ষতিটা কি। এখন কাজের কথা শুরু হোক। আমার চেহারাটা কেমন দেখছেন?

—মন্দ কি! একটু বেঁটে আর কালো, তা সেটুকু ক্রমে সয়ে যাবে। আমাকে কেমন দেখছেন?

—খাসা, যেন পটের বিবিটি। অত ফরসা কি করে হলেন?

—আমার গায়ের রঙই এই রকম।

উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন, ওগো চণ্ডাপণ্ডা পদ্মীরাণী, রঙের ব্যাপারে আমারে ঠকাতে পারবে না, ওই হল আমার ব্যবসা। তুমি এককোট অস্তরের ওপর তিন পোঁচ পেন্ট চড়িয়েছ,—হবকস জিঙ্ক, একটু পিউড়ি, আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছ বেশ করেছ, জমির আদত রঙটি কেমন?

—আপনি অতি অসভ্য।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার গায়ের রং তোমারই থাক, আমার তা জানবার দরকার কি। তবে একটা কথা বলি—মূর্তিটা কুমোরটুলি ঢঙের করতে পার নি। যদি আরও বেশী পিউড়ি কি এলামাটি দিতে আর চোখের কাজলটা কান পর্যন্ত টেনে দিতে তবেই খোলতাই হত।

—আপনি নিজে কি মাখেন? আলকাতরা?

উদ্ধব সহাস্যে বললেন, সরষের তেল ছাড়া কিছুই মাখি না। আমার হচ্ছে খোদ রং, নারকেল ছোবড়া দিয়ে ঘষলেও উঠবে না, একেবারে পাকা। আমার কাছে তঞ্চকতা পাবে না। বয়সও ভাঁড়াতে চাই না, ঠিক পঁয়ত্রিশ। তোমার কত?

—বাইশ।

—উঁহু, বেয়াল্লিশ।

স্পন্দচ্ছন্দা চেঁচিয়ে বললেন, বাইশ!

আরও চেঁচিয়ে টেবিলে কিল মেরে উদ্ধব বললেন, বেয়াল্লিশ!

—আপনি আমার অপমান করছেন?

—আরে না না, এটুকু দরদস্তুর করছি। আচ্ছা, তোমার কথা থাকুক, আমার কথাও থাকুক, একটা মাঝামাঝি রফা করা যাক। তোমার বয়স বত্রিশ

স্পন্দচ্ছন্দা মুখভার করে বললেন, বেশ, তাই না হয় হল।'

উদ্ধবের ৩৫ বছরে তারুণ্যের মধ্যে ঐ ৬৫ বছরের সেকেলে মনটা থাকার দরুন স্পন্দচ্ছন্দা লাভ তার ঘটল না। বরং অর্থের লোকসানে পা বাড়ালেন। সলিসিটার গুঁই-এণ্ড হুঁই-এর কাছ থেকে একলক্ষ টাকার খেসারত দাবী এলো। কারণ উদ্ধববাবু স্পন্দচ্ছন্দা দেবীকে মানসিক আঘাত করেছেন। দুই বন্ধু খেসারত ফাঁকি দিলেন। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাঘাটে নেমে তিনটি করে বেলপাতা চিবিয়ে মন্ত্রপাঠ করলেন।

'বম্ মহাদেব সকল বস্তু
আগের মতন আবার অস্তু।'

এক ডুবে ৩৫ বছরের তারুণ্য ৬৫ বছরের বার্ধক্যের সকল লক্ষণ নিয়ে উঠে এলো। তারপর হোটেল থেকে তাড়া খেয়ে, স্ত্রী কালিদাসীর কাছে ফোকলা কুমীরের মিথ্যা গল্প ফেঁদে জগবন্ধুসহ উদ্ধব পুনর্মূষিক হলেন।

গল্পটিতে অত্যাধুনিকতার প্রতি যে ইঙ্গিতটুকু আছে, তা প্রচণ্ড হাস্যের ফলে আঘাত শক্তিতে ভোঁতা। স্পন্দচ্ছন্দা দেবীর সঙ্গে উদ্ধবের উদ্ভট প্রেমালাপে যে উচ্ছ্বসিত হাস্যের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কৌতুক আছে, উইট-এর হাসি আছে, কিন্তু গল্পের উৎকল্পনার ফলশ্রুতিতে তা কোথাও আঘাত না করে বরং উৎকল্পনার হাসির দেহে একটা বিচিত্র স্বাদ এনে দিয়েছে। মাছের মত খেলিয়ে

খেলিয়ে বউ ঘরে তোলবার উদ্ধবের যে ইচ্ছা, তার ব্যর্থতা দেখে কোন ব্যথাবোধ বা পীড়নানুভূতি যে পাঠক-মনে জাগে না, তার কারণ উদ্ধব নিজের ব্যর্থতাকে নিজেই সহাস্য করে তুলেছেন। সাফল্যে গল্পটিতে পাঠকমন এমন এক উদ্ভট উদ্ভাবনার হাস্য-ফলশ্রুতিতে ভরে রয়েছে যে, তার মধ্যে ইঙ্গিতব্যঙ্গ কারুণ্যপীড়ন কোথাও স্বাতন্ত্র্যে দাঁড়াবার ভূমি পায়নি।

ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সান্ধ্য আসরে যদুনন্দন গড়গড়িকে বক্তা করে রাজশেখর তাঁর উদ্ভট কল্পনাকে মুক্তি দিলেন 'যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট' গল্পে। বিঘোর বাবার কাগমারি আশ্রম, জটীরাম এবং পঞ্চীর পরকীয় প্রেমের ফল মুণ্ডছেদন, মৃত সঞ্জিবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে জটী ও পঞ্চীর মুখ শরীর আটকে রাখা, কাটামুণ্ডের কথোপকথন, ভোঁতা গুনছুঁচ আর পিদিমের রেড়ির তেল মাখা খসখসে পাটের সুতলি দিয়ে পঞ্চীর ধড়ে জটীর মুণ্ড এবং জটীর ধড়ে পঞ্চীর মুণ্ড সিলাই,—এই উদ্ভট কল্পনা নিয়ে রাজশেখরের উদ্ভাবনী শক্তি হাস্যসৃষ্টিতে মেতে উঠেছে। হাসি চরমে উঠেছে যখন এই অভিনব সার্জারির দুবছর পরে গড়গড়িমশাই জটী-পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশনের চিঠি পেলেন—'দুবছর পরে বিঘোর বাবা চিঠি লিখলেন, মাঘ সংক্রান্তির দিন জটী-পঞ্চীর ছেলের অন্নপ্রাশন, তুমি অবশ্যই আসবে। বাবার যখন আদেশ তখন যেতেই হল। ······দেখলুম, বিঘোর বাবা ঠিক আগের মতন লাল চেলির জোড় পরে দাঁড়িয়ে হুঁকো টানছেন, পঞ্চী তার মস্কিউলার মদ্দা হাতে একটা মস্ত কুড়ুল নিয়ে কাঠ চেলা করছে, জটীরাম রোয়াকে বসে একটা পিঁড়িতে আলপনা দিচ্ছে আর কোলের ছেলেকে মাই খাওয়াচ্ছে।' মুণ্ড বিনিময়ের উত্তর-ফল এই চিত্র পাঠকমনে স্থায়ী হাস্যে দাঁড়িয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের 'এক ঠেঙো ছকু'র গল্পের সঙ্গে রাজশেখরের এ-গল্পের কল্পনার ঐক্য লক্ষণীয়। যোগমন্দিরের শ্রোতারা মহাষ্টমীর দিনে এই গল্প শুনে যেমন আনন্দ পেয়েছে, রাজশেখরের শ্রোতারাও সকলেই স্বীকার করলেন, পরকীয় প্রেমের এমন পারফেক্ট পরিণাম বৈষ্ণব সাহিত্যেও নেই, আর সিমবায়োসিসের এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বায়োলজির কেতাবেও পাওয়া যায় না। রাজশেখর বিভীষিকা, সার্জারি আর পরকীয় প্রেমের যে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ উদ্ভাবন করেছেন, তার একমাত্র দৃষ্টান্ত মেলে প্রসন্ন খেয়ালী মনের এমন অসাধারণ কল্পনাশক্তির স্ফূর্তিতেই।

ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের এই গড়গড়ি মশাই ত্রৈলোক্যনাথের 'মুক্তামালা'র গড়গড়ি মশায়েরই পুত্র-পৌত্র হবেন। মহাদেববাবুর মজলিশে গড়গড়ি মশাই যে আজগুবি উদ্ভট গল্পে শ্রোতাদের আনন্দ দিয়েছিলেন, নতুন চেহারায় সেই আজগুবি উদ্ভট গল্প পেলাম ক্যালকাটা ফিজিসার্জিক ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠকে।

আড়াই সেঞ্চুরী আগেকার একটি মানুষ যদি তার অতীত স্মৃতি এবং রুচি-মন-শিক্ষা নিয়ে এ-কালে উপস্থিত হতে চায়, তাহলে কেমন হয়? রাজশেখরের এই উৎ-ভাবনা থেকে 'কাশীনাথের জন্মান্তর' গল্পের সৃষ্টি। মৃত্যুর পর কাশীনাথের যুগ্মশরীরটির যমলোকে উপস্থিতি, স্বর্গ ও নরক ভোগান্তে জন্মান্তর বিষয়ে যম ও কাশীনাথের কথোপকথন, পঁচিশ-ত্রিশ বছরের যুবারূপে কাশীনাথের তারই উত্তর-পুরুষের গৃহে জন্মগ্রহণের অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা, যমদেবতার কৌতূহলও সে আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি, এবং কিছু অর্থ, বর্তমান কালের উপযুক্ত কিছু পরিচ্ছদ, পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক ভাষা ও কিছু অপভ্রষ্ট ইংরেজী ও হিন্দী জ্ঞানের সঙ্গে একটি নিষ্ক্রান্তি বটিকাসহ কাশীনাথের ত্রিশবছরের যুবারূপে মধুসূদন রোডের তিন-নম্বর বাড়ির ফটকের [illegible]জন্মলাভ এবং তার পরের বিচিত্র কাহিনী উদ্ভাবন করে রাজশেখর তাঁর [illegible] কল্পনাশক্তির অনবদ্য হাস্য রচনা করেছেন 'কাশীনাথের জন্মান্তর' গল্পে।[1]

গোপালচন্দ্রের গানে, দীনবন্ধু ও ত্রৈলোক্যনাথে যম ও মানুষ নিয়ে কল্পনার যে হাসির সৃষ্টি হয়েছে রাজশেখর সে পথেই এই হাসি সৃষ্টি করেছেন। তফাৎ হোল, সেদিনকার অকর্মণ্য যম রাজশেখরের যুগের পরিবর্তনে অনেক ভদ্র, কর্মণ্য এবং বড় রসিক হয়েছেন।

উদ্ধব চরিত্র কল্পনা করে রাজশেখর 'চিরঞ্জীব' গল্পে একবার হাসি সৃষ্টি করেছেন। 'গুপীসায়েব' গল্পে দ্বিতীয় বার করলেন। গুপীসায়েব রাজশেখরের উৎকেন্দ্রিক কল্পনাশক্তির এক অসামান্য পরিচয়। গুপীসায়েবের অশেষ গুণ ও ক্ষমতা। অতি অদ্ভুত তার চলা-বলা আচরণ। ধুতি পাঞ্জাবি পরে, মাথায় শোলার হ্যাট দিয়ে বাইসিকল চড়ে গুপীসায়েব ঘুরে বেড়ান। একবার সর্বোদয় যোগের সময় দেখা গেছে একটা গামছা পরে আর একটা গামছা গায়ে জড়িয়ে মাথায় হ্যাট দিয়ে হাতে কমণ্ডলু ঝুলিয়ে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন গুপীসায়েব। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরের কিছু কিছু স্বভাব রাজশেখরের গুপীসায়েবের মধ্যে

বর্তেছে। ডমরুধর খালিগায়ে ধুতি মালকোচা করে মাথায় হ্যাট দিয়ে ছিপ হাতে মাছ ধরেন। গুপীসায়েব রাধাশ্যাম গোঁসাই-এর নাতিকে এমন এক বুলডগ এনে দিয়েছিলেন যে ভাত ডাল ডাঁটা চচ্চড়িতে বুলডগ তুষ্ট। আর মাংসের বদলে এক টুকরো কঞ্চি বা একটি পুরনো টুথব্রাশ পেলেও তার চলে। কালীচরণ তন্ত্রবাগীশের শখ হয়েছিল একটি ময়না পুষবেন। কিন্তু বৈষ্ণবী বুলি কপচালে চলবে না। গুপীসায়েব তারাপীঠ না চন্দ্রনাথ কোথা থেকে একটা পাখি নিয়ে এলেন, সে গাঁজাখোরের মত হেঁড়ে গলায় শুধু বলত, তারা তারা বল শালারা। গুপীসায়েবের শখ কাঁকড়াবিছে পোষা। হাতে দস্তানা পরে এক পকেটে কাঁকড়াবিছে আরেক পকেটে কাঁকড়াবিছের খাবার ডেয়ো পিঁপড়ের ডিম নিয়ে গুপীসায়েব চলাফেরা করতেন। শখের কারণ কাঁকড়াবিছে দরজা জানালার উই, ভাঁড়ার ঘরের পিঁপড়ে, বিছানার ছারপোকার দাবাই। এই দাবাই দিয়েই জিতেনবাবুকে গুপীসায়েব বই-চুরি থেকে বাঁচিয়েছেন। গুপীসায়েবের চরম অবদান হল এই কাঁকড়াবিছে দাবাই দিয়ে এক বছরের জন্য পকেটমারদের ঠাণ্ডা করে রাখা। পাঞ্জাবির পকেটে দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়াবিছে রেখে পকেটমারদের শায়েস্তা করবার যে দাবাই গুপীসায়েব বার করেছিলেন, সে দাবাইয়ে একবছর পকেটমাররা জব্দ হয়েছিল। কিন্তু শ্রোতা নয়নচাঁদ পাইন এবং [illegible] মল্লিকের মত কাজের মানুষেরা গুপীসায়েবের প্রচেষ্টাকে আষাঢ়ে গল্প বলে হেসে এই অদ্ভুত চরিত্রটির আরও কীর্তিকাহিনী শ্রবণ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছেন।

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যনাথ এবং রাজশেখর একই ধারায় বিকশিত দুই শিল্পী। ত্রৈলোক্যনাথে এই ধারার সচেতন উদ্ঘাটন, রাজশেখর সেই ধারারই উত্তরসূরী।

শিল্পী রাজশেখর ও শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ—সৃষ্টির কলমধারণে দুজনার মধ্যে বয়সের একটা ঐক্য রয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর প্রথম সাহিত্য গ্রন্থের প্রকাশকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ। তখন তাঁর বয়স ৪৫ বছর। রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেছেন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেন ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। এবং প্রথম গ্রন্থ 'গড্ডালিকা'র প্রকাশকাল ১৯২৫ (১৩৩২)। তখন তাঁরও বয়স ৪৫ বছর। বাঙালীর গড় আয়ুর সীমারেখা পেরিয়ে তাঁরা দু'জনেই হাস্যসৃষ্টির আনন্দ দিতে কলম ধরেছেন।

'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পে স্বদেশী কোম্পানী নিয়ে যে হাস্য রয়েছে, তার পূর্ব সূচনা ত্রৈলোক্যনাথের স্বদেশী কোম্পানী নিয়ে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির মধ্যে। 'ডমরুচরিতে'র চতুর্থ গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদে, পঞ্চম গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে, ত্রৈলোক্যনাথ স্বদেশী কোম্পানীর পরিচালকদের যে প্রবঞ্চক, শঠ, সাধারণের অর্থশোষক করে দেখিয়েছেন, রাজশেখর তাঁর প্রথম গল্পে ব্রহ্মচারী শ্যামবাবু, বিপিনবাবু ইত্যাদির সেই রূপটিই তুলে ধরেছেন। তফাৎ হল পরিবেশনের ক্ষেত্র। ত্রৈলোক্যনাথ 'ডমরুচরিতে'র উৎকল্পনার হাস্যের স্রোতের মধ্যে স্বদেশী কোম্পানীর ব্যঙ্গকে পরিবেশন করেছেন। রাজশেখর দেশের বৃহৎ অভাব দূরীকরণার্থ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' কোম্পানীকে তীব্র ব্যঙ্গে আঘাত করেছেন। অবশ্য রাজশেখর এ-ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুচরিত' দ্বারা প্রত্যক্ষ প্রভাবিত হতে পারেন নি। তার কারণ 'ডমরুচরিত' বহুপূর্বে রচিত হলেও, ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তা প্রকাশিত হয়েছে। তার একবছর পূর্বে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গ্রন্থ প্রকাশিত। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিমানস যে কোটিতে সমাজ সচেতন, রাজশেখরের শিল্পিমানস তার সঙ্গে নিকট-ঐক্য রক্ষা করেছে। পরবর্তী সময়ে ত্রৈলোক্যনাথের যে আনন্দ-মসৃণ খেয়ালীমন উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি করেছে, রাজশেখর তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং ত্রৈলোক্য-উৎস উৎকল্পনার হাস্যধারাকে স্বোন্মেষণ ক্ষমতায় পুষ্ট করে বাংলা সাহিত্যে তাকে স্থায়ী গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখর বসু পশ্চিমবঙ্গের দুই পাশাপাশি জেলার মানুষ—ত্রৈলোক্যনাথ চব্বিশ পরগণার, রাজশেখর নদীয়ার। ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম শ্যামনগর। রাজশেখরের পৈতৃক নিবাস বীরনগর। চব্বিশ পরগণা মিলেছে নদীয়ায়। বাংলার উৎকল্পনার হাস্যরসের ত্রৈলোক্যনাথের ধারা মিলেছে রাজশেখরের ধারায়।

ত্রৈলোক্যনাথ এবং রাজশেখর বসু দু'জনেই একটা বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টি এবং গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের গবেষণা সেদিন ইংরেজ সরকারের সশ্রদ্ধ প্রশংসা পেয়েছিল। রসায়নবিদ্ রাজশেখর বসু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রাজশেখর যে প্রফুল্লচন্দ্রের হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং তাঁরই নির্দিষ্ট কাজে বেঙ্গল কেমিক্যালের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত—একথা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখা একখানা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের শিল্পিমনের মণিকোঠায় একদিকে লঘুউচ্ছল খেয়ালীমনের হাস্য স্ফূর্তি আরেক দিকে তাঁর পাণ্ডিত্য বিশ্বকোষ রচনায় ব্রতী হয়েছিল। রাজশেখর বসুর মধ্যেও এই দুই শিল্পিসত্তার সহাবস্থান। একদিকে তিনি হাসির গল্পকার, বাঙালী পাঠকের গল্প প্রতীক্ষার তৃপ্তিদাতা পরশুরাম। বেপরোয়া কল্পনার খুশিতে তিনি মশগুল। আরেকদিকে তিনি রাজশেখর বসু, রাজশেখর নামের স্থির ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের মর্যাদা রক্ষায় নিমগ্ন। বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদে, মহাভারতের সারানুবাদে, মেঘদূত কাব্যের সঠিক বাংলা অনুবাদে, হিতোপদেশের চুম্বকানুবাদে, 'চলন্তিকা' রচনায় এবং ভারতে খনিজ কুটীর শিল্প, ভাষা ও সাহিত্যের ওপর লঘুগুরু প্রবন্ধ রচনায় তিনি চিন্তাশীল, গম্ভীর, আত্মস্থ।

এই বিজ্ঞান দৃষ্টিপ্রিয়তা এবং পাণ্ডিত্যের স্থিরতাই দু'জনার শিল্পিসত্তায় পূর্বোক্ত নির্মোহ প্রসন্ন দৃষ্টিকে, একটা প্রবল নৈর্ব্যক্তিকতাকে দানা বাঁধতে যেমন সাহায্য করেছে, আরেক দিকে এই বিজ্ঞানীমনের সুশৃঙ্খলাই কল্পনার বেপরোয়া সঞ্চরণের মধ্যে শিল্পকুশল সুসমঞ্জস বিশ্বাস এনে দিয়েছে।

রাজশেখর বসু এবং ত্রৈলোক্যনাথ দু'জনেই মজলিসী শিল্পী। ত্রৈলোক্যনাথ যে কোটিতে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যস্রষ্টা, সে-কোটিতে তিনি আড্ডাধারী। কখনও ফরাসডাঙ্গায়, কখনও চন্দননগরে, কখনও বা কলকাতার উপকণ্ঠে গ্রামে তাঁর আড্ডা বসেছে। রাজশেখর বসু যে প্রকোষ্ঠে উৎকেন্দ্রিকতার হাস্যস্রষ্টা, সেখানে তিনিও বৈঠকধারী, আড্ডাধারী। বংশীলোচনের বৈঠকখানায়, গোপাল মুখুজ্যের বাড়ীতে, জেলা জজ সুবোধ রায়ের গৃহে, কখনও ঢাকুরের লেকে, কখনও বা দিল্লীর গোলমার্কেটের পেছনের গলিতে কালীবাবুর 'ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে', কলকাতার ফিজিসার্জিক ক্লাবে—রাজশেখরের আড্ডা বসেছে। ব্যক্তি-জীবনেও রাজশেখর একটা সাহিত্যিক আড্ডার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।. তাঁদের চৌদ্দ নম্বর পার্শীবাগানের বাড়ীর সাহিত্যিক আড্ডা 'আরবিট্রারী ক্লাব' (অজিত দত্ত মহাশয় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস' গ্রন্থে 'আরবিট্রারী ক্লাবের' বাংলা করেছেন 'উৎকেন্দ্রিক সমিতি')-এর তিনি নিয়মিত সভ্য ছিলেন। এই আড্ডা থেকে তিনি হাস্যসৃষ্টির কলম ধরবার উৎসাহ পেয়েছিলেন। সে উৎসাহ-ই তাঁর গল্প-জগতে একটি সরস জমাট আড্ডার পরিবেশ সজীব করে রেখেছে।

দু'জনার আড্ডাখানার তফাৎ এই যে, ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডা গ্রামীণ, রাজশেখরের আড্ডা নাগরিক।

ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডা বসে কলকাতার বাইরে মফঃস্বল গ্রামে। রাজশেখরের আড্ডা নগর কলকাতার বুকে, রাজধানী-দিল্লীর বুকে। ত্রৈলোক্য-নাথের আড্ডা বসে চালাঘরে, চণ্ডীমণ্ডপে। রাজশেখরের আড্ডা বসে জেলা-জজের বাড়ীতে, হাকিমের বাড়ীতে, আধুনিক কৃষ্টির পীঠস্থান টী ক্যাবিনে, লেকে, পার্কে। ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডা গ্রামীণ বলে সেখানে ধেনোমদ চলে, তামাক, গাঁজা, আফিম গুলি চলে। মিন্‌সে, শালা, বানচোত, মাইরি, গু-খেকোর বেটা ইত্যাদি প্রাঞ্জল ভাষা অসংকোচে এখানে এসে পড়ে। ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডার গল্পদেহকে গ্রামীণতার অকৃত্রিম সহজতা আলগোছে ছুঁয়েই আছে। রাজশেখরের আড্ডার গল্পদেহে নাগরিক চাতুর্য ও পরিপাট্য। তার আসরে চা, সিগার, ঠাণ্ডাপানীয়, ট্রে ভর্তি খাবার, চপ, কাটলেট চলে। শব্দ ব্রহ্ম এ-আসরে গ্রাম্য আড্ডার মত শুচিবাই মুক্ত হয়ে আসে না। তার প্রয়োগ কাটাছাঁটা। নাগরিক আবরণ, নাগরিক সুরুচি বিলাস-শাসিত এ-আড্ডার চাল।

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এই আড্ডাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, কোথাও অপ্রত্যক্ষ উপলব্ধ। যেখানে প্রত্যক্ষ, সেখানে একজন আড্ডাধারী আছেন। একজন গল্পকথক আছেন। যেখানে আড্ডাটি অপ্রত্যক্ষ, সেখানে আড্ডাধারী ও কথক হলেন লেখক এবং তা সহজ উপলব্ধ। আড্ডাধারীর পরিচালনাধীন হয়ে কথক এক পশ্চাৎক্ষেপণ রীতিতে গল্প বলে যাচ্ছেন। রাজশেখরের আড্ডাটিও অপ্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষও বটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ উপলব্ধ। যেখানে প্রত্যক্ষ (যেমন বংশীলোচনের বৈঠকখানায়) সেখানে আড্ডাধারী বংশীলোচন, কথক কেদারবাবুও পশ্চাৎক্ষেপণ রীতি অবলম্বন করেছেন। যেখানে আড্ডাটি অপ্রত্যক্ষ সেখানে লেখক যে কথক তা সহজ-উপলব্ধ।

দু'জনের আড্ডাখানার তফাৎ হয়েছে ভিন্ন পরিবেশে দুটি আড্ডা গড়ে উঠেছে বলে। পাত্রের এই বিভেদের জন্য দু'জনার গল্পাঙ্গিকে পার্থক্য চোখে পড়ে, সে কথা পরে আলোচিত হবে। মূলত উৎকেন্দ্রিকতার হাসি সৃষ্টির ধারায় রাজশেখরের শিল্পিমানস ত্রৈলোক্যনাথের ধারারই উত্তর-সাধক।

রাজশেখরের উৎকল্পনার হাসির সকল গল্পেই ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টির উত্তর সাধনা। কিন্তু উদ্ভট ভৌতিক গল্প এবং বাস্তব জগৎকে নিয়ে অসম্ভব কল্পনার হাস্যসৃষ্টির বাইরে রাজশেখরের আরেক শ্রেণীর গল্প আছে, যেখানে তিনি রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাব্যের মধ্যে তাঁর বেপরোয়া কল্পনাশক্তি চোলাই করে দিয়ে

উচ্চহাসির সৃষ্টি করেছেন। পূর্বকথিত উৎকেন্দ্রিকতার ২০টি গল্পের দ্বিতীয় জাতের গল্পমালা হচ্ছে এই উদ্ভট পুরাণের গল্প। যেমন 'রেবতীর পতিলাভ', 'ভরতের ঝুমঝুমি', 'স্মৃতিকথা', 'ভীমগীতা,' 'তৃতীয় দ্যূতসভা', 'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী', 'হনুমানের স্বপ্ন' ইত্যাদি বারোটি গল্প। উৎকেন্দ্রিকতার ২৮টি গল্পের মধ্যে এই উদ্ভট পুরাণ সৃষ্টির গল্পই সংখ্যায় অধিক। উদ্ভট পুরাণের হাস্যসৃষ্টিতে রাজশেখর একক। এ-ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বসূরী নেই। ত্রৈলোক্যনাথের কলম এ-পথে চলেনি। সংস্কৃত সাহিত্যে রাজশেখরের অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং তাঁর হাস্যরসপ্রিয় মন হাস্যসৃষ্টির এই নূতন মখমলের বসনখানি বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে পেতে দিয়েছেন। উদ্ভট পুরাণ সৃষ্টির এই অভিনব ধারাটি পরশুরামের স্বকীয়তায়

পুরাণ নিয়ে এই নূতন ধারা সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে একদিকে পূর্বকথিত তাঁর খেয়ালপ্রিয় উপরিচর মনের গঠন, আরেক দিকে সমকালীন বাংলা সাহিত্যের আবহাওয়া। ত্রৈলোক্যনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে সংস্কৃত ও ইসলামি সাহিত্যের অলৌকিক কল্পনার গল্পরসের মত্ততা ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির উৎসমূলে কিভাবে কাজ করেছে। রাজশেখরের কৈশোর এবং যৌবন উনিশ শতকের যে দ্বিতীয়ার্ধে লালিত, তখন ইসলামি সংস্কৃত সাহিত্যের অলৌকিক কামনার মত্ততা হ্রাস না পেলেও, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ নিয়ে যুগোচিত নবমানবতাপুষ্ট মন নব্যপুরাণ সৃষ্টিতে উন্মুখ হয়েছে। মধু, হেম, নবীন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ হয়ে পুরাণ উন্মুখতা বিশ শতকেও চলে এসেছে। বিশ শতকের শুরু থেকেই রামায়ণ মহাভারত এবং বিভিন্ন পুরাণকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিশু ও কিশোর মনের কাছে পরিচিত করে তুলবার একটা ব্যাপক চেষ্টা করেছেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কুলদারঞ্জন রায় প্রমুখ। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণকে যুগোচিত নতুন দৃষ্টিতে দেখবার এই ব্যাপক চেষ্টা রাজশেখরকে সংস্কৃত কাব্য-পুরাণের প্রতি আকৃষ্ট করেছে।

এই আকর্ষণ থেকেই তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অসামান্য ব্যুৎপত্তিলাভ করলেন। এবং যুগোপযোগী প্রবণতা থেকেই রামায়ণ-মহাভারত-হিতোপদেশ-কালিদাসের কাব্য-র মূলানুবাদ, সারানুবাদ, চুম্বকানুবাদ, সটিক অনুবাদ বিষয়ে উৎসাহী হলেন। এবং ১৩৫০ থেকে ১৩৫৭—এই সাত বছরের মধ্যে তিনি মেঘদূত কাব্যের সটিক বাংলা অনুবাদ (১৩৫১), বাল্মীকি রামায়ণের সারানুবাদ (১৩৫৩),

মহাভারতের সারানুবাদ (১৩৫৬), হিতোপদেশের চুম্বকানুবাদ (১৩৫৭) করেন। সাহিত্যিক রাজশেখরের এই অনুবাদ কর্মের পশ্চাদভূমিতে জাগ্রত ছিল রসায়নবিদ্ বিজ্ঞানী রাজশেখরের মন। তার ফলে অনুবাদ একদিকে যেমন 'নির্বর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টির মূল্য' ৮ লাভ করেছে, আরেক দিকে সম্ভব হয়েছে বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট পুরাণের হাস্যময় গল্পমালার উদ্ভব। পুরাণ, কাব্যকে বিজ্ঞানীর স্বভাবোচিত যুক্তিনিষ্ঠ মন নিয়ে পড়তে গিয়ে তিনি দেখলেন এই জগতে এমন বহু ঘটনা, চরিত্র রয়েছে, কল্পনার এমন উদ্দাম উড্ডয়ন রয়েছে যাকে যুগোচিত আধুনিকমন সংস্কার-বিশ্বাসের রঙিন কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে পারবে না। এই সত্যের মধ্যে তাঁর শিল্পিস্বভাবের উচ্ছল হাস্যপ্রিয় সত্তা কল্পনার পাখা মেলে দিল। সৃষ্টি হল রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-কাব্য নিয়ে বেপরোয়া কল্পনার প্রসন্ন উচ্চ হাসি।

পুরাণের যেসব সুপরিচিত ঘটনা-কাহিনী-চরিত্র, তাদের বিকৃত করতে তিনি নারাজ। পুরাণ ও কাব্যের কাহিনী বা চরিত্রের মধ্যে যেখানে তিনি উদ্ভট চমকসৃষ্টির সম্ভাব্য সুযোগ পেয়েছেন, পুরাণে উপেক্ষিত বা অনুক্ত চরিত্র ঘটনা ভাবনা যেখানে পেয়েছেন, কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা সেখানে চোলাই করে দিয়েছেন। ফল হয়েছে এই যে, পৌরাণিক কাহিনী-চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যে বিশ্বাস ও সংস্কার স্থির হয়ে আছে, তারই পাশে লেখকের একটি উদ্ভট পুরাণ-সৃষ্টি দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও সঙ্গতিবোধকে আলোড়িত করেছে, উৎকেন্দ্রিকতার হাসি সরব করে তুলেছে। উদ্ভট চমক হেনে উদ্ভট পুরাণ সৃষ্টিই রাজশেখরের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির বেশি সংখ্যক গল্পে লক্ষ্য করা গেছে।

যেমন 'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্প। দুর্বাসা পুরাণের ঋষি চরিত্র। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরের লোক তিনি। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শকুন্তলা জুড়ে কোপনস্বভাব দুর্বাসার বিচরণ আমরা আবাল্য শুনে এসেছি। সেই দুর্বাসাকে রাজশেখর 'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্পে একদিন হৃষিকেশ তীর্থে পুলিন ও পল্টুর খাটিয়ার ওপর উপস্থিত করে দিয়ে এবং তাঁর মুখে খাস বাংলায় পুরি তরকারি পেড়ার অর্ডার দিয়ে দুর্বাসার কাল ও আচরণ সম্বন্ধে আমাদের বদ্ধমূল ধারণায় একটা অবিশ্বাস্য হাসির চমক হানলেন।

দুর্বাসার এই অসম্ভব উপস্থিতিটা দিয়ে এক নব্যপুরাণ সৃষ্টি করে লেখক

---

৮. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় – 'কথাসাহিত্য' পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা।

হাসিকে স্ফীত করেছেন। দুর্বাসা শকুন্তলাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন একথা পৌরাণিক সত্য। হেমকুট পর্বতে কশ্যপের আশ্রমে শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়েছে, এ-ত পৌরাণিক। মেনকা যে শকুন্তলার মা, সেকথা পুরাণ-সমর্থিত। এই পৌরাণিক সত্যের মধ্যে রাজশেখর উদ্ভট কল্পনার সঞ্চরণের অবকাশ খুঁজলেন। তিনি আশ্রয় করলেন মেনকার নারীমনের সম্ভাব্য দুর্বলতাকে। মেনকার ইচ্ছা শকুন্তলার সন্তান ভরতকে একবার দেখে আসবে। মেনকার এই বাসনাটি পুরাণে উপেক্ষিত। রাজশেখর এই পুরাণে উপেক্ষিত কাহিনী উদ্ভাবন করলেন। এই বাসনায় বাধা হেনেছে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের পরিণয় উৎসব। উৎসববাসরে মেনকার নৃত্যসূচী রয়েছে। ওদিকে ভরতের জন্য মেনকা একটি ঝুমঝুমি কিনেছেন। কাকে দিয়ে পাঠাবেন ভাবতে গিয়ে দুর্বাসাকে মনে পড়ল। ছলনাদক্ষা মেনকা দুর্বাসাকে সম্মত করলেন। হাতে ঝুমঝুমি দিয়ে বললেন, "এই নাও ঝুমঝুমি। খবরদার হারিও না যেন, তাহলে মজা টের পাবে।" দুর্বাসা চললেন হেমকুটে। হেমকুটে পৌঁছে আশীর্বাদ সমাপণান্তে ট্যাঁক থেকে ঝুমঝুমি বার করতে গিয়েই চক্ষুস্থির। পরণের কাপড় উত্তরীয় কম্বল সব ঝাড়লেন. ঝুলি, ঘটি মায় জটা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। শকুন্তলা কাঁদো কাঁদো। আশ্রমবাসিনীরা ধিক্কার দিলেন। লজ্জিত, প্রতিশ্রুতিভঙ্গকারী দুর্বাসা নতমুখে বেরিয়ে এলেন। সেদিন থেকে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, দুর্বাসা প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের পাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কোপনস্বভাব ভোঁতা হয়েছে, তিনি বিষণ্ন, অতিশপ্ত, দিনরাত ঝুমঝুম শব্দ শোনেন। পরশুরাম এই উদ্ভট কাব্য-পুরাণ এখানেই শেষ করলেন না। দুর্বাসার 'দয়া-মায়ার' এই উদ্ভট কাহিনীকে গল্পের শেষ দিকে আরেকটা হাস্যচমকে জলস্তম্ভের মত জাগিয়ে দিয়ে অজস্র হাস্যশীকরে ছড়িয়ে দিলেন। পল্টুর পোষা ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে হাজার হাজার বছরের পূর্বেকার সেই ঝুমঝুমিকে তিনি বার করে দিলেন দুর্বাসারই দাড়ির গেরো থেকে। এবং অখণ্ড ভারতের সম্পত্তি ভরতের এই ঝুমঝুমিকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারতকে দুই খণ্ড দান করবার জন্য দুর্বাসা চললেন দশ টাকার একখানা নোট নিয়ে দিল্লী ও করাচীতে।

বঙ্গভঙ্গের ওপর এখানে হয়তো একটু সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। বদরাগী দুর্বাসাকে নিয়ে একটু কৌতুকের ছোঁয়া মনে লাগতে পারে। কিন্তু দুর্বাসা কাহিনীর এমন উদ্ভটতার হাস্যের মধ্যে তা জারিত হয়ে গেছে।

	গল্প :	গল্পগ্রন্থ :
১।	ভরতের ঝুমঝুমি	ধুস্তরী মায়া
২।	রেবতীর পতিলাভ	ঐ
৩।	অদল বদল	আনন্দীবাঈ
৪।	কর্দম মেখলা	চমৎকুমারী
৫।	জাবালি	কজ্জলী
৬।	বালখিল্যগণের উৎপত্তি	কৃষ্ণকলি
৭।	পঙ্কপ্রিয়া পাঞ্চালী	ঐ
৮।	ভীমগীতা	গল্পকল্প
৯।	হনুমানের স্বপ্ন	হনুমানের স্বপ্ন
১০।	প্রেমচক্র	ঐ
১১।	তৃতীয় দ্যূতসভা	ঐ
১২।	স্মৃতিকথা	নীলতারা

'রেবতীর পতিলাভ' গল্পের উপাদান পরশুরাম নিয়েছেন বিষ্ণু পুরাণ থেকে। পুরাণে রয়েছে বলরাম তাঁর লাঙ্গল দিয়ে অতিদীর্ঘ রেবতীকে টেনে ছোট করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।[১] পত্নীলাভের এই উদ্ভট কাহিনী পরশুরামের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির প্রতিভাকে আকর্ষণ করেছে। এই ক্ষুদ্র আখ্যানটিকে তিনি তাঁর স্বকীয়ভঙ্গীতে উৎকল্পনার শিল্পরীতিতে বিশুদ্ধ হাস্যের একটি পূর্ণাঙ্গ গল্পে রূপ দিয়েছেন। পুরাণের ওপর তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি দেখালেন বলদেবের লাঙ্গল ব্যবহারে অপটুতা দেখিয়ে। উনিশহাত রেবতীর কাঁধে লাঙ্গল আটকে

১. রাজশেখর বসু বলেছেন, এর উৎস বিষ্ণু পুরাণ। পৌরাণিক অভিধান লিখেছেন 'হরিবংশ' :—

"রেবতী এত সুন্দরী ছিলেন যে, তাঁর পিতা পৃথিবীতে তাঁর কন্যার উপযুক্ত কোন পাত্র না পেয়ে ব্রহ্মার পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বর্গে যান। ব্রহ্মা রৈবতকে দ্বারকায় গিয়ে বলরামের হাতে এই কন্যাকে সম্প্রদান করতে বললেন। নিজের অজ্ঞাতসারে লক্ষ বৎসর ব্রহ্মলোকে বাস করবার পর পৃথিবীতে ফিরে এসে রৈবত দেখলেন, মনুষ্যজাতির অবনতি হয়েছে। তারা খর্বাকৃতি, ক্ষীণদেহ ও বুদ্ধিহীন হয়েছে। তিনি ফিরে এসেই দ্বারকাতে গিয়ে বলরামের হস্তে কন্যা রেবতীকে দান করেন। অত্যন্ত দীর্ঘাঙ্গী অপরূপ সুন্দরী রেবতীকে দেখে বলরাম তাঁর হল দিয়ে এই দীর্ঘাঙ্গীকে একটু ছোট করে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। (হরিবংশ) পৌরাণিক অভিধান : শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার।

তাকে টেনে ছোট করতে গিয়ে (কৃষ্ণের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও) বলদেব একেবারে তিন হাতে নামিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, 'এঃ দাদা, তুমি বড্ড বেশী টেনে ফেলেছ।' বলদেব মেপে দেখে বললেন, 'এখনই ঠিক করে দিচ্ছি।' তিন হাত রেবতীকে সোয়াচার হাত বলদেবের যোগ্য করবার জন্য পরবর্তী যে প্রচেষ্টা সে অতি উদ্ভট প্রচেষ্টা, রাজশেখরের মৌলিক উদ্ভাবনা। আর সে-উদ্ভাবনারই পুরাণ থেকে এ-গল্প স্বতন্ত্র হয়েছে। বলদেব রেবতীর কাছে একটু অপটুতার জন্য মার্জনা চেয়ে তাকে একটি বকুলগাছের শাখায় ঝুলিয়ে দিয়ে তার দুই পা ধরে ধীরে ধীরে টানতে লাগলেন। কৃষ্ণ সতর্ক হয়ে দেখছিলেন। দৃষ্টিতে পরিমাপ করে তিনি বললেন, "আর একটু—আরও একটু—এইবারে থাম, ঠিক হয়েছে।" উনিশ হাত কনেকে লাঙল দিয়ে টেনে তিন হাত করে, এবং তিন হাত কনেকে পা ধরে টেনে বরের থেকে লম্বায় সাত আঙুল ছোট করে, পরশুরাম সত্যযুগের রেবতীর পতিলাভ ঘটালেন।

পুরাণের ভক্তিগত আবহের মধ্যে এই ছোট আখ্যানটিতে দুর্দান্ত হাসির যে সম্ভাবনা যুগ যুগ ধরে স্তব্ধ ছিল, রাজশেখরের উদ্ভাবনী-শক্তি তাকে প্রসন্ন অনিয়ন্ত্রিত হাস্যে প্রবাহিত করেছে। রেবতীর সত্যযুগের দৈর্ঘ্যের ওপর কলিযুগের বলদেবের অপটু হস্তচালনার সহায়ক রূপে কৃষ্ণকে এনে, এবং দু'ভায়ের আচরণের কাছে রেবতীর হতভম্ব সমর্পিত ভাব দেখিয়ে উদ্ভট চাল চালনার অতি নৈপুণ্য দেখিয়েছেন পরশুরাম। সে নিপুণতা যেমন চরিত্রগুলির কথোপকথনের প্রাঞ্জল সরসতায় হেসে উঠেছে, তা গল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতার শিল্প সুষমায় উপচে পড়েছে। গল্পের শেষের দিকে কৃষ্ণকে এড়িয়ে রেবতীকে নিকটের একটি জলাশয়-এর ধারে এনে যুগল মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলদেব বললেন, 'রেবতী, দেখ তো, এইবারে আমি তোমার যোগ্য হয়েছি কিনা। এখন মনে ধরেছে কি ?

রেবতী বললেন, মনে না ধরলেই বা উপায় কি। অবতার না আরও কিছু। দুই ভাই দুটি ডাকাত। তোমাদের মতলব আগে টের পেলে আমিই দুজনকে টেনে লম্বা করে দিতুম।'

বরকনের এই দাম্পত্য রসিকতাটুকু উচ্চ হাসির গল্পটির ওপর মিলনমধুর সানাই-এর সুর বাজিয়ে দিয়েছে। রাজশেখরের গল্পসৃষ্টির এই যে উচ্চাঙ্গের প্রসাধন-কলা এর পশ্চাতে রয়েছে তাঁর নাগরী-মনের চাতুর্য। পরে আলোচনা

করে দেখান যাবে যে এক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরী ত্রৈলোক্যনাথের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন।

'অদলবদল' গল্পে রাজশেখর কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের অভিশপ্ত যক্ষের সঙ্গে মহাভারতের শিখণ্ডীর এবং শিখণ্ডীর সঙ্গে বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের পুরুষত্ব বিনিময়ের এক অনুক্ত কাহিনী আবিষ্কার করে উৎকেন্দ্রিকতার হাসি সৃষ্টি করেছেন। এত বড় অসম্ভবটাকে স্রষ্টার ত্রিলোকচারী উদ্ভট কল্পনার উদ্ভাবনী শক্তি প্রাঞ্জল নাগরিকতার সরস গল্প কথনভঙ্গীতে অনায়াস অপূর্ব করে তুলেছে।

মহাভারতে অম্বার শিখণ্ডীরূপে জন্মলাভের যে কাহিনী রয়েছে, সেখানে এও রয়েছে যে দ্রুপদরাজ তাঁর কন্যাকে কিছুদিনের জন্য পুত্র বলে চালাবার মিথ্যাচরণ করেছেন। বিবাহের পর তা ধরা পড়ায় শিখণ্ডী প্রাণত্যাগ করতে অরণ্যে যান। অরণ্যে কুবেরের অনুচর যক্ষ স্থূণাকর্ণ তার পুরুষত্ব শিখণ্ডীকে দান করে স্ত্রী হয়ে থাকে। রাজশেখর পুরাণের এই কাহিনী বিকৃত করেননি। অদল বদলের হাস্য অনিয়ন্ত্রিত করেছেন, প্রথমত মহাভারতের এই যক্ষ স্থূণাকর্ণ আর মেঘদূতের যক্ষকে অভিন্ন করে। মেঘদূত কাব্যে কালিদাস অভিশাপ অন্তে যক্ষের প্রত্যাবর্তন-এর কথা লেখেননি। কেবল প্রত্যাবর্তনের আশ্বাস মেঘমুখে পাঠিয়েছেন। মহাভারতেও স্থূণাকর্ণ যক্ষের প্রকৃত ইতিহাস নেই। কালিদাস আর ব্যাসদেব যা অনুক্ত রেখেছেন, তা নিয়ে রাজশেখরের উৎকেন্দ্রিক কল্পনা এক বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটন করেছে।

বর্ষভোগ্য অভিশাপের সমাপনে যক্ষপ্রিয়া দেখল স্বামী ফিরছে না। চিন্তিত আকুল যক্ষিণী কুবেরকে সঙ্গে করে রামগিরি আশ্রমে স্বামীকে খুঁজতে নেমে এলো। যক্ষের রুদ্ধ-দুয়ার আশ্রম থেকে মাছভাজার গন্ধ পেয়ে ব্যাকুল যক্ষিণী স্বামীকে ডাকল। আশ্চর্য হয়ে দু'জনে দেখল এক অবগুণ্ঠিতা নারীমূর্তি বেরিয়ে এসেছে। যক্ষিণী একটানে ঘোমটাবতীর ঘোমটা খুলে ফেললে অবগুণ্ঠিতা মাথা চাপড়ে বলল—"আমিই যক্ষ স্থূণাকর্ণ।......পরের উপকার করতে গিয়ে আমার এই দুরবস্থা হয়েছে। প্রিয়ে, আমরা নিতান্তই হতভাগ্য, শাপান্ত হলেও আমাদের মিলন হবার উপায় নেই।" যক্ষ তার স্ত্রী এবং মহারাজ কুবেরকে শিখণ্ডীর সঙ্গে পুরুষত্ব বদলের দুর্ঘটনা শোনালেন। বিমর্ষ যক্ষ ও যক্ষিণীকে আশ্বাস দিয়ে কুবের শিখণ্ডীকে ধরে তাকে ধমকে যক্ষের পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিয়ে

অলকায় ফিরে গেলেন। শিখণ্ডী ফিরে গেলেন পূর্বের রমণীত্বে। কিন্তু তার পুরুষত্ব তো ফিরিয়ে দিতে হল।

রাজশেখর তাঁর উৎকেন্দ্রিক কল্পনার চরম শক্তিবলে এই অসহায়া শিখণ্ডিনীকে পুরুষত্ব দান করে মহাভারতের শিখণ্ডী আখ্যানকে অক্ষুণ্ণ রাখলেন। কৃষ্ণ ও নারদকে এক বৈঠকে বসিয়ে স-নারদ শিখণ্ডিনীকে পুরুষত্বের জন্য পাঠালেন বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের কাছে। আয়ান ঘোষের ক্লীবত্ব রাজশেখরের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি এই অনুক্ত কাহিনী আবিষ্কার করলেন যে, নারদের মধ্যস্থতায় এবং শিখণ্ডিনীর ছলা-কলায় আয়ান ঘোষ তার পুরুষত্ব শিখণ্ডিনীকে দান করে নপুংসক হয়েছিলেন। কথা ছিল শিখণ্ডী ভীষ্ম বধ করে ফিরে এসে আয়ানকে তার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দেবে এবং প্রতিদানে নিজের নারীত্ব নিয়ে আয়ানকে বরণ করবে। কিন্তু অশ্বত্থামার হাতে শিখণ্ডী নিহত হলেন। আয়ান চিরনপুংসক রয়ে গেলেন।

শিখণ্ডীর নপুংসক চরিত্র নিয়ে রাজশেখরের উদ্ভট কল্পনার অঘটন ঘটন-পটীয়সী শক্তি মেঘদূত, মহাভারত ও বৈষ্ণব কাহিনীকে এক সূত্রে এক উচ্চহাসির গল্পের দেহে বেঁধে দিয়েছে। আয়ানের পুরাণ-প্রতিষ্ঠিত যে নপুংসকতা, তা বেদনার একটু অনুভব সৃষ্টি করতে চাইলেও, উদ্ভটতার ত্রিলোক বিস্তারী হাস্যের তলে মিলিয়ে গেছে।

'কর্দম মেখলা' গল্পে রাজশেখর বিশ্বামিত্র এবং মেনকাকে নিয়ে উৎকল্পনার বন্যা মুক্ত করলেন। বিশ্বামিত্রের মেনকার রূপের প্রতি আসক্তি এবং পরে চৈতন্যোদয়ে মেনকাবর্জন—এই যে কাহিনী এর মাঝখানে রাজশেখরের উদ্ভট-বিহারী মন এক অনুক্ত কাহিনী খুঁজে পেয়েছে। সে-কাহিনী হল, হঠাৎ চৈতন্যোদয়ে বিশ্বামিত্রের যে মেনকাবিতৃষ্ণা দেখা গেল তাতে মেনকা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং ক্রোধের চিহ্নস্বরূপ পুষ্কর হ্রদের একতাল কাদা দু'হাতে পাকিয়ে হঠাৎ বিশ্বামিত্রের দিকে ছুঁড়ে মেরে বিদায় নিলেন। বিশ্বামিত্র চমকে উঠে দেখলেন তার কটিদেশে সাপের মত জড়িয়ে গেছে কাদার পিণ্ডটা। হিমাচল থেকে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যন্ত সকল তীর্থ সলিলে অবগাহন সত্ত্বেও এই কর্দম মেখলা ধৌত হল না। শেষে কণ্বর আশ্রমে মেনকারই গর্ভজাত স্বীয় কন্যা শকুন্তলার স্পর্শে কর্দম মেখলা থেকে বিশ্বামিত্র মুক্তি পেলেন। গল্পের উৎকেন্দ্রিকতার হাসি স্থির হয়ে আছে বিশ্বামিত্রের কটিদেশ-আশ্রয়ী এই কর্দম মেখলার উদ্ভট উদ্ভাবনে।

শকু, অনু, প্রিয়, তাদের পিসীমা গৌতমী, বিশ্বামিত্র এবং মেনকা—এই দূরায়ত পুরাণের চরিত্রের ওপর একটি লঘু পারিবারিক পরিবেশ আরোপ করে অসঙ্গতির হাস্য আরও সরব করে তুলেছেন। মালিনী নদীর পাঁক থেকে আঁকশি ও চাচাড়ির সাহায্যে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের উদ্ধার দৃশ্য, পুষ্করতীরে কাকুই হাতে এলায়িত-কেশ মেনকা ও পার্শ্বোপবেষ্টা রাজর্ষির কথোপকথনের দৃশ্য উদ্ভট কল্পনার সরব হাস্যসৃষ্টির অনন্য চিত্র।

'জাবালি' গল্পে হাস্যরস জমেছে জাবালির একটি অনুক্ত কাহিনী উদ্ভাবনায়। রামায়ণে জাবালি একটি ভাবের বাহক। ব্যবহার বুদ্ধিযুক্ত শাস্ত্রের তিনি প্রচারক। দশরথ তাঁকে প্রশ্রয় দিলেও রামচন্দ্র তাঁর প্রতিজ্ঞা নষ্ট করেছেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, দুর্বাসা, ব্যাসাদি যেমন পুরাণ রামায়ণ মহাভারতে অতি ব্যস্ত সঞ্চরমাণ চরিত্র, তুলনায় জাবালি উপেক্ষিত। রাজশেখরের প্রতিভা উপেক্ষিত জাবালিকে স্পর্শ করেছে। রামায়ণে জাবালি ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের প্রত্যানয়নের জন্য চিত্রকূটে গিয়েছিলেন। চিত্রকূটে রামচন্দ্রের দ্বারা নিন্দিত হয়ে তিনি রামায়ণ থেকে বিদায় নিয়েছেন। চিত্রকূট থেকে ফিরে জাবালি কি করলেন, কোথায় গেলেন, রামায়ণকার তার সংবাদ দেননি। এই সুযোগটি নিলেন রাজশেখর তাঁর উদ্ভট কল্পনার গল্পসৃষ্টির জন্য। তিনি রামায়ণ-অনুক্ত এক জাবালি কাহিনী উদ্ভাবন করলেন। খর্বট-খল্লাট-খলিতাদি বালখিল্যগণের সঙ্গে জাবালির দ্বন্দ্বের এক হাস্যময় পরিণতি সৃষ্টিতে, জাবালির মৎস্যশিকারকে তীব্র তপস্যা মনে করে তপস্যাভঙ্গার্থে ইন্দ্র কর্তৃক বৃদ্ধা অপ্সরা ঘৃতাচীর প্রেরণে এবং তার সঙ্গে জাবালির রসিকতা ও ঝাঁটা হস্তে জাবালি পত্নীর আচরণে রাজশেখর তাঁর খেয়ালী কল্পনার শিল্পময় যথেচ্ছাচারের শক্তি দেখিয়েছেন। রাজশেখরের অনন্য সংলাপসৃষ্টি কৌশল, তীক্ষ্ণ ক্ষুদ্র সংলাপে জমাট অসঙ্গতির হাস্যময় চিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য 'জাবালি' গল্পের হাসিকে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছে। এবং এই উচ্ছ্বসিত হাসির জন্যই ঘৃতাচীর প্রসাধন কল্পনার মধ্যে অত্যাধুনিকার প্রসাধন চাতুর্যের প্রতি যদি ইঙ্গিত থেকে থাকে, তা সহাস্য হয়ে উঠেছে।

'বালখিল্যগণের উৎপত্তি' গল্পের শুরুতেই রাজশেখর গম্ভীরভাবে বললেন, "পুরাণে আছে, বালখিল্য মুনিরা বুড়ো আঙুলের মতন লম্বা এবং সংখ্যায় ষাট হাজার। তাঁদের পিতার নাম ক্রতু, মাতার নাম ক্রিয়া। এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ, এতে কিছু ভুলও আছে। বালখিল্যগণের প্রকৃত ইতিহাস বিবৃত করছি।"

এই গম্ভীর সমালোচনামূলক ভূমিকার মধ্যে রাজশেখর পরিবেশন করলেন তাঁর উৎকল্পনার হাস্যময় প্রতিভাকে। তিনি উদ্ভাবন করলেন, বালখিল্যগণের উৎপত্তির পশ্চাতে রয়েছে সে-যুগের ত্রিশঙ্কুপন্থী এক ভ্রূণ বিপ্লবের অনুক্ত ইতিহাস। সে বিচিত্র রহস্য-ইতিহাস উদ্‌ঘাটনে রাজশেখর পাঠকের পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কারকে উলট-পাক খাইয়ে দিয়ে এক উচ্চ হাসির কলরব সৃষ্টি করেছেন। একদিন পত্নী ক্রিয়াকে ক্রতু ব্যাকরণ শেখাচ্ছিলেন। সহসা একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল—

—'আপনি সব ভুল শেখাচ্ছেন। ওসব সেকেলে ব্যাকরণ চলবে না।' অনুসন্ধানে দেখা গেল ক্রিয়ার গর্ভস্থ সন্তান পিতার সমালোচনা করছে। এই ভ্রূণই একদিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিতে গোমতী তীরে গর্ভিনী নারীর স্নান উৎসবে ষাট হাজার জননীর ভ্রূণকে নেতৃত্ব দিল এক হওয়ার মন্ত্রে।

—বিশ্বের অপোগণ্ড এক হও।

—এক হব। ....

—সকলে আরাব উত্তোলন কর—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কোনও দেবতা মানব না।

—মানব না।

—পিতা মাতা গুরু কারও শাসন মানব না।

—মানব না।

—গুরুকে আর ডরাব না, গুরুর গরু চরাব না। গুরুকুলে নাহি রব, না পড়ে পণ্ডিত হব।

—না পড়ে পণ্ডিত হব।

—তবে কাকে মানবে, কার আজ্ঞায় চলবে?

—তাইতো. কাকে মানব?

—আদি বিদ্রোহী মহান ত্রিশঙ্কুকে, যিনি ঊর্ধ্বপাদ অধঃশিরা হয়ে রাশি-চক্রের বহির্দেশে বিদ্যমান রয়েছেন।

—মহান ত্রিশঙ্কু বিদ্যতাম, অন্য গুরু ম্রিয়তাম।

—ত্রিশঙ্কুর জন্য যিনি আকাশে নূতন স্বর্গলোক সৃষ্টি করেছেন সেই বশিষ্ঠ-শত্রু বিশ্বামিত্রকেও ধন্যবাদ দাও।

—বিশ্বামিত্র ধন্যবাদ, বশিষ্ঠাদি নিন্দাবাদ।

—ভ্রাতৃগণ, এইবারে গর্ভকারা থেকে বেরিয়ে এস, স্বাধীন হও, বসুন্ধরা ভোগ কর।

—কিন্তু এখন যে পাঁচ মাসও পূর্ণ হয়নি।

—তর্ক করো না, ত্রিশঙ্কুর আজ্ঞা, ভূমিষ্ঠ হও।

—আমাদের পালন করবে কে, খেতে দেবে কে ?

—তর্ক করো না—তোমাদের স্নেহান্ধ মূর্খ পিতামাতাই পালন করবে। নিষ্ক্রান্ত হও।

তখন ষাট হাজার ভ্রূণ গর্ভচ্যুত হল। এরাই খর্বাকৃতি বালখিল্যগণ। রাজশেখরের এই অদ্ভুত চমক সৃষ্টি উচ্চ হাস্যধ্বনিতে মুখরিত। বালখিল্যগণের উৎপত্তির এই নব্য ইতিহাস রাজশেখরের কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতার এক অনন্য বিস্ময়।

গর্ভচ্যুত হয়ে ষাট হাজার মুনি-তনয় আরাব তুলল—

—'দুধ খাব, দুধ খাব। মহান ত্রিশঙ্কু বিজ্ঞতাম, বশিষ্ঠ ঋষি প্রিয়তাম। বালখিল্য বর্ধতাম, আর সবাই ক্ষীয়তাম।' এই সদ্য গর্ভমুক্ত মূর্তিমান বিদ্রোহীদের ভয়ে মুনিসমাজ ত্রিশঙ্কুর যাজক বিশ্বামিত্রের স্মরণাপন্ন হলেন। তিনি এই বিপ্লবী বালখিল্য চমূকে শান্ত করেন বাদুড়ের দুধ খাইয়ে। মালম্ব তীর্থের বটবৃক্ষাশ্রয়ী স্ত্রী বাদুড়দের বক্ষোলগ্ন করে সেদিনকার মুনিসমাজকে বিশ্বামিত্র এক প্রচণ্ড ভ্রূণবিপ্লবের পরিণতি থেকে রক্ষা করলেন।

বালখিল্যগণের উৎপত্তির এই উদ্ভট ইতিহাস উদ্ঘাটনের পেছনে হয়তো বর্তমান সমাজের পটে তরুণদলের অসংযম, তাদের আন্দোলন-প্রিয়তা, শ্রদ্ধা-ভক্তির ক্রমাবনতি, এবং সরকারী দমননীতির বাস্তব চিত্রটা কাজ করেছে। কিন্তু সে পশ্চাদ্‌ভূমি এই উদ্ভট পুরাণ কল্পনার উচ্ছ্বসিত হাস্যের তলে কোন তীব্র বিদ্রূপ কষাঘাতে জ্বলে না উঠে উদ্ভট পুরাণ সৃষ্টির অনিয়ন্ত্রিত হাস্যের ফলশ্রুতিকেই সফেন করে তুলেছে।

'পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী' গল্পে রাজশেখরের হাস্যোজ্জ্বল মন পঞ্চপাণ্ডব, পাঞ্চালী, কৃষ্ণ এবং অধ্যাত্ম-জগৎচারী বয়ঃপ্রবীণ ঋষি জলজ্জটকে নিয়ে এক উলট-পুরাণ কল্পনার হাস্যে মেতে উঠেছে। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে পাঞ্চালীর গৃহ-অশান্তির এক আসন্ন ঝড়কে জলজ্জট ও কৃষ্ণ এক অদ্ভুত দক্ষ অভিনয়ে কি করে থামিয়ে দিলেন, মহাভারত-অনুক্ত সেই কাহিনী এ-গল্পের হাস্যের মূলে। গৃহবিবাদ নিরসনে

কৃষ্ণ ও জলজ্জটের যে কৌশল, তাতে পাঠক তো দূরস্থ, অধ্যাত্ম-গভীর ভয়ংকর জলজ্জট ঋষিকে পর্যন্ত হাস্যদমনের চেষ্টা করতে হয়েছে।

'ভীমগীতা' গল্পে রাজশেখরের উদ্ভট কল্পনাপ্রিয়তা হাস্যসৃষ্টি করেছে ভীমের মুখে তত্ত্বকথা দিয়ে এক নতুন গীতা সৃষ্টির চেষ্টায়। ভীম ভোজন-বিলাসী, একগুঁয়ে, দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধা। নিজের সম্বন্ধে এই জনমতে ভীম নিজেও বিশ্বাসী। সে অপবাদকে খণ্ডন করবার জন্য কৃষ্ণের সঙ্গে ভীম ষড়রিপু নিয়ে কিছু তত্ত্বকথার অবতারণা করলেন। ভীম সম্বন্ধে পাঠকমনে এমন একটা আবাল্য ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, সেখানে যুদ্ধ ছাড়া, ভোজন ছাড়া কোন গভীর গূঢ়তত্ত্ব, ভাবনা স্থান পায় না। ভীমের মুখে রিপু নিয়ে গভীর আলোচনা শুনে আমাদের ভীম সংস্কার মুখ টিপে হাসতে চায়। গল্পে কৃষ্ণের মুখেও এই চোরা হাসি লক্ষণীয়। ফলে গল্পটিতে ভীমগীতা তাত্ত্বিক গভীরতা হারিয়ে একটা চোরা হাসিতে খচিত হয়ে উঠেছে। ভীমের প্রবল উপস্থিতি দেখে তাঁর আলোচনা নিয়ে লেখক বোধহয় উচ্চ হাসির সাহস পাননি, পাঠকও পাননি, বোধহয় কৃষ্ণও না। উৎকেন্দ্রিকতার এ-গল্পে হাসি অনুচ্ছ্বসিত হলেও রুদ্ধপ্রকাশ একটি বিচিত্র রহস্য স্বাদে মণ্ডিত হয়েছে। এ ধরণের গল্পে রাজশেখরের স্বকীয়তা প্রশংসনীয়। 'তৃতীয় দ্যূতসভা' ভীমগীতার সমগোত্রীয় স্বাদের গল্প।

রামায়ণকার হনুমানকে চিরকুমার করে রেখে দিয়েছেন। জন্মক্ষণেই সূর্য ধরার উল্লম্ফনের কর্মতৎপরতা থেকে হনুমান একটা কর্মময় চরিত্র। বিয়ের অবকাশ সে পায়নি। রাজশেখর হনুমানের কৌমার্য ভেঙ্গে সিদ্ধরসের বিরোধিতা করেন নি। কিন্তু হনুমানের রক্তমাংসের দেহে বিয়ের বাসনা কি কোনদিন জাগে নি? রামায়ণে সে কথা উপেক্ষিত। রাজশেখরের উৎকেন্দ্রিকতা-প্রিয় কল্পনা সেই সম্ভাব্য বাসনাটুকু আশ্রয় করে 'হনুমানের স্বপ্ন' গল্পে হনুমানকে বিয়ে দেবার উদ্ভট চেষ্টা করলেন। রাজশেখরের এই উদ্ভট চেষ্টা স্বরূপেই হাস্যকর। তথাপি সে চেষ্টার ফলে হনুমানের কৌমার্য দূর হবার যা কিছু সম্ভাবনা ছিল, হনুর দুর্দান্ত আনাড়ী পৌরুষের প্রবল করস্পর্শে সে সম্ভাবনা অবশেষ হয়ে গল্পের হাসিকে স্ফীত করে তুলেছে। রাজকন্যা চিলিম্পার প্রতি হনুমানের মুগ্ধতা, হনুমান ও চিলিম্পার প্রেমালাপ এবং ক্রুদ্ধ হনুমান কতৃক চিলিম্পার কেশাকর্ষণ ও শূন্যমার্গে গমন—ইত্যাদির দৃশ্য গল্পের উদ্ভট কল্পনার হাস্যকে উতরোল করে তুলেছে।

'প্রেমচক্র' গল্পকে গল্পের অর্ডার-কর্তা বক্তা এক সময় গাঁজাখুরি বলে অভিহিত

করেছে। প্রেমের মত এক গুরুতর হৃদয়ের ব্যাপার নিয়েও রাজশেখর তাঁর খেয়ালী কল্পনার হাস্যসৃষ্টি করতে সাহস করেছেন। একটা দক্ষিণাবর্তী প্রেমচক্রের কেন্দ্রে অস্পষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অতনু রেখে এবং তার ব্যাসে তিনটি ঋষি-কুমার ও ঋষি-কন্যাকে এনে স্বর্গ মর্ত্য জুড়ে রাজশেখর চক্রটাকে ঘুরিয়েছেন। এই পথেই এসেছে কন্দর্পের প্রভাবে ভুণ্ডিল মুনির স্ত্রীলাভের এবং আত্ম-সমাধির অদ্ভুত কাহিনী, পূর্ণচন্দ্র ধরে তাতে একটু একটু মাখন মাখিয়ে রাহুর তা কামড়ে কামড়ে খাবার উদ্ভট হাস্যদৃশ্য। গল্পটিতে প্রেমের হার্দিক গভীরতা সৃষ্টির একটা কৃত্রিম চেষ্টা উৎকল্পনায় হাস্যমুখর হয়ে উঠেছে। এবং একটা রহস্য-স্বাদ হাসির মধ্যে সঞ্চারিত করে হাস্যের স্বাদ-বৈচিত্র্য এনেছেন।

'তৃতীয় দ্যূতসভা' রাজশেখরের খেয়ালীমনের মহাভারত-অনুক্ত এক বিস্ময়কর উদ্ভাবনা। যুধিষ্ঠিরের মত অতিদক্ষ এক অক্ষক্রীড়কের সঙ্গে অক্ষখেলায় শকুনির 'এই জিতিলাম' বলে সপ্রত্যয় বারবার বিজয়ের মূলে নিশ্চয়ই কোন কারচুপি রয়েছে। রাজশেখরের উদ্ভটতাপ্রিয় মনের এই ভাবনা থেকে এই 'তৃতীয় দ্যূত-সভা'র সৃষ্টি। শকুনির বৈমাত্র ভ্রাতা মংকুনিকে এনে, তার হাতের তৈরি পাশা যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে রাজশেখর শকুনির 'নিকৃতি' ধরে ফেললেন। এবারের খেলায় বিজয়ী হলেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু সমস্ত সভা সবিস্ময়ে দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পতিত পাশা ধীরে ধীরে লাফিয়ে লাফিয়ে শকুনির পাশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তখন বিচারক বলরাম যুধিষ্ঠিরের পাশা নিয়ে এবং পাশা সমর্পণে অনিচ্ছুক শকুনির গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে তার পাশা ছিনিয়ে নিয়ে পরীক্ষার জন্য ভাঙলেন। দেখলেন, যুধিষ্ঠিরের পাশার মধ্যে রয়েছে একটি টিকটিকি এবং শকুনির পাশার মধ্যে টিকটিকির ভয়ে নির্জীব এক ঘুর্ঘুর পোকা রয়েছে। অবাধ্য ঘুর্ঘুর পোকাই পূর্ববর্তী দুটি দ্যূত খেলায় শকুনির পাশা চিৎ করে দিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনা করেছে।...রাজশেখরের উদ্ভট কল্পনা এ-গল্পে এক অসাধারণ মৌলিক শক্তির পরিচয়ে চমৎকার। কিন্তু 'ভীমগীতা'র মত 'তৃতীয় দ্যূতসভা' গল্পেও হাসির উচ্ছ্বাসটা প্রকাশ-প্রতীক্ষায় স্তব্ধ। শিল্পীর এটা কৌশল। উদ্গত হাসিটাকে স্বচ্ছতায় আবৃত করে তিনি তার চারদিকে কয়েকটি অসঙ্গতিময় চিত্র এনে হাসির আবহটা রক্ষা করেছে—যেমন যুধিষ্ঠিরের হিসেব পর্যবেক্ষণের দৃশ্য, কিঞ্চিৎ মত্ত বিচারক বলরামের ভূমিকা। ফলে গল্পটিতে 'ভীমগীতা'র মতই অন্তর-বাইরে একটি বিস্ফোরণোন্মুখ হাসি রচিত হয়েছে।

'স্মৃতিকথা' গল্পে রাজশেখরের উদ্ভট কল্পনার হাস্য এক অনন্য নৈপুণ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তিনটি সাধারণ সংবাদ দিয়ে তিনটি উদ্ভট চমক রচনা করে রাজশেখর এক অনিয়ন্ত্রিত হাসি সৃষ্টি করেছেন। যতটা মদ খেলে নেশা হয়, ঘাড়ে কতটা চাপ দিলে শিরদাঁড়া ভাঙতে পারে, ঠিক কোন অবস্থায় ব্রীচ্ অব্ প্রমিস মকদ্দমা চলতে পারে—এই তিনটি 'একস্‌পার্ট ওপিনিয়ান' আহরণ করে একটা সততা-ভরা বাস্তব গল্প পরিবেশনের জন্য পাঠকমনকে প্রস্তুত করলেন। সে পটে রাজকীয় আড়ম্বরে প্রবেশ করলেন রামায়ণের শূর্পনখা। এবং পূর্বের আহৃত এই একস্‌পার্ট ওপিনিয়ান তিনটিকে স্রষ্টা কাজে লাগালেন শূর্পনখারই রামায়ণ-অনুক্ত এক অদ্ভুত প্রেম-কাহিনীর স্মৃতিকথায়। শূর্পনখা তার স্মৃতিকথার বক্তা, শ্রোতা তারই ভ্রাতুষ্পুত্রী পুষ্কলা। শূর্পনখা দণ্ডকারণ্যে মুদ্গল নামে এক ঋষিতনয়কে পছন্দ করেছিলেন। তাকে কৌশলে গৃহে নিমন্ত্রণ করে সাতঘটি মাধ্বিক খাইয়ে তার নেশা ধরিয়ে শূর্পনখা প্রেম নিবেদন করলেন। কিন্তু ঋষি-তনয় বাঁকবার নন। শূর্পনখা তখন ঋষির ঘাড়ে এক এক করে তিন মণ চাপ দিলেন। এ-চাপে ঘাড় ভাঙল না, কিন্তু যন্ত্রণায় শূর্পনখার প্রাণেশ্বর হতে রাজী হলেন।

তার পরের কাহিনী গুরুর সহায়তায় মুদ্গলের ব্রীচ্ অব্ প্রমিসেস্ মোকদ্দমা থেকে মুক্তির কাহিনী এবং শূর্পনখার রামচন্দ্রে আসক্তির কাহিনী। স্মৃতিকথায় রামচন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের পরিণতি বলতে গিয়ে শূর্পনখা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন—'ওরে রেমো সর্বনেশে, কি করলি রে।' তারপর ছটফট করে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন। তাঁর কাঠের নকল কান খসে পড়ল, মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল, দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলে, চোখ কপালে উঠল।

পুষ্কলা চেঁচিয়ে বললেন, এই চেরীরা, শিগগীর আয়, পিসীমা ভিরমি গেছেন! মুখে জলের ছিটে দে, জোরে বাতাস কর, লঙ্কা পুড়িয়ে নাকের ফুটোয় ধোঁয়া দে।'

মন যে কতখানি আমেজী হলে, এবং কল্পনাশক্তি যে কতদূর প্রবল হলে এই উদ্ভট উদ্ভাবনার হাসি সম্ভব, তা ভাবতে গিয়ে সবিস্ময় আনন্দ লাগে। বিশুদ্ধ হাসি সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন যদি কারও মনে জেগে থাকে, তাহলে রাজশেখরের গল্পগুচ্ছ তাঁদের নিঃসংশয় করবে। উৎকেন্দ্রিকতার গল্পে পূর্ববর্তী স্রষ্টার নিকট রাজশেখরের ঋণ অনস্বীকার্য। কেবল রাজশেখর কেন স্রষ্টামাত্রেই সবচেয়ে

বড় অধমর্ণ। শেকস্‌পীয়রের আলোচনা প্রসঙ্গে এমার্সন বলেছেন—'Every great genious is an indebted one.'

রাজশেখরও ত্রৈলোক্যনাথের কাছে ঋণী। কিন্তু এই ঋণকে স্বীকরণ করে নিয়ে তিনি এক নতুন জগৎ রচনা করে 'ভুবনোপজীব্যঃ' স্রষ্টা হয়েছেন।[১০] সকল দেশেই সাহিত্যের ধারা এইভাবে স্বোন্মেষণ ক্ষমতায় গ্রথিত হয়ে এক শ্লাঘ্য জগৎ হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ-উৎস উৎকল্পনার হাস্যধারায় বহু প্রতিভার স্বোন্মেষণ ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়ে এক উচ্চহাস্যের প্রসন্ন শাখা রচিত হয়েছে। বাঙালী হাসতে জানে না—এই অজ্ঞানতাপ্রসূত মিথ্যা বিচারের ওপর এই হাস্যমাখা একটা সজীব দেহ চ্যালেঞ্জের মত দাঁড়িয়েছে। এবং চ্যালেঞ্জের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে তাদের সম্মুখে যারা বিশুদ্ধ হাস্যের অস্তিত্বে সংশয়ী।

রাজশেখর বসুর এই উৎকল্পনার গল্পগুচ্ছের প্রসাধনকলা আলোচ্য। কল্পনাশক্তির উদ্ভটতার হাস্যকে আরও উচ্ছ্বসিত করতে সাহায্য করেছে তাঁর সংলাপ ও চকিত মন্তব্যসৃষ্টি। গল্পে কল্পনার উদ্ভটতা যে প্রধান হাস্যবেগ রচনা করেছে তার মধ্যে মধ্যে তিনি সংলাপ ও মন্তব্যের নৈপুণ্য দিয়ে এক একটি অতিরিক্ত ভাব ও চিত্রের সন্নিবেশ করে দিয়েছেন। এরা হাস্যময় উৎকল্পনার দেহে হাস্যোচ্ছলতাবাহী অসংখ্য শিরা উপশিরার কাজ করেছে। যেমন 'ভরতের ঝুমঝুমি' গল্পে দুর্বাসার দাড়ির গেরো থেকে হাজার হাজার বছর পূর্বেকার ঝুমঝুমির আবিষ্কার একটা প্রবল হাস্যময় কল্পনা। রাজশেখর তার মধ্যে অতিরিক্ত হাস্যসৃষ্টি করলেন দুর্বাসার চেহারার বর্ণনা দিয়েঃ—'লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে।' গল্পের কথকের মন্তব্য—'কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে। যদি অনুমতি দেন তো একটু ডিডিটি স্প্রে করে দিই। আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'রেবতীর পতিলাভে'র গল্পের অমন উদ্ভট কল্পনার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাবধানের চিত্রটি হাস্যকে বর্ধিত করেছে। গল্পের শেষে বলদেব ও রেবতীর সংলাপ আলোচনার স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ—'নিকটে একটি জলাশয় ছিল। রেবতীকে

১০. 'কহ্লন' তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে বলেছেন—'পরকাব্যেষু কবয়ঃ, পরদ্রব্যেন চেশ্বরাঃ।

তার ধারে এনে যুগলমূর্তির প্রতিবিম্ব দেখিয়ে বলদেব বললেন, রেবতী দেখতো, এইবারে আমি তোমার যোগ্য হয়েছি কিনা। এখন মনে ধরেছে কি ?'

রেবতী বললেন, মনে না ধরলেই বা উপায় কি। অবতার না আরও কিছু। দুই ভাই দুটি ডাকাত। তোমাদের মতলব আগে টের পেলে আমিই দুজনকে টেনে লম্বা করে দিতুম।'

'জাবালি' গল্পে ঘৃতাচী ও জাবালির সংলাপ গাম্ভীর্যের তলদেশ পর্যন্ত হাস্যোচ্ছল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

'ঘৃতাচী কহিলেন—হে জাবালি, তুমি নিতান্তই নীরস। তোমার ঐ বিপুল দেহ বিধাতা শুষ্ককাষ্ঠে নির্মাণ করিয়াছেন ? তুমি দীনহীন তাতে ক্ষতি কি ? আমি তোমাকে কুবেরের ঐশ্বর্য আনিয়া দিব। তোমার ব্রাহ্মণীকে বারাণসী প্রেরণ কর। তিনি নিশ্চয়ই লোলাঙ্গী বিগত-যৌবনা। আর আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর—চিরযৌবনা নিটোলা নিখুঁতা। উর্বশী মেনকা পর্যন্ত আমাকে দেখিয়া ঈর্ষায় ছটফট করে।

জাবালি সহাস্যে কহিলেন—হে সুন্দরী, কিছু মনে করিও না। তুমিও নিতান্ত খুকীটি নহ। তোমার মুখের লোধ্ররেণু ভেদ করিয়া কিসের রেখা দেখা যাইতেছে ? তোমার চোখের কোলে ও কিসের অন্ধকার ? তোমার দন্ত-পংক্তিতে ও কিসের ফাঁক ?' এর পরে সম্মার্জনী হাতে দেবদারু বৃক্ষান্তরাল-বর্তিনী জাবালি-পত্নীর যে-চিত্রাঙ্কন তাতে পাঠকের হাসি সরবতার শেষ সীমা স্পর্শ করে। 'ধুস্তুরী মায়া' গল্পে স্পন্দস্কন্দা ও উদ্ধবের সংলাপের পূর্ব-উদ্ধৃতি থেকে সংলাপ ও চকিত মন্তব্যসৃষ্টির হাস্যগুণের এই ক্ষমতা সুপ্রমাণিত।

এইভাবে সংলাপের বুদ্ধি-উজ্জ্বল বিচিত্র প্রাঞ্জল সরসতার জন্য রাজশেখরের প্রতিটি গল্পকে হাসির একটি আলোচ্ছটা আলগোছে ছুঁয়ে আছে। গল্প ঘিরে এই আলো এনে দিয়েছে রাজশেখরের শিল্পিস্বভাবের উইট-প্রবণতা। এই উইট-প্রবণতা তার সবকটি গল্পের দেহসজ্জায় প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে হাসির কৌলীন্য ঘোষণা করছে এবং গল্পের সামগ্রিক দেহে যেমন উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছে তেমনি এনে দিয়েছে কারুকার্য। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে রাজশেখরের উৎকল্পনার গল্পসৃষ্টির প্রসাধন-কলায় পার্থক্য এসেছে এখানেই। ত্রৈলোক্যনাথ সংলাপের এই গুণে রাজশেখরের সমকক্ষ নন। ত্রৈলোক্যনাথ গল্পে যতক্ষণ উদ্ভট চমকটা উপস্থিত করেন নি, ততক্ষণ তিনি পাঠকমনকে টেনে রেখেছেন উদ্ভট চমকের

আসন্ন নেশায়। সেখানে তিনি কুশলী। যেমন কুশলী রাস্‌পে। রাজশেখর সে গুণ তো আয়ত্ত করেছেনই, অতিরিক্ত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলকে তিনি এই সংলাপ ও চকিত মন্তব্যের সরসতাসৃষ্টির হাস্যগুণে হাস্যময় করে রেখেছেন। নিবিড় কৃষ্ণকেশের উপর ক্রীমের মত, পরিধেয়র উপর আতর সুবাসের মত, রাজশেখরের হাস্যগল্পে এই অতিরিক্ত সম্পদটুকু এসেছে।

এর মূলে রয়েছে রাজশেখর ও ত্রৈলোক্যনাথের আসরের ভিন্নতা। আসরের ভিন্নতার জন্যেই গল্পের বহিরঙ্গে বা প্রসাধন-কলায় ভিন্নতা লক্ষণীয়। নচেৎ সাধনবেগ দু'জনারই এক। ত্রৈলোক্যনাথের আসরটির মত তাঁর গল্পেও গ্রামীণতার ছাপ। রাজশেখরের গল্পে যে আসর রয়েছে তাতে নাগরী মনের ছাপ পড়েছে। নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য হল কথন ভঙ্গীর পারিপাট্য, বুদ্ধিবিলাস বা উইট-প্রবণতা।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে
তারা কথায় মনের গাটি কাটে।—

ভারতচন্দ্রের এই ছত্রদুটিতে শিল্পকলায় নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য অপূর্ব নাগরিক চাতুর্যে বলা হয়েছে। মুকুন্দরামের থেকে ভারতচন্দ্র এই নাগরিক চাতুর্যে ছিলেন স্বতন্ত্র। ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে রাজশেখরের মূলতঃ পার্থক্য এই নাগরিকতার পার্থক্য। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনা আখ্যানাশ্রয়ী হলেও কল্পনার গতি বিচিত্র সুন্দর। ত্রৈলোক্যনাথের গল্প চলে সরল গতিতে। যেমন সরল সহজ গ্রামের আসর-বিন্যাস, অনুরূপ সরল গল্পের গতি। রাজশেখরের আসর যেমন সুসজ্জিত, শ্রোতা যেমন সুসজ্জিত এবং নাগরিক, তেমনিই তার আসরের গল্পের চাল। পূর্বেই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে যে ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু, ছকু, ঘনশ্যামের গল্পকথনে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অনুভূত সত্য পেয়েছে। কিন্তু সে তাদের চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের অতিরিক্ত কোন বুদ্ধিবিলাস গল্পের দেহ ঘিরে বিরাজ করেনি। মুকুন্দরামে যেমন ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীল তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের হীরামালিনীর হীরার ধার পায়নি, তেমনি ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি চাতুর্য ও তীক্ষ্ণতা সত্ত্বেও রাজশেখরের নাগরীমনের বৈশিষ্ট্য লাভ করেনি। সুতরাং আসরের ভিন্নতার জন্যই আসরোত্থিত গল্পের ভিন্নতা। যেমন দীপের ভিন্নতার জন্যই তার শিখার ভিন্নতা। পূর্বাধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে

গ্রাম ও শহর মিলিয়ে যেমন বাংলা দেশের পূর্ণপরিচয়, তেমনি ত্রৈলোক্যনাথ ও রাজশেখরের উৎকল্পনার হাসি মিলিয়ে পড়লেই বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের একটি সমৃদ্ধ ধারার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(সুকুমার রায়চৌধুরী)

[১৮৮৭-১৯২৩]

বাংলা কবিতায় সুকুমার রায়ই প্রথম অসম্ভব কল্পনার সংস্থানের দ্বারা নির্মল অসূয়ামুক্ত হাস্যসৃষ্টির পথ দেখালেন। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'র রচনার সন ১৯৩৭। সুকুমার রায়ের মৃত্যু ঘটেছে 'খাপছাড়া' প্রকাশের ১৪ বছর পূর্বে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'খাপছাড়া'য় উৎকল্পনা দিয়ে কবিত্ব ও হাসি সৃষ্টির যে সমৃদ্ধিময় সম্ভাবনা দেখিয়েছেন তার পথপ্রদর্শক সুকুমার রায়। বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার গদ্যশাখার উৎসস্থান যেমন ত্রৈলোক্যনাথ, কবিতাশাখার উৎস সুকুমার রায়। 'আবোল-তাবোলে'র ভূমিকায় ধীর গম্ভীর পাঠকদের মনে রেখে তিনি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন, 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল-রসের বই, সুতরাং সে-রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।'

একই হাতে কলম ও তুলি ধরে সুকুমার রায় আজগুবি অসম্ভবের রসসৃষ্টির যে কবিতার পথ বেঁধে দিলেন সে পথেই রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি অগ্রসর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র-বিরাট, স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু তার অসম্ভব-কল্পনার হাস্যরসের কবিতা রচনায় বহিঃপ্রেরণা যে অনেকাংশে Lear-এর সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার রায়েব খেয়াল রসের এই কবিতাগুলো থেকে এসেছে, সে সত্য অস্বীকার করা হবে অনৈতিহাসিক। এই স্বীকৃতির পথেই বাংলা সাহিত্যে সুকুমার রায়ের যথার্থ মূল্যায়ন নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অসাধারণ আমোদপ্রিয় মানুষ। রাজশেখর বসু ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মত তিনিও মজলিশ বা আসর জমিয়ে

বসতে ভালোবাসতেন। বাংলা সাহিত্যকে একদিন যিনি প্রবল হাস্যে ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর শিল্পিমানসের গঠন বুঝতে পারলে তাঁর সৃষ্টির গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যা সহজ হবে। এই উদ্দেশ্যেই সুকুমার রায়ের এই মজলিশী-মনের পরিচয় গ্রহণ অবান্তর হবে না।

১৮-১৯ বছর বয়সে (১৯০৫-৬) সুকুমার রায় ননসেন্স ক্লাব নামে একটি আসর প্রতিষ্ঠিত করেন। এ-আসরে তিনি মজার মজার গান রচনা করতেন, আসরে সে গান গাওয়া হত। 'রামধন-বধ', 'ঝালাপালা', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' কৌতুক নাটিকা তিনি এই ননসেন্স ক্লাবের প্রেরণায় রচনা করেন। 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা' নামে কেবল কৌতুক রচনার জন্য হাতে লেখা পত্রিকাটি তাঁর চরিত্রের আমোদপ্রিয়তারই একটা দিকের পরিচয় দেয়। কবি অজিত দত্ত, শ্রীসুবিমল রায়-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র একখানা বিজ্ঞাপন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। সুকুমার রায়ের হাস্যপ্রিয় স্বভাবটি বুঝতে এই বিজ্ঞাপনখানি সাহায্য করবে বলেই উক্ত গ্রন্থ থেকে সেখানা উদ্ধৃত করলাম।

॥ বিজ্ঞাপন ॥

> আমাদের এই গন্ধবিকট তৈলের নাম আপনি অবশ্যই শুনিয়াছেন। অ্যাঁ? শোনেন নি? আমরা একমাস ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কেরাসিনের টিন বাজিয়ে বাজিয়ে তেলের বিজ্ঞাপন দিয়ে হয়রান হয়ে গেলাম, আর আপনি একদম শুনলেন না। তবে শুনুন।
>
> এই তেল ঘরে রাখলে গন্ধের তেজে মশা, ছারপোকা, উকুন, আরশুলা সব মরে যাবে। চোর, ডাকাত পাগলা-কুকুর এসব ঘরে প্রবেশ করবে না। মানুষ তো দূরের কথা, ভূত পেত্নীতে পর্যন্ত পোটলা-পুঁটলি নিয়ে বাপ বাপ বলে দৌড়িয়ে পালাবে।

এই বিজ্ঞাপনখানির মধ্যে কিশোর কল্পনার উল্লাস উপভোগ্য। এই উল্লাস থেকে 'ননসেন্স ক্লাব'-এর সৃষ্টি, 'মনডে ক্লাব'-এর-সৃষ্টি। কিশোর কল্পনার মধ্যে যে একটা মজা করবার ভাব থাকে, সেটাই লক্ষণীয় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', 'ঝালাপালা',

'রামধন-বধ' নাটিকার কৌতুকে। কিশোর কল্পনার এই উল্লাসই পরবর্তীকালে পরিণত বুদ্ধির শিল্পীর রসবোধ ও নৈপুণ্যের দ্বারা শাসিত হয়ে রসোত্তীর্ণ সুন্দর হয়ে উঠেছে। 'আবোল-তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'খাই-খাই' প্রমুখ রচনা-সম্ভার এই পরিচয়ই বহন করছে।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য উৎকল্পনার প্রত্যেক সফল হাস্যস্রষ্টার মধ্যেই কিশোর কল্পনার উল্লাস রয়েছে। এই উল্লাস ব্যতীত কল্পনার ত্রিলোক বিস্তার সম্ভব নয়। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির সার্থকতা নির্ভর করে শিল্পী এই উল্লাসকে কতখানি পরিণত বুদ্ধির শিল্পবোধ ও রচনা-নৈপুণ্যের দ্বারা শাসিত করে ৬ থেকে ৬০ বছরের পাঠককে আকৃষ্ট করতে পেরেছেন, তার ওপর। তা না হলে শিল্পী কিশোরের উল্লাসাবর্ত অতিক্রম করতে ব্যর্থ হবেন। ফলতঃ রচনা কিশোর-পাঠ্যের স্তরেই থেকে যাবে। ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায় প্রমুখ উৎকল্পনার খ্যাত শিল্পীরা এই শিল্পরীতি আয়ত্ত করতে পেরেছেন বলেই তাঁদের এই রচনাসম্পদ কখনই শিশু-কিশোর-পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে পড়েনি। একদিকে কিশোর মনের মুহুর্মুহু নবীন কল্পনাকে তাঁরা যেমন অবারিত করেছেন, অপরদিকে যুবক ও প্রবীণ মানুষের বোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে যে কৈশোর উল্লাস থাকে তাকে উচ্চকিত করতে পেরেছেন। সেজন্যই ৬ থেকে ৬০ বছরের পাঠক উৎকল্পনার হাস্যজগতে সমবেত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছেন।

সুকুমার রায়ের কবিস্বভাব গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে পরিবারের আনুকূল্য রয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন-এর প্রতিভা রায়চৌধুরী পরিবারে যে উপযুক্ত ক্ষেত্র নির্মাণ করে রেখেছিল, সে ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল সুকুমার রায়।

কিন্তু সাহিত্যজগতে একদল অলস স্রষ্টা থাকেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞাপূর্ণ প্রতিভা; কিন্তু কলম ধরতে কেমন একটা আলসেমি তাঁদের পেয়ে বসে। সঞ্জীবচন্দ্র এই স্বভাবেরই শিল্পী ছিলেন। সুকুমার রায়ের অনেকাংশে এই স্বভাব ছিল। 'ননসেন্স ক্লাব' করে, মজার গান রচনা করে, দু'চারখানা কৌতুক নাটিকা লিখে ও অভিনয় করিয়ে এই উচ্ছল সজীব প্রতিভাকে তিনি সীমাবদ্ধ রাখবেন ভেবেছিলেন। বিলাত থেকে ফিরে এসে যখন দেখলেন 'ননসেন্স ক্লাব' ভেঙে গেছে তখন 'মনডে ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত করে সেখানে আড্ডা বসিয়ে তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। কিন্তু পারিবারিক নির্মম আঘাত সুকুমার রায়কে তাঁর ক্লাবগণ্ডী থেকে রচনার হাস্য-লোকে মুক্তি দিল। আঘাতটা এল পিতা

উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুতে। সে আঘাত কবির পক্ষে হৃদয়বিদারক হল সত্য, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর মৃত্যু দিয়ে তাঁর অলস পুত্রের সংগুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচিত করে দিল। ১৯১৩ খ্রীঃ উপেন্দ্রকিশোর তাঁর 'সন্দেশ' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু-কারণে সুকুমার রায়ের উপর পত্রিকার সমস্ত দায়িত্বভার ন্যস্ত হল। এবার তাঁকে কলম ধরতে হল। কিন্তু দেখা গেল বিজ্ঞানের ছাত্রের পশ্চাতে এসে দাঁড়িয়েছে পূর্বকথিত ননসেন্স ও মনডে ক্লাবের অফুরন্ত স্ফূর্তি ভাণ্ডারের মানুষটি। সুকুমার রায় খেয়াল রসে'মগ্ন হলেন। তাঁর বিশেষ কবি-স্বভাবটি আমাদের পরিচিত জগৎটার মানুষ, তাদের চরিত্র, খেয়াল খুশি, আচরণের অসঙ্গতি-অসংলগ্নতাকে উৎকল্পনার স্পর্শে স্বাভাবিকতার গণ্ডীমুক্ত করে এক উল্লসিত প্রবল হাস্যের আবর্ত 'সন্দেশ' পত্রিকায় সৃষ্টি করতে লাগল। কখনো তা গদ্যের পথে, কখনো কবিতার প্রাকারে রূপ পেয়ে চলল। সৃষ্টি হল 'হ-য-ব-র-ল'র মত আজগুবি অসম্ভব কল্পনার রচনা। অসম্ভব কল্পনার পথ বেয়ে কবিত্বের এবং হাস্যসৃষ্টির চরম সার্থকতায় তিনি পৌছলেন 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থে।

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত যে কবিতাগুচ্ছ তার থেকে কবির স্বয়ংকৃত নির্বাচন নিয়ে সংকলিত হয়েছে 'আবোল তাবোল'। 'আবোল তাবোল' বাংলা সাহিত্যে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল—এই স্বকীয়তা গ্রন্থের রসে ও রূপে। গ্রন্থের নাম-কবিতায় কবি তাঁর এই রচনার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষ্যাপামির প্রান্তিক ছুঁয়ে 'মানে খোঁজার ধার' না ধরে যে একগুচ্ছ কবিতা রচনা করেছেন, তার বহু পূর্বে সুকুমার রায় ক্ষ্যাপার গানের আনন্দে 'আবোল তাবোল' রচনা করলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও যে বলেছেন ক্ষ্যাপার গানের 'নাইকো মানে নাইকো সুর'—আবোল তাবোলের কবিতাগুচ্ছ সম্বন্ধে এ-কথা কতদূর প্রযোজ্য তা বিচার-সাপেক্ষ। 'খাপছাড়া'র সব কবিতাই যেমন খাপছাড়া নয়, আবোল তাবোলের সব কবিতাই তেমনি অসম্ভব কল্পনার হাস্যের বিশুদ্ধতার জগতে পৌছতে পারে নি।

'আবোল তাবোল'-ও মিশ্র রচনা। এখানে একজাতের কবিতা রয়েছে যেখানে কল্পনার খেলা নেই। উৎকল্পনার একটি বহিরঙ্গ কাঠামো রয়েছে। অভ্যন্তরে কবি আতীব্র ব্যঙ্গ ও আঘাত সৃষ্টি করেছেন। 'কাতুকুতু বুড়ো', 'একুশে আইন', 'সৎপাত্র', 'রামগড়ুরের ছানা' এই শ্রেণীভুক্ত।

'কাতুকুতু বুড়ো'তে কবির আঘাতের লক্ষ্য সেই সব হাস্যরসিক যারা হাসিটাকে শিল্প বলে জানে না। 'খ্যাংড়ামতন আঙুল দিয়ে' পাঠকের পাঁজরের হাড়ে খোঁচা দিয়ে, কখনো তাদের ঘাড়ে চিমটি কেটে অথবা তাদের কাতুকুতু দিয়ে এর হাস্যসৃষ্টির সার্থকতার গৌরব করে।

'বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন দেশী
শুনলে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী।'

এই ছত্র দুটিতে কবির বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রসন্ন মনের হাসি যারা হাসতে শিখল না, হাসিটাকে জীবনের স্বাভাবিক সুষ্ঠু প্রকাশ বলে যারা জানল না, সেই ধীরগম্ভীর সমাজটাকে কবি 'রামগড়ুরের ছানা'[১] কবিতায় ব্যঙ্গ করেছেন। 'একুশে আইন' কবিতাও এই জাতের। 'রামগড়ুরের ছানা'র মত এই কবিতাটিরও বহিরঙ্গে রয়েছে উৎকল্পনার একটা কাঠামো। কিন্তু তারই অন্তরে আচার-বিচার-আইনের বন্ধনে আবদ্ধ জীবনটা তাঁর ব্যঙ্গ হাসির লক্ষ্য।

দ্বিতীয় একগুচ্ছের কবিতা রয়েছে এ-গ্রন্থে। সেখানেও কল্পনার অসম্ভবতার হাস্যখেলা নেই। যেমন 'ভালোর ভালো', 'কি মুসকিল', 'ডানপিটে','সাবধান', 'প্যাঁচা আর প্যাঁচানী', 'অবাক কাণ্ড', 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'শব্দকল্পদ্রুম', 'বুঝিয়ে বলা', 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্‌', 'গল্প বলা', 'নারদ নারদ', 'আহ্লাদী', 'হাত গণনা', 'কাঁদুনে', 'ভয় পেয়োনা'[২], 'নোটবই', 'বিজ্ঞান শিক্ষা', 'ফসকে গেলো', এ-সব কবিতায় কবি প্রসন্ন নির্মল হাস্যসৃষ্টি করেছেন বিষয়-নির্বাচনের অভিনবত্বে, কোথাও প্রকাশভঙ্গীর চমৎকারিত্বে। এই চমৎকারিত্ব এসেছে কোথাও শব্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্য-খেলায় (শব্দকল্পদ্রুম), কোথাও বুঝিয়ে বলার মত একটা গভীর বিষয়কে অতি লঘুতার সঙ্গে সমন্বিত করে পরিবেশনের কৌশলে ('সাবধান', 'বুঝিয়ে বলা')। আবার অনেক ক্ষেত্রে কবি কথোপকথনের ভঙ্গীতে হাস্য অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছেন, 'নারদ নারদ', 'গল্প বলা'য় এই রীতি। বক্তব্যর চমৎকারিত্ব থেকে যে কিভাবে হাস্যসৃষ্টি করা যায় তার প্রমাণ আছে 'ভাল রে ভাল' কবিতাটিতে। যত রকম ভালো আছে তার একটা তালিকা দিয়ে সবার

১. 'রামগড়ুরের ছানা' কবিতাটির সংকলন-পূর্ব নাম ছিল 'হেস না' (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫, সন্দেশ পত্রিকা)।

২. 'ভয় পেয়ো না' কবিতাটির সংকলন-পূর্ব-নাম ছিল 'ভয় কিসের অত' (আষাঢ় ১৩২৫-এর সন্দেশ)।

চাইতে যে-ভালোতে বক্তা পৌছলেন তা অপ্রত্যাশিতের চমকে প্রবল হাস্যের মুক্তি দিয়েছে।

'এই দুনিয়ায় সকল ভাল,
আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল,
তুমিও ভাল আমিও ভাল,
হেথায় গানের ছন্দ ভাল,
হেথায় ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ মাখানো আকাশ ভালো,
পোলাও ভালো কোর্মা ভালো,
মাছপটোলের দোরমা ভালো,
... ...
কিন্তু সবার চাইতে ভালো—
—পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।

এদেরই পাশে রয়েছে কবির উৎকল্পনার বিশুদ্ধ হাসির একগুচ্ছ কবিতা। খিচুড়ি, কাঠবুড়ো, গোঁফ চুরি, গানের গুঁতো, খুড়োর কল, লড়াই ক্ষ্যাপা, ছায়াবাজী, কুমড়োপটাশ, বুড়ীর বাড়ী, কিম্ভূত, চোরধরা, বোম্বাগড়-এর রাজা, নেড়া বেলতলায় কবার যায়, হুকোমুখো হ্যাংলা, ভূতুড়ে খেলা, গন্ধবিচার, হুলোর গান, ট্যাসগরু, ঠিকানা, পালোয়ান এই শ্রেণীভুক্ত।

এই গুচ্ছের কোন কোন কবিতায় অদ্ভুত কল্পনার প্রবল হাস্যের তলে একটা বক্তব্য, একটু ইঙ্গিত সন্ধানী-দৃষ্টিতে ধরা পড়তে পারে না তা নয়। পড়তে যে পারে তার কারণ পরিচিত জগতের চিত্র, চরিত্র নিয়েই কল্পনার অসম্ভবতার হাস্যসৃষ্টি। গোঁফ চুরির আজবকথার মধ্যে বড়বাবুটিকে দেখে মনে হয়,—তাকে যেন কোথায় দেখেছি। 'বোম্বাগড়ের রাজা' ও 'গন্ধবিচার'-এর রাজা মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথের হবু রাজা গবুমন্ত্রীর বংশধর তথা চিরকালের রাজতন্ত্র আমলাতন্ত্রের সঙ্গে টিকি বাঁধা। 'লড়াই ক্ষ্যাপা'র পাগলা জগাই পথে ঘাটে খুব একটা দুর্লভ নয়। কিন্তু বাস্তবজগতের সম্ভাব্য হসনীয়তাকে ও বক্তব্যর তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করে কবি এমন এক প্রবল হাস্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতে পেরেছেন যে ব্যঙ্গ ইঙ্গিতটুকু বা বক্তব্যর গভীরত্ব হাস্যের তলে সংগোপন করে রয়েছে এবং

তা এত গভীরে রয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তা আছে কি না আছে'র স্তরে পৌঁছে গেছে।

কল্পনার অতিরঞ্জনের দ্বারা সুকুমার রায় কিভাবে প্রসন্ন হাস্যসৃষ্টি করেছেন, তা দেখা যেতে পারে। বে-সুরো গানের কষ্টকর অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের আছে। 'গানের গুঁতো'র ভীষ্মলোচন শর্মাকে আমাদের ঘরের লোক বা প্রতিবেশী রূপে চিনি। তাকে নিয়ে কবি ব্যঙ্গ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে কবি ভীষ্মলোচনের বে-সুরো গানের দাপটে মহিষ ঘোড়া গাড়ি জুড়ি উল্টে দিয়ে, গাছপালা ধ্বংস করে, জলস্থল অন্তরীক্ষের প্রাণিকুলকে সন্ত্রস্ত করে এক প্রলয় বাধিয়ে দিলেন। এখানেই কল্পনার অতিরঞ্জনের খেলা, কিশোর কল্পনার উল্লাস। তার থেকেই পরিচিত কোন অভিজ্ঞতার বাষ্পকণা নিয়ে নিপুণ শিল্পীর খেয়ালরস-বর্ষণ ঘটেছে।

এই অতিরঞ্জিত কল্পনা থেকে যে হাস্য স্বতঃনিসৃত হয়েছে তাকে বহুগুণিত করেছে কবির বলবার ভঙ্গীর নিটোল মুন্‌শীয়ানা।—

'চার পা তুলি জন্তুগুলি পড়ছে বেগে মূর্ছায়
লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা বলছে রেগে 'দূর ছাই'।
জলের প্রাণী অবাক মানি গভীর জলে চুপচাপ,
গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংস পড়ছে দেদার ঝুপ ঝাপ।
শূন্য মাঝে ঘূর্ণা লেগে ডিগবাজী খায় পক্ষী,
সবাই হাঁকে আর না দাদা গানটা থামাও লক্ষ্মী।'

কবি-কল্পনার উৎকেন্দ্রিকতার হাস্য চরমে উঠেছে যেখানে এই দৃক্‌পাতহীন বিধ্বংসী সঙ্গীতকে পাগলা ছাগলের এক গুঁতোয় কবি থামিয়ে দিতে পেরেছেন। এই অদ্ভুত কল্পনার হাস্যের মধ্যে যেমন কোন ইঙ্গিত দাঁড়াতে পারেনি, তেমনি পাগলা ছাগলের শিং-এর গুঁতোয় এই প্রবল সঙ্গীতগুণীর কোন ব্যথা-বোধ মনে স্থান করে নিতে পারে নি। কারণ গোটা ব্যাপারটাই পাঠকমনে এক একটা দারুণ অসম্ভব অবিশ্বাস্যের প্রত্যয় নিয়ে হাস্যময় হয়ে উঠেছে। এখানেই অতিরঞ্জনকে শিল্প করে তোলার কবি-কৌশল। সাহিত্যে অতিরঞ্জন থাকবেই। কিন্তু সেই অতিরঞ্জনকে সুন্দর হতে হবে। এই সূত্র উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির পক্ষে যথার্থ প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে বলবার চেষ্টা করা গেছে, উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে এই যে অতিরঞ্জনের খেলা তাকে কি করে

শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে হয়। এই শাখার সকল সার্থক শিল্পীর রচনা-কৌশল কল্পনার অতিরঞ্জনকে শিল্পমণ্ডিত করে তুলবার কৌশল। সেই নিরিখে সুকুমার রায় প্রথম শ্রেণীর উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা হয়ে উঠেছেন।

'কাঠ-বুড়ো'র অঙ্ক কষে কষে কাষ্ঠরসতত্ত্ব ঘোষণার অদ্ভুত কথার মধ্যে কিংবা ছায়াসন্ধানী ব্যবসায়ীর ছায়াধরার অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্যে অনুসন্ধানী দৃষ্টি হয়তো একটা বক্তব্যের দিকে পাঠকের মন আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু আকাশে ঝুল ঝোলে বলেই কাঠে গর্ত হয়, মানুষ কাছে না থাকলে গাছের ছায়ারা ছটফটিয়ে উঠে এদিক ওদিক তাকায়, চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরে শুকতে পারলে সর্দি কাশি থাকে না, আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে খেতে পারলে ল্যাংড়ার ঠ্যাং গজায়,—কবি কল্পনার এই বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তিতে যে হাস্য উদ্গত হল তার মধ্যে পড়ে বক্তব্যটুকু কোন্ সুদূরে তলিয়ে গেছে। কাঠ-বুড়ো আর ছায়াবাজীকে ধরে তাদের কাছ থেকে আজও যেটা জানা হল না সেই অপ্রকাশিত কথাটা জানতে ইচ্ছা করে,—একাদশী রাতে কেন কাঠে গর্ত হয়, আর মোয়া গাছের মিষ্ট ছায়া ব্লটিং দিয়ে শুষে নিয়ে কী করে পুষে রাখতে হয়। কল্পনার এই উদ্ভাবনী ক্ষমতা থেকে উৎকল্পনার হাস্যরসের সম্পদ সৃষ্টি। হাস্যরসের পরিচিত কোন ধারায় এই বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি নেই। কল্পনার এই উদ্ভাবনী শক্তি Lear-এর Luminous Nose Dong-এর মধ্যে দেখে G. K. Chesterton উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন—

The Dong with Luminous nose, at least is original as the first ship and the first plough were original. [৩]

রবীন্দ্রনাথের 'দাড়ীশ্বর' ও সুকুমার রায়ের 'মিষ্টিছায়া', 'পান্‌সেছায়া'র আবিষ্কার সমমৌলিকতায় আনন্দকর।

'হুলোর গান' সুকুমার রায়ের উৎকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। আধখানা ভাঙা চাঁদ দেখে হুলোর মটকার কাছে মালপোয়া মনে পড়া এবং মালপোয়া মেনি বেড়ালের মুখে দেখে জগৎ সম্পর্কে একটা বৈরাগ্য আসা, স্ত্রীর মুখখানাকে পর্যন্ত চিমনির কালি মনে হওয়া,—এ হল খেয়ালরসে ডুব দিয়ে কবির প্রাণ খুলে হাসতে পারার বিশেষ দৃষ্টি। কিশোর কল্পনার উল্লাস পরিণত রসবুদ্ধির

৩. *G. K. Chesterton—A defence of Nonsense (A Book of English Essays)*।

স্পর্শে এভাবেই এক অপূর্ব রসের জগতে মুক্তি পেয়ে থাকে। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির আরেকটি চমৎকার কবিতা ‘ঠিকানা’। কথোপকথনের ভঙ্গীর সঙ্গে দুই রসিক চতুরের সাক্ষাৎ-দৃশ্যে হাস্যরস উদ্ভিন্ন হয়েছে। আহ্লিনাথের মেশোর যে পরিচয় দিয়ে তার ঠিকানা চাওয়া হয়েছে তা যেমন অদ্ভুত, আরও অদ্ভুত জগমোহনের ঠিকানা দেওয়া। Colonel Crockett-এর (1786—1836)

> How will I find where you live ?
> "Why, sir, run down the Mississippi till you
> Come to the Obian river, run a small street up that,
> Jump ashore anywhere, and inquire to me".

এই ঠিকানা সন্ধানের সঙ্গে কবিতাটির দ্বিতীয়াংশের স্বাদ-ঐক্য রয়েছে—

> ‘ঠিকানা চাও ? বলছি শোন , আমড়াতলার মোড়ে
> তিন মুখো তিন রাস্তা গেছে, তারি একটা ধ’রে ;
> চল্‌বে সিধে নাকবরাবর, ডানদিকে চোখ রেখে ;
> চল্‌তে চল্‌তে দেখ্‌বে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।
> দেখ্‌বে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
> তারি ভিতর ঘুর্‌বে খানিক গোলকধাঁধা’র মত।
> তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
> ফির্‌বে আবার বাঁয়ের দিকে তিন্‌টে গলি ছেড়ে—
> তবেই আবার পড়্‌বে এসে আমড়াতলার মোড়ে
> তারপরে যাও যেথায় খুশি—জ্বালিয়োনাকো মোরে।’

অশেষ কল্পনাশক্তির সঙ্গে চিরপ্রসন্ন মনের মেলবন্ধনেই এই জাতীয় সৃষ্টি সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এই অদ্ভুত উদ্ভাবনার অপূর্ব কবিতাগুচ্ছ রচনা করে সুকুমার রায় একটা নতুন কাব্যজগৎ নির্মাণ করেছেন।

রাজশেখর বসু তাঁর অসম্ভব কল্পনার হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল সংলাপ সৃষ্টি করে যেমন হাসিকে খচিত করেছেন, সুকুমার রায় তাঁর এই শ্রেণীর বহু কবিতায় হাসির মধ্যে কবিত্বের অবকাশ দ্বারা হাস্যরসকে বিশেষ একটা স্বাদে সমৃদ্ধ করেছেন। এই গুণেই কিশোর কল্পনার উল্লাস পরিণত বুদ্ধির শিল্পস্বাদে মণ্ডিত হয়েছে।

‘হালকা মেঘের পান্‌সে ছায়া’ই, ‘মৌয়াগাছের মিষ্টি ছায়া’, ‘মেঘ-মাখানো

আকাশ ভাল' ইত্যাদি ছত্র যে চিত্রকল্প উদ্রিক্ত করে তা হাস্য ও কাব্য-স্বাদাঙ্কুরে চমৎকার। ভূতের মায়ের আদরের ভাষা—

'অন্ধবনের গন্ধ গোকুল, ওরে আমার হোঁৎকারে!
ওরে আমার বাদলা রোদে জষ্ঠি মাসের বিষ্টিরে।...
ওরে আমার জোছনা হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার......

অথবা 'হুলোর গান'-এ যে কাব্যময় ভাষা—

'পূবদিকে মাঝ রাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।'

এ-ধরনের ছত্রে পরিধৃত কবিত্ব উৎকল্পনার হাস্যকে মহার্ঘ্য ফ্রেমে বাঁধানো ছবির মত সুন্দর করে রেখেছে।

এ-শক্তি উৎকল্পনার সকল হাস্যস্রষ্টাদের মধ্যেও খুব একটা সুলভ নয়। Lear অথবা রবীন্দ্রনাথের এ-জাতীয় কবিতা এতখানি কাব্যস্বাদে মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। অবনীন্দ্রনাথের উৎকাল্পনিক রচনায় কবিত্ব রয়েছে। কিন্তু কবিত্বের প্রাবাল্য হাস্যরসের স্ফুরণ ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু সুকুমার রায়ের কবিত্ব হাস্য-রসের অনুগমন করে বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর মাত্রাসচেতনতা উল্লেখযোগ্য। এবং তা সম্ভবপর হয়েছে পূর্বকথিত বিজ্ঞান-রীতির সঠিক আয়ত্তীকরণে।

সুকুমার রায়ের হাস্যরচনার প্রসাধনকলা লক্ষণীয়। সংলাপ দিয়ে চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে রাজশেখর যেমন অনন্য, কথা দিয়ে ছবি ফুটিয়ে তুলতে সুকুমার রায় তেমনি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' ও 'সে'র পশ্চাতে কবির তৎসাময়িক চিত্রাঙ্কন প্রবণতা যে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সেকথা বলবার চেষ্টা করা গেছে। 'খাপছাড়া'র প্রত্যেকটা ছড়া এক একখানা ছবি। Lear-এর উদ্ভট কল্পনার লিমারিকগুলির চিত্রগুণ কবিতার অন্তরসম্পদেরই অঙ্গ। সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রেও তাঁর চিত্রাঙ্কন শক্তি কবিতার রসরূপের অনুকূল হয়েছে। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে তাঁর নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত। বিলেতে গিয়ে তিনি ব্লক ও ফটোগ্রাফ বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। সেই ক্ষমতা তাঁর সকল রচনায় বিশেষ করে আবোল-তাবোল, হ-য-ব-র-ল'কে সাহায্য করেছে। 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থে ছবির ব্লক দিয়ে তিনি কথা বলেছেন। আবার কথার ছবির মধ্যে রেখার ছবি দিয়ে তাকে স্পষ্টতর করেছেন। হাস্যরচনায় লেখা ও রেখার সহযোগ মণি-কাঞ্চন যোগ।

ছবি ব্যতীত হাসির রচনা খঞ্জ। ত্রৈলোক্যনাথ, রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, Lear, Carroll, Raspe, প্রত্যেকের হাস্যসৃষ্টি রেখায় ধৃত এবং মুখরিত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও সুকুমার রায়ের চিত্রাঙ্কন-প্রতিভা একটা সংযোজনী গুণ হয়ে এসেছে। পূর্বোক্ত স্রষ্টাদের অপরের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে, কিন্তু এই দু-জন স্বয়ংসম্পূর্ণ। চিত্রাঙ্কনের মৌলিক প্রতিভার জন্য এঁদের হাস্যরচনা চিত্রগুণে তুলনাগতভাবে অধিকতর সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধি সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হয়ে এসেছে। তিনি কোন কোন কবিতায় কথা বলেছেন অর্ধেক, কথার বাকী অর্ধেক ছবি দিয়ে বলেছেন। যেমন 'চোর ধরা' কবিতাটিতে চোর ধরার তোড়জোড় চলেছে ঢাল, তলোয়ার এবং হুঁশিয়ার পাহারায়। ঐ চোর টিফিন চোর।

"পাঁচখানা কাটলেট, লুচি তিনগণ্ডা
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা"—

চুরি হয়ে যাওয়ায় ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু যে চোর ধরবার জন্য এই হুঁশিয়ার পাহারা সে চোরটি যে কে, কবি তা কোথাও বলেন নি। কিন্তু পাঠক এই চোরকে দেখলেন ছবিতে। ছবিতে রয়েছে তলোয়ার এবং ঢালধারী যখন সম্মুখভাগ পাহারা দিচ্ছেন তখন একটা বেড়াল ও তার একটা ছানা এবং কয়েকটা পাখী পেছন থেকে টিফিন খেয়ে যাচ্ছে। ঢাল তরোয়াল নিয়ে এত বড় হুঁশিয়ার পাহারার এই পরিণতি কবিতাটিকে উদ্ভট সম্ভাবনার হাস্যমুখর কবিতা করে তুলেছে। ছবি দিয়ে বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করবার এই কাব্য-কৌশল সুকুমার রায়ের মৌলিক। কিন্তু এই মৌলিক প্রতিভাও সন্দিহান ছিল, তাঁর কাব্যের এই তালবেতালের খেয়াল সুরকে পাঠককুল কিভাবে নেবেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের মত তিনিও ধীর গম্ভীর পাঠকসমাজের হাস্যরস-গ্রহণশক্তি সম্বন্ধে সু-মত পোষণ করতেন না। যেমন করতেন না শেক্স্পীয়র। ধীর গম্ভীর পাঠকদের রসবোধের ওপর শেক্স্পীয়রের সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা ছিল প্রবল। 'The Merchant of Venice' নাটকে Gratiano বলেছেন, এই দুনিয়ায় একশ্রেণীর জীব আছে যাদের মুখের চেহারা ঠিক ময়লাজমা বদ্ধজল পুকুরের উপরটার মত, তাতে কোন চাঞ্চল্য বা আনন্দের সাড়া নেই, তারা ইচ্ছে করে মুখ হাঁড়ি করে বসে থাকে, যাতে সকলের কাছেই গম্ভীর এবং চিন্তাশীল পণ্ডিত বলে খ্যাতি রটে যায়। তাদের হাবভাবে তারা জানাতে চায় যে, তারা যেন সবজান্তা

সুতরাং তারা যখন কথা বলবে তখন কোন বাজে লোক যেন কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ না করে।

"There are a sort of man whose visages
Do cream and mantle like a standing pond
And do a wilful stillness entertains
With purpose to be dressed in an opinion
Of wisdom, gravity, profound conceit
As who should say, I am Sir Oracle
And when I gope my lips let not dog bark."

ঐ একই দৃশ্যে Salerio বলেছে—প্রকৃতি দেবী জীব সৃষ্টি শুরু করা অবধি দুরকমের অদ্ভুত লোক সৃষ্টি করে আসছেন। কতক আছেন যাঁদের চোখ সবসময় হাসির ভারে অর্ধেকটা বুজেই আছে, এমন কি ব্যাগপাইপের বাজনা শুনলেও তাঁরা কাকাতুয়ার মত হাসি হাসেন। আবার কতক আছেন যে, যদি বুড়ো নেষ্টরের মত গম্ভীর লোকও শপথ করে বলেন যে, এটা হাসবার কথা, তবুও তাঁরা কিছুতেই দাঁতের ফাঁকে একবিন্দু হাসি বেরুতে দেবেন না।

"Nature hath framed strange fellows in her time
Some that will ever more peep through their eyes
And laugh like parrots at a bag piper
That they'll not show their teeth in way of smile
Though Nestor swear the jest be laughable." [৪]

রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তির উপায়' গল্পে গম্ভীর প্রকৃতি ফকিরচাঁদের এক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। ফকিরচাঁদের ঠাণ্ডাজল, হিম এবং হাস্য-পরিহাস একেবারেই সহ্য হয় না। মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের তিলমাত্র স্থানও গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন থাকত। এই অসহ্য গম্ভীর ফকিরচাঁদকে বিড়ম্বিত করে রবীন্দ্রনাথ তার অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। সুকুমার রায়ও এই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষের রসবোধের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। ধীর গম্ভীর উদ্দেশ্যসন্ধানী পাঠকদের তোয়াক্কা না রেখে 'আবোল-তাবোল' কবিতায় তিনি ঘোষণা করলেন—

৪. Shakespeare—The Merchant of Venice. Act 1, Sc. 1.

'আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক্
নাই বা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।'

বেবাক লোক বুঝুক আর না বুঝুক বাংলার হাস্যরসপ্রিয় পাঠকমনে এ গ্রন্থ কালের সীমা অতিক্রম করে স্মরণীয়তার প্রকোষ্ঠে স্থান করে নিয়েছে।

এ-সব কবিতার অনুবাদ কঠিন। আনন্দের বিষয় কবির পুত্র শ্রীসত্যজিৎ রায় কবির কবিতার অনুবাদের চেষ্টা করেছেন। কবির 'সৎপাত্র', 'কাঠবুড়ো' এবং 'খুড়োর কল'—(Groomy Tidings, The Old Woodman, Uncle's Invention) কবিতার অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।[৫]

ত্রৈলোক্যনাথের আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বলবার চেষ্টা করা গেছে রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর বসু, সুকুমার রায়ের উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টি সম্বন্ধেও সে-কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের এই ধারার রচনার অনুবাদ বিশ্বের সাহিত্য-পংক্তি-ভোজে আমাদের সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার সমৃদ্ধি প্রতিপন্ন করবে।

'খাই খাই' : 'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুচ্ছের মধ্যে কবির স্বয়ংকৃত নির্বাচন নিয়ে 'আবোল-তাবোল' গ্রন্থ, অবশিষ্ট কবিতায় সজ্জিত 'খাই খাই'। এ গ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ রসগৌরবে আবোল-তাবোলের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। অবিশ্বাস্য অসম্ভব কল্পনা দিয়ে, হাস্যসৃষ্টি ও কবিত্বের পথ বেয়ে তাকে বিশেষ সার্থকতায় পৌছে দেবার দৃষ্টান্ত 'খাই খাই'-এর কোন কবিতায় নেই। কয়েকটি কবিতায় যেমন 'হারিয়ে পাওয়া,' 'নন্দগুপি,' . 'নিরুপায়', 'খাই খাই'—কৌতুক-হাসি জমে উঠলেও এ গ্রন্থের অনেক কবিতাই হাসির কবিতা নয়। তবে প্রায় সকল কবিতায়ই লঘুচালে কথা বলে কবি হাসির একটা জলছাপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

সুকুমার রায়ের গদ্যরচনার মধ্যে 'হ-য-ব-র-ল' আজগুবি রসের হাস্যসৃষ্টির বিশেষ মূল্য দাবী করতে পারে। অভিধান বলবে যা বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল তাই হ-য-ব-র-ল। কিন্তু বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়ের মধ্যে যখন কবি-কল্পনা অনুসৃত হয়,

৫. Nonsense Rhymes—'Now', Annual Number, 1967 and 1968.

তখন তা শিল্প হয়ে ওঠে। রুমালটা বিড়াল হয়ে ওঠায় 'হ-য-ব-র-ল'-এর লেখক হতভম্ব হয়েছেন, বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে মুশ্‌কিলে পড়েছেন। কিন্তু বিড়ালটা এর মধ্যে মুশ্‌কিলের বা বিস্ময়ের যে কিছু দেখেনি তার কারণ, ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁক পেঁকে হাঁস - এ তো হামেশাই হচ্ছে। গ্রহণশক্তির এই প্রসন্ন সহজতার ওপরই আজগুবি খেয়ালরসের সাহিত্যের সার্থকতা নির্ভর করে। লেখক এই কাহিনীর শেষে বলেছেন—মানুষের বয়স হলে এমন হোঁতকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোন কথা বিশ্বাস করতে চায় না। সে কথা অকাল-বয়সীদের ক্ষেত্রেও সত্য। লেখকের এই আশঙ্কা 'হ-য-ব-র-ল'-এর ক্ষেত্রে শুধু নয়, 'আবোল তাবোলের' ভূমিকায় এই সন্দেহ থেকেই কবি বেশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও এই বয়স্ক এবং অকাল-বয়স্ক পাঠকদের মনে রেখে তাঁর অনুপম কবিত্বের ভাষায় 'খাপছাড়া'র রসমূল্য প্রতিষ্ঠার সপক্ষে ওকালতি করতে হয়েছে—

যদি দেখ খোলসটা
খসিয়াছে বৃদ্ধের।
যদি দেখ চপলতা
প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে যেই ছেলেমিতে সিদ্ধের,
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক
ঘোর বৈদান্তিক,
দেখ গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখ কথা তার
কোনো মানে-মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, পাখা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার
দাও যদি ধিক্কার
সুধাব, বিধির মুখ চারিটি কী কারণে।

আবোল তাবোলের মত হ-য-ব র-ল'য়ে গদ্য প্রাকারে কবির উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির ক্ষমতা নৈপুণ্যে উজ্জ্বল। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' প্রমুখ গ্রন্থে

মানুষ পশু-পাখি, সাপ-মাছ নিয়ে যেমন আজগুবি রস জমে উঠেছে, ক্যারল-এর 'Alice's Adventures in Wonderland'-এ যেমন পরিচিত জগৎটার Cat, Duck, Guinea-pig, Rabbit, King-Queen, নিয়ে উদ্ভট কল্পনার হাসি প্রবল হয়ে উঠেছে, অনুরূপ সুকুমার রায়ের এই কাহিনীতে পারিপার্শ্বিক জগৎটার পরিচিতদের নিয়ে উৎকল্পনার হাস্যরস উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

আবোল তাবোলের 'ঠিকানা' কবিতায় যে অত্যাদ্ভুত ঠিকানাদান, তারই দ্বিতীয় নজীর 'হ-য-ব-র-ল'-র তিব্বত যাত্রার পথ বাতলানোয়।

'গরম লাগে তো তিব্বত গেলেই পার।'

'আমি বললাম, কি করে যেতে হয় তুমি জানো ?'

বেড়াল এক গাল হেসে বলল, তা আর জানিনে ? কলকেতা, ডায়মণ্ড-হারবার, রাণাঘাট, তিব্বত—ব্যস্। সিধে রাস্তা, সওয়া ঘন্টার পথ, গেলেই হল।'

কাঠি দিয়ে ঘাসের ওপর লম্বা আঁচড় কেটে হিসেব করে গেছোদাদার ঠিকানা দিতে ফাজিল বেড়ালটার ফ্যাচ ফ্যাচ হাসির একমাত্র তুলনা চলে ক্যারল-এর Cheshire Cat-এর ঘন ঘন অর্থহীন হাসির (grin) সঙ্গে। কথা বলতে বলতে Cheshire Cat-এর অদৃশ্য হওয়া এবং অদৃশ্য হতে হতে grin করা, আর 'হ-য ব-র-ল'র বেড়ালটার লেখককে জব্দ করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ হাসতে হাসতে পালিয়ে যাওয়া,—দুয়ের মধ্যে কল্পনার ঐক্য রয়েছে। ব্যাকরণ সিং বি. এ. খাদ্যবিশারদের বক্তৃতা Alice-এর বিস্ময়ের জগতের Mouse যে Ahem বলে important air সৃষ্টি করে বক্তৃতা দিয়ে গরম করতে চেয়েছে, তাকে মনে করিয়ে দেয়। Alice-এর বিচারদৃশ্যের সঙ্গেও 'হ-য ব-র-ল'র বিচারদৃশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। নেড়ার অদ্ভুত গানের সুর Mockturtle এবং Duchess-এর গানকে মনে করিয়ে দেয়।

বিশ্ববিখ্যাত Alice's Adventures in Wonderland-এর "delightful relief of the absurd" সৃষ্টির দ্বারা সুকুমার রায়ের খেয়াল রসের সৃষ্টিক্ষমতা স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাতে করে তাঁর মৌলিকতা কোথাও আহত হয়নি, বরং কল্পনার অসম্ভবের হাস্যসৃষ্টির বিচারে ক্যারল-এর উক্ত গ্রন্থের চেয়ে 'হ-য-ব-র-ল' কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ক্যারল-এর কাহিনীর আজগুবি হাস্যরস রূপকথার ধার ঘেঁষে চলতে চেয়েছে। উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির বহিঃপ্রেরণা

(objective stimulus) যে রূপকথা থেকে অনেকাংশে এসে থাকে, তা স্বীকার্য। কিন্তু রূপকথায় মায়াঘোরকে সার্থক অসম্ভবের হাস্যস্রষ্টা কাহিনী চিত্র চরিত্রের মধ্যে কোথাও দাঁড়াতে দেন না, তাকেও হাস্যময় করে তোলেন। 'হ-য-ব-র-ল'র আ-ভূমি লম্বিত-দাড়ি দেড়হাত বুড়োর যে কল্পনা, তাতে রূপকথার প্রেরণা রয়েছে ; কিন্তু সেই বুড়োর টাকে যখন খড়ি দিয়ে কি সব লিখে দিলেন এবং সে যখন হাতের হুঁকোটাকে দূরবীন করে নবাগত লেখককে বিস্ময় নিয়ে দেখতে লাগল এবং তাকে আঙুল দিয়ে টিপে আর ফিতে দিয়ে মেপে অদ্ভুত এক মাপ বলতে লাগল, তখন আর রূপকথার আমেজটা উদ্ভট কাহিনী চরিত্রের মধ্যে দাঁড়াতে পারল না। কিন্তু ক্যারল সবক্ষেত্রে এরূপ পারেননি। Alice-এর কাহিনীটার সৃষ্টি-সূত্রেই রূপকথার অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। এ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে তিনটি ছোট শ্রোতার গল্প শোনার দাবী থেকে। তখন সূর্য সোনা ঢেলে অস্তে যাচ্ছে। 'Golden afternoon' স্বপ্নের মায়াঘোর সৃষ্টি করেছে লেখকের মনে। 'Beneath such dreamy weather cruel three'-র কাছ থেকে আবেদন এল গল্প বল এবং নির্দেশ রইল যে গল্পের মধ্যে আজগুবি রস চাই—"There will be nonsense in it", বলাবাহুল্য golden afternoon-এর dreamy weather-এর মধ্যে যে nonsense গল্প এই তিনজন ক্ষুদে শ্রোতাকে লেখক শোনালেন, তার মধ্যে রূপকথার মায়া উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুভূত হল। এই কাহিনীর Chapter V-এ (advice from caterpillar) এই রূপকথার আমেজটাই স্পষ্ট। Rabitt-এর কল্পনাটার পেছনে হয়তো বহুপঠিত Anderson-এর Tiny-রূপকথার field mouse-এর চালচলন, ঘরবাড়ির প্রেরণা রয়েছে। কিন্তু Cheshire Cat-কে যেমন আজগুবি রসে জারিয়ে নিতে পেরেছেন, Rabitt-কে তেমনটি পারেন নি। Rabitt-এর মধ্যে একটা রূপকথার চাল রয়ে গেছে।

ক্যারল-এর মত ত্রৈলোক্যনাথের উৎকল্পনার হাস্যরসের গল্প-কাহিনীও রূপকথার এই অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সুকুমার রায় অসম্ভব কল্পনার হাস্যসৃষ্টিতে রূপকথার এই অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে যে সচেতন ছিলেন, 'হ-য-ব-র-ল'র পাঠকমাত্রেই তা লক্ষ্য করে থাকবেন।

সে যাহোক ফ্যাচ ফ্যাচ হাসির ওই ফাজিল বেড়াল, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার গণনার কার্যে নিপুণ সনাতন বায়সবংশীয় দাড়িকুলীন, হিজি বিজ বিজ নামে

সেই অদ্ভুত জন্তুটা যে অসম্ভব সব কথা ভেবে, আর বলে ফেলে হেসেই অস্থির, কাকেশ্বর, শ্যামলা মাথায় কুমীর, শেয়াল, চাপকান আর পাঁয়জামা পরা হাসিমুখ নেড়া, যে পকেটভর্তি গানের তাড়া নিয়ে ঘোরে আর অনুরোধের ভান করে গাইতে শুরু করে, ওই সবুজ দাড়ির দেড়হাত বুড়ো যার মাথা ভরা টাকে খড়ি দিয়ে কি সব লেখা, 'হ য-ব-র-ল'র এই সব চরিত্র নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ রসের পথে এসেছে। এদের প্রসন্ন হাসিতে গ্রহণ করতে পারলেই দেখা যাবে সাহিত্যে এরা বিশেষ আসর জমিয়ে বসেছে। এ-আসরে রয়েছে উচ্চরব হাসি আর প্রসন্নতা। Alice-এর sister যেমন Alice-এর মুখে স্বপ্নকথা শুনে অসম্ভবের জগতে জেগে উঠতে পেরেছে, তেমনি যদি জেগে ওঠবার সহজ ক্ষমতা থাকে, তবে চতুর্দিকের রূঢ় বাস্তবের মধ্যে অসম্ভব কল্পনার একটা প্রসন্ন উচ্চহাসির আনন্দের সন্ধান সহজ হয়ে উঠবে।

সুকুমার রায়ের নাটিকা 'পাগলা দাশু'র মত মজাদার গল্প, এবং বহুরূপী অনেক গল্পের মধ্যে 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের' ডায়েরীতে উৎকল্পনা বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছে। এ-রচনাটিতে কবির খেয়ালী কল্পনা কিম্ভূত সব জীব উদ্ভাবন করেছে। 'প্রফেসর হুঁশিয়ারের ডায়েরী'তে রয়েছে ২৬শে জুন ১৯২২ থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ পর্যন্ত বিচিত্র শিকার কাহিনীর রোমাঞ্চ। প্রথম দিনেই প্রফেসর শিকারী এক বিচিত্র প্রাণীর সাক্ষাৎ পেলেন।—না বানর, না মানুষ অথচ গাছের ডালে বসে একটা লাল ফল ভেঙে খেতে খেতে শিকারীদের দেখে সে মানুষের মত হাসল। অনেকগুলো পাউরুটি আর গুড় এবং অনেকগুলো ডিমসিদ্ধ সে অনায়াসে খেয়ে ফেলল। হুঁশিয়ার এর নাম দিয়েছেন হ্যাংলাথেরিয়াম। এভাবে পেলাম কিম্ভূত এক পাখি ল্যাগ্‌বাগ্যার্নিস, পাখি-জন্তুর বিমিশ্রণে সৃষ্ট গোম্‌রাথেরিয়াম্‌, বেচারাথেরিয়াম, চিল্লানোসোরাস, ল্যাংড়াথেরিয়াম্‌। অবশ্যই আবোল তাবোলে-এ হাতিমি, হাঁসজারু, বকচ্ছপ ইত্যাদি জীব উদ্ভাবনার মধ্যে 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী'র প্রাণিকুলের পূর্বসূত্র ছিল। সুকুমার রায়ের এই উদ্ভট প্রাণিজগৎ সৃষ্টির সঙ্গে বিস্ময়কর কল্পনৈক্য রয়েছে H.G. Wells-এর The Island of Dr. Moreau (1896) গ্রন্থের। Dr Moreau সিংহের সঙ্গে গণ্ডার মিশিয়ে, বাঘের সঙ্গে বানর মিশিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণী এই দ্বীপে বসে সৃষ্টি করতেন। সুকুমার রায় Wells-এর মতই 'ব্যাকরণ মানি না' বলে বল্গাহীন কল্পনার শৈল্পিক উৎকর্ষ থেকে এই কিম্ভূত প্রাণিজগৎ নির্মাণ করেছেন।

অবশ্য ভিন্ন প্রকৃতির দুই জীব-এর মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন এক প্রাণী সৃষ্টির কৌতূহল সকল দেশে শিল্পিমনের বহু প্রাচীন কৌতূহল। ওদেশে মধ্যযুগে Unicorn, Griffin, Mermaid, Gargoyle ইত্যাদি Grotesque মূর্তির কল্পনায় শিল্পীর খেয়ালী বাসনা উল্লেখযোগ্য। Unicorn হল 'Fabulous animal repersented as having the body of a horse with a single horn projecting from its forehead.[৬]

Griffin : Fabulous creature with eagles head and wings and lion's body.[৭]

Mermaid : Fabled being inhabiting the sea with head and trunk of a woman (or man) and tail of a fish.[৮]

Gargoyle : Grotesque spout usually with human or animal mouth, head, or body, projecting from gutter of building.[৯]

আমাদের দেশে নৃসিংহমূর্তির, অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কল্পনায়, প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে, গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে জলনিষ্কাশনের মুখে, বাড়ির সম্মুখ চিত্রণে, এই Grotesque চেতনা কাজ করেছে। H. G. Wells বা সুকুমার রায়ের কিম্ভূত জীবকুল, Lear-এর Luminous Nose Dong, রবীন্দ্রনাথের দাড়ীশ্বর, ত্রৈলোক্যনাথের 'মানুষ গোরু', কবিমনের প্রাচীনকালাগত এই Grotesque কল্পনারই কৌতূহলজাত। Unicorn, নৃসিংহমূর্তি ইত্যাদির সঙ্গে এঁদের জীবসৃষ্টির পার্থক্য এই যে প্রথম ক্ষেত্রে Grotesque মূর্তিগুলি প্রতীক হয়ে এসেছে, ঐশী লীলা, ভক্তি, ভীতি, বিহ্বলতা প্রকাশের রূপ হয়ে এসেছে। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ খেয়ালী কল্পনার কৌতূহলজাত এই মূর্তিগুলি হাস্যসৃষ্টির সচেতন উদ্দেশ্যে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উৎকল্পনার হাস্যরসধারা এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যধারা। সুকুমার রায় এই ধারা-প্রবাহে একটি প্রজ্জ্বল নাম। উৎকল্পনার হাস্যরসের কবিতা ধারার উৎসস্থল তিনিই।

৬-৯. The Reader's Digest, Great Encyclopaedia Dictionary.

নবম অধ্যায়

[প্রেমেন্দ্র মিত্র]

(১৯০৪...)

ত্রৈলোক্যনাথের ধারায় রাজশেখর বসু উদ্ভট পৌরাণিক গল্প সৃষ্টি করে নতুনত্ব দেখিয়েছেন আর প্রেমেন্দ্র মিত্র ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে কল্পনার অসম্ভবতার গল্পরচনার বিশেষত্ব দেখিয়ে বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের এই ধারাটির চর্চা ও সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছেন। 'ঘনাদা' এই চর্চার ফসল। বর্তমান বাংলা সাহিত্যে 'ঘনাদা' পাঠকসমাজে বিপুল আদৃত।

ঘনাদা কথিত এই গল্পগুলি অথবা ডমরুধর বা Lord Dunsany-র Jokens কথিত গল্পগুলি ভালোলাগার কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এ-জাতীয় চরিত্রের যে একটা সুপ্ত অস্তিত্ব রয়েছে, গল্পগুলি পড়ে সেটা প্রসন্ন হাস্যে বোধ করি। জীবনে আমাদের বাসনা শতকরা নব্বই ভাগেরও বেশী অপূর্ণ থেকে যায়। আমাদের ক্ষমতা সীমিত। আর্থিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় আমরা বঞ্চিত, অবহেলিত। সুতরাং অপূর্ণ বাসনা প্রতি পদে আমাদের অবদমিত করে চলতে হয়। Tall-talks-এর সৃষ্টি হয় জীবনের এই সত্যতা থেকেই। বাস্তব অভিজ্ঞতায় যে 'গুলবাজ' চরিত্রের সন্ধান মেলে তার পশ্চাদ্‌ভূমিতে রয়েছে অবদমিত বাসনার পূর্ণতা-লাভের অন্তর-লালিত ইচ্ছা। এর মধ্যে একটা ট্রাজেডিবোধ রয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যায় পীড়িত যে কোন সমাজ-জীবনে এই ট্রাজেডি দেখা দেবে। শিল্পী এই গভীর সত্যকে রূপ দিয়ে সিরিয়াস সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। এই বোধ humour-এর সাহিত্যে রূপ দিতে পারেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'তাসের ঘর' গল্পে আর্থিক সমস্যা-পীড়িত আমাদের পারিবারিক জীবন অনুরূপ ট্রাজিকবোধে ব্যথিত হাস্যে রূপ পেয়েছে।

'ডমরুচরিত' বা 'ঘনাদা'র অবিশ্বাস্য গল্পগুলিতে (ঘনাদার বাগী দত্তের ভাষায় কিংবা ত্রৈলোক্যনাথের আড্ডার ভাষায় এই গুল বা গাঁজার দমের গল্পগুলিতে) একই জীবনসত্য রূপ পেয়েছে ভিন্নভাবে। জীবনের এই ব্যথিত

গভীর দিকটাকে কল্পনার উচ্ছ্বসিত হাস্যে উজ্জ্বল করে ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রেমেন্দ্র মিত্র দেখিয়েছেন। পাঠকসাধারণ তাঁদের দৈনন্দিনের সমস্যাহত ক্লান্ত জীবনে নিজেদের অবদমিত ইচ্ছাকে বৈষম্যহীন, অশ্রুআঘাতহীন প্রসন্ন উচ্চহাসিতে রূপ পেতে দেখে সহাস্য আনন্দ পান। এদিক থেকে উৎকল্পনার হাস্যস্রষ্টা বাস্তব-ভীরু শিল্পী নন। তিনি জীবনবাদী স্রষ্টা। আর এখানেই 'ডমরুচরিত' বা 'ঘনাদা' কথিত অসম্ভব কল্পনার গল্পগুলির শিল্পমূল্য এবং জনাদর।

১৩৬৩ সনে মুদ্রিত ঘনাদার গল্পগ্রন্থে ঘনাদাকে আমরা প্রথম দেখেছি। কিন্তু এরও চার বছর আগে ঘনশ্যামবাবুকে একবার পেয়েছি ১৩৫৯-এ মুদ্রিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্পে। রাজশেখর বসুর 'ধুস্তুরী মায়া'র দুই বুড়োর মত দক্ষিণ কলকাতার লেকে বৃত্তাকারে আসনে মর্মরের মত মসৃণ মাথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু প্রমুখ চার বৃদ্ধ ও ঘনশ্যামবাবুর আসর বসত। এই আসরে যে গল্পটি তিনি সেদিন শুনিয়েছিলেন তার নাম 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন'। এখানেই শুনেছি ঘনশ্যামবাবু কলকাতার কোন এক মেসে থাকেন ও ছেলেছোকরাদের মহলে ঘনাদা-রূপে তাঁর অল্পবিস্তর একটা খ্যাতি আছে। এদের প্রিয় ঘনাদাকে নিয়েই ১৩৬৩ থেকে ১৩৮৩ পর্যন্ত (১৩৮৩তে পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'দুনিয়ার ঘনাদা') প্রেমেন্দ্র মিত্র গল্প লিখে এসেছেন।

বাংলা সাহিত্যে এই কাল্পনিক গাল্পিক চরিত্র ঘনাদার গল্পগুলিতে বহিরাগত প্রভাব থাকলেও ত্রৈলোক্যনাথের 'মুক্তামালা'র আড্ডাখানার গল্পকথক ঘনশ্যাম এবং ডমরুচরিত-এর নায়ক ডমরুধরই ঘনাদার পূর্বপুরুষ। 'মুক্তামালা'র ঘনশ্যামের মত প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনশ্যাম ওরফে ঘনাদাও বহু বিপৎসঙ্কুল অভিযানের মধ্য দিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাঁর আসরকে মুগ্ধ ও চাপা হাসিতে উৎফুল্ল করে রেখেছেন।

গল্পকথন মেজাজেও ঘনাদা ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ডমরুধরের উত্তরসূরী। ঘনাদার চেহারাটাও পূর্বপুরুষ ডমরুধরের আদল। ডমরুর এমন রসকষহীন চামড়ায় ঢাকা হাড়ের চেহারা যে পীর গোরাচাঁদের বাঘ পর্যন্ত তাকে গিলে হজম করতে পারেনি। ঘনাদার চেহারাটাও ডমরুর মত 'শুকনো হাড় বার করা'।

ডমরুর সঙ্গে কিংবা ঘনশ্যামের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার যে পার্থক্য তা মেজাজগত নয়, যতটা পরিবেশন কৌশলগত। একটা বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক

বাতাবরণ সৃষ্টি করে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর গল্প বলেছেন। তাঁর কল্পনা আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সমতলভূমি, মালভূমি, পর্বতের শিখরদেশ ভ্রমণ করেছে। তুষারমানব এয়াতি, জাহাজ, প্লেন, ইলেকট্রিক ট্রেন, স্পরকেল সাবমেরিন, ভারি এক ফোঁটা জল, কোন একখানা ঐতিহাসিক দলিল, অজানা কোন এক দ্বীপ, টেলিস্কোপ, কুইডেড মিসাইল (অর্থাৎ দূর থেকে চালানো অস্ত্র) নিয়ে তাঁর গল্পের সৃষ্টি। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরুধরের বা তাঁর ঘনশ্যামের আসর ছিল গ্রাম্য আসর বা চণ্ডীমণ্ডপ। বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবে চণ্ডীমণ্ডপ বিলুপ্তির পথে। সুতরাং ঘনাদার আসর বসেছে কলকাতার এক গলির এক মেসে। ডমরুধরের গল্পের শ্রোতা গ্রামের ইয়ারবন্ধু। ঘনাদার শ্রোতা সহরের এক মেসের শিক্ষিত তরুণ দল। সুতরাং ঘনাদার গল্পে রয়েছে নাগরিক চাতুর্য। আর প্রায় অর্ধ শতকের যুগসীমায় বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও রীতির পরিবর্তন ডমরু ও ঘনশ্যামের কথনভঙ্গীর সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার কথনভঙ্গীর পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যে উৎকল্পনার হাস্যরসের প্রায় শতবর্ষব্যাপী যে তরঙ্গধারা গড়ে উঠেছে, সেই ধারানুসৃতিই ঘটেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা'য়।

ঘনাদা বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোলের একটা বিশ্বাস্য ও তথ্যনির্ভর পথরেখা ধরে পাঠকমনকে অবিশ্বাসের রাজ্যে পৌঁছে দিয়েছেন। আজগুবি, উদ্ভটকে বিশ্বাস্য করে তুলবার জন্য বিজ্ঞানের একটা জাল বিস্তার করে রেখেছেন। পাঠকমন যখন বিজ্ঞানের আবহে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, সেই প্রত্যয়শীল প্রস্তুত মনে তিনি উৎকল্পনার গল্প ঠেলে দিয়েছেন। অনুরূপ করেছেন H. G. Wells. 'The Story of the Late Mr. Eluesham'-এ Wells এক রাসায়নিক পাউডার (Pinkish Powder) আনলেন। পাঠক বিজ্ঞানের অঘটন ঘটনপটীয়সী ক্ষমতায় পূর্ব থেকেই বিস্মিত। Pinkish Powder-এর অদ্ভুত ক্ষমতা থাকতেও পারে। এই মানসিক প্রস্তুতি ঘটিয়ে Wells দেহ বদলের উদ্ভট গল্প ফাঁদলেন। তাঁর Eluesham তরুণ Eden-কে Pinkish Powder খাইয়ে দিয়ে তার সঙ্গে দেহ বদল করে নিল। Eden হল 'a young man locked away in an old man's body' আর Eluesham Eden-এর তরুণ বয়স নিয়ে, চেহারা নিয়ে, তার চেকবই, তার টাকা নিয়ে ভারপোর আনন্দে ভেসে চলল। The Plattner Story-তে Wells

বিজ্ঞানকে উদ্ভট হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে আনলেন। রসায়নের পরীক্ষাগারে এক বিস্ফোরণে 'Plattner had been blown clean out of existence and left not a wrack behind'. বিস্ফোরণ তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক 'boulder of rock covered with a velvety moss'-এ ফেলেছে। সেখান থেকে Plattner কি ভাবে ফিরে এলেন তার হাস্যময় উৎকাল্পনিক গল্প 'The Plattner Story'. এই গল্প যদি পাঠক বিশ্বাস না করেন, এইজন্ত Raspe, ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখের মত Wells গল্পের আরম্ভে খুব প্রত্যয় নিয়ে বললেন—'Whether the story is to be credited or not is a pretty question on the value of evidence.' এত বড় আজগুপির গল্প বলে ধরা পড়ার আশঙ্কায় প্রেমেন্দ্র মিত্রও আশঙ্কিত ছিলেন। এইজন্য যখনই শঙ্কা দেখা দিয়েছে ঘনাদা বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, কখনও অতীব তৎপরতায় প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। 'মুড়ি' গল্প শুনে গৌরাঙ্গ যখন জিজ্ঞাসা করল 'দ্বীপটার নাম কি ছিল ঘনাদা ?' ঘনাদা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'যা ডুবে গেছে তার নামে কি দরকার ?' 'আর সেই ছটাকখানেক হীরেটা ?'—শিবু জিজ্ঞাসা করল, 'সেটা নিশ্চয়ই হাতছাড়া করেননি।' ঘনাদা হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। শিবুর কথাটা বোধহয় কানেই গেল না। গল্প শুনে শিবু শিশির বিপিন প্রভৃতির মত আমরাও বুঝতে পারি,—এ গাঁজা, অসম্ভব, উদ্ভট গল্প। তথাপি তার ভীষণ আকর্ষণকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা নেই। এই আকর্ষণেই শিবুর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচের হোয়াইট গ্যালারির টিকিট নষ্ট হয়েছে, মাছ ধরবার সব আয়োজন গল্পাকর্ষণে ভণ্ডুল হয়েছে।

অন্যান্যদের মত প্রেমেন্দ্র মিত্র এ-ক্ষেত্রে চমক সৃষ্টির কৌশল আয়ত্ত করেছেন। সমুদ্ধ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করব এক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্র সমুদ্ধের কাছে ঋণী। গল্পের সুরুতেই একটা চমক ধাঁ করে ঘনাদা ছুঁড়ে দিয়েছেন, যেমন দিয়েছেন সমুদ্ধের 'উদ্ভট শিকার কাহিনী'র কান্তি চৌধুরী। সে এমন এক চমক যা শুনে বাপী দত্ত গুগড়ি হাঁসের শোক ভুলে যায়, ঘনাদাকে লক্ষ্য করে উদ্যত তার ঘুষি শিথিল হয়ে পড়ে। মারমুখী চেহারা বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় বিনীত ভক্তের সমর্পণে বিগলিত হয়। এই চমকটাই লেখকের প্রতিপাদ্য। প্রতিপাদ্যটা প্রথমে দাঁড় করিয়ে সমুদ্ধের রীতিতে প্রেমেন্দ্র মিত্র যুক্তি পরম্পরায়, ভূগোল-বিজ্ঞান-ইতিহাসের উদাহরণ উপস্থাপনায় তাকে প্রতিপন্ন করেছেন। 'হাঁস' গল্পে মারমুখী বাপী দত্ত বলল—

কার হুকুমে। কোন্ সাহসে আপনি আমার হাঁস কেটেছেন,—বাড়ি নিয়ে যাব বলে বাছাই করে কেনা আমার চার চারটে হাঁস।' ঘনাদা যেন দুঃখিত হয়ে বললেন—'চারটে তো মোট।'……'এ পর্যন্ত কেটেছি ১২৩২ টা। আরো কত যে কাটতে হবে কে জানে।' এই চমকটায় যখন কাজ হল না, বাপী দত্ত হুঙ্কার দিয়ে যখন বলে উঠল, 'যাচ্ছেন কোথায়? আপনার ওসব গুল আমার কাছে ঝাড়বেন না। এসব চালাকি আমি সব জানি।' তখন ঘনাদা আরও জোরে ছুঁড়ে দিলেন বাপী দত্তের বুনো মোষের গোঁ-র ওপর প্রচণ্ড চমক—'জানো। জানো গুগারুসেরচঙ কাকে বলে।…জানো, তিনশ সেরা শিকারী দুনিয়ার সমস্ত জলা জঙ্গলে এই হাঁস খুঁজে ফিরছে? জানো, একটা হাঁসের জন্য গলায় গলায় যাদের ভাব এমন দু দু'টো রাজ্য এ ওর গলা কাটতে পারে? জানো, একটা হাঁসের পেট কেটে এই কলকাতা শহরটা কিনে নিয়েও যা থাকে, তাতে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইজারা নেওয়া যায়।'

এই শেষের কথাতেই বাপী দত্ত কাবু। এবং শুরু হল ঘনাদার অবিশ্বাস্য উদ্ভট এই প্রতিপাদ্যকে বিশ্বাস্য করে তুলবার চেষ্টা।

'নুড়ি' গল্পের আরম্ভ হয়েছে ঘনাদার এতটুকু একটা ছটাকখানেক ওজনের নুড়ি তোলার চেষ্টা এবং তার ভয়াবহ পরিণতি দিয়ে। এক ছটাক ওজনের নুড়িটি তুলবার জন্যই মিকিউ দ্বীপটা ফেটে চৌচির হয়ে সমুদ্রে ডুবে গেল। এতবড় তাজ্জব কথাটা শুনে বিস্ময় এবং অবিশ্বাসের মজা লাগায় যখন পাঠক উৎসুক এবং উদ্গ্রীব তখন ঘনাদা এই পরিণতির সত্যতা প্রমাণে গল্প ফাঁদলেন। এবং বহু মঁসিয়ে, বহু ইতিহাস ভূগোলের তত্ত্ব, অনেক ঘটনা দিয়ে গল্পকে আগিয়ে দিয়ে পূর্বকথিত চমকটাকে সত্য প্রমাণিত করলেন। গল্পশেষে পাঠক অবিশ্বাসের আনন্দে অথচ বিশ্বাস্য করে তুলবার মুন্শীয়ানায় খুশী।

'ফুটো' গল্পে ঘনাদার প্রশ্নটাই হাস্য উদ্রেক করে 'কি ফুটো জীবনে দেখেছ হে।' এবং তারপর 'চার কোটি মাইল একটা ফুটো'র অবিশ্বাস্য গল্পকে বিজ্ঞানের সত্যতা দিয়ে বিশ্বাস্য করবার ঘনাদার চেষ্টা পাঠককে প্রচণ্ড হাস্যে ভরে তুলেছে। ডঃ মিনোস্কি বলছেন 'এসেছি ফুটো দিয়ে গলে। হ্যাঁ সত্যিই ফুটো। মহাশূন্যের ফোর্থ ডাইমেনসন্ মানে চতুর্থ মাপ-এর ফুটো। লম্বা, চওড়া, উঁচু, এই তিন মাপ দিয়েই সৃষ্টির সব কিছু আমরা দেখতে জানি। গণিত-বিজ্ঞান এ ছাড়া আরও মাপের সন্ধান পেয়েছে, কিন্তু তা কাজে লাগাতে

কেউ পারেনি এ্পর্যন্ত। আমার এই পরীক্ষায় প্রথম সেই চতুর্থ মাপের জগৎ মানুষের আয়ত্তে এল। ব্যাপারটা তোমায় একটু ভালো করে বোঝাই। খুব লম্বা একটা চিমটে মনে করো। এক দিকের ডগা থেকে আর এক দিকের ডগায় পৌছতে একটা পিঁপড়েকে সমস্ত চিমটেটা মাড়িয়ে যেতে হবে। তাতে তাকে হাঁটতে হবে ধরো তিনগজ। কিন্তু চিমটের একটা ফলা থেকে আর একটা ফলা মাত্র এক ইঞ্চি দূরে যদি থাকে আর ওপরের ফলা নিচের ফলায় যাবার একটা ফুটো যদি পিঁপড়েটা পায় তা হলে এক ইঞ্চি নেমেই তিনগজ হাঁটার কাজ তার সারা হয়ে যাবে। লম্বা, চওড়া ও উঁচু এই তিন মাপের জগতে যা অনেক দূর, চতুর্থ মাপ দিয়ে সেখানে অতি সহজে পৌছবার এমন অনেক ফুটো মহাশূন্যে আছে। তেমনি একটা ফুটোই আমি খুঁজে পেয়েছি।'

ডঃ মিনোস্কির এই 'ফুটো'র আবিষ্কার-গল্প, বাংলা সাহিত্যে নতুন স্বাদের গল্প। আমাদের সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিজ্ঞানের আশ্রয়ে উৎকল্পনার হাস্য-সৃষ্টির একটি অ-পূর্ব শৈলী রচনা করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে তিনি নিপুণ এবং স্বতন্ত্র। ত্রৈলোক্য-উৎসাগত উৎকল্পনার গল্পধারাকে রাজশেখর বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এইভাবে সমৃদ্ধ ও বিচিত্রস্বাদী করে তুলে এই ধারাটিকে একালের রসিক পাঠকসমাজের কাছে আদৃত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সে' গ্রন্থে তাসমানিয়াতে তাসখেলার নেমন্তন্নে শ্রীমতী হাঁচিয়েন্দানি কোরাস্কুনা, পামকুনি দেবী, কিন্টিনাবুর মেরিউনাথ্-কে এনে দেখিয়েছেন উৎকল্পনার গল্পসৃষ্টিকে প্রয়াস কিভাবে নষ্ট করে। 'ঘনাদা'র গল্পে দেশ, স্থান, চরিত্রের নামে এই প্রয়াস রয়েছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পকথক 'সে' গল্পের চালে যে ভুল করেছিল, সে ভুল ঘনাদা করেননি। আমাদের ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি দ্বীপ, দেশ, চরিত্র প্রভৃতিকে অনায়াস সহজতায় জুড়ে দিয়েছেন। যেমন, যখনই তিনি বলেন চেল্যুস্কিন অন্তরীপ উত্তর মেরুর দিকে রাশিয়ার শেষ স্থলবিন্দু অথবা এ্যাভালন শহর ক্যালিফোর্ণিয়ার পশ্চিমে সেন্ট ক্যাটার্ণিনা দ্বীপে, তারই সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন—'ক্যাটালিনা দ্বীপটা যেন একটা নাদাপেট বেলেমাছ দক্ষিণমুখো চলছে, আভ্যালেন শহরটা যেন তার চোখ।' ফলে ভৌগোলিক প্রত্যয় জেগেছে, এবং দ্বীপটা তার চেহারা নিয়ে সুপরিচিত ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অথবা যখন চার কোটি মাইল ফুটোর বাস্তবতাকে যুক্তি দিয়ে দেখান, তখন ডঃ মিনোস্কির

নামটা প্রত্যাশিত বৈজ্ঞানিক একটি নাম হয়ে ওঠে এবং পাঠকমনে বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় জাগে। এই সবকিছুকে চমকসৃষ্টির প্রবল হাস্যকৌশলে পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথের 'সে' কথিত গল্পের ত্রুটি থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র মুক্ত হয়েছেন।

তথাপি, ঘনাদার কোন কোন গল্পের ত্রুটি রসিক পাঠককে পীড়া দেবে। এই ত্রুটির কারণ হল, লেখক হয়তো মনে করেছেন ঘনাদাকে নিয়ে অশেষ গল্প-মালা রচনা করা যাব। তারই ফলে উচ্চাঙ্গের মুন্শিয়ানা সত্ত্বেও পাঠকের রসবোধে একঘেয়েমির সৃষ্টি হযেছে। ঘনাদার প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড অনবদ্য। তৃতীয় খণ্ডে এসে পাঠকের বিস্ময ও আনন্দ কথনও কথনও নবীনতা হারিযেছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে এসে গল্পের চমক সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আব চোখে পডতে চায়নি। কারণ লেখকের সৃষ্টির কৌশল আমাদের কাছে বহু পরিচিত হয়ে গেছে। কল্পনার কাজ যে উদ্ভাবন করা সেই ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে; কল্পনার নবীনতা বিস্ময়-সৃষ্টিতে আর সক্ষম নয়। তিনটি গল্পে সম্পূর্ণ যে চতুর্থ খণ্ডটি 'ঘনাদাকে ভোট দিন!' বৈশিষ্ট্যহীন। পঞ্চম খণ্ডে এসে রসবৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নে লেখক বোধহয় নিজেই সন্দিহান ছিলেন। তাই 'ঘনাদা নিত্য নতুন' এই নামকরণ করে এই খণ্ডের গল্পরস যে ব্যাহত হয়নি, ঘনাদা যে পুরণো হয় নি, সে কথা লোককে বিজ্ঞাপনের মত করে বলতে হয়েছে। ১৩৮০-র 'কিশোর ভারতী'র শারদসংখ্যায় লিখলেন 'বেডাজালে ঘনাদা'। ঘনাদাকে নিয়ে ১৭ বছর ধরে (১৩৬৩ থেকে শুরু) গল্প লিখতে ১৩৮০ সালে এসে লেখক নিজেই অসুবিধার বেড়াজালে পড়েছেন। গল্পটি পড়ে বেশ বোধগম্য হয় ঘনাদার বয়স হয়েছে এবং তাঁর উদ্ভাবন-শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। ১৩৮৩-তে প্রকাশিত 'দুনিয়ার ঘনাদা'-য ঘনাদা যতই বিশ্বমুখী হউন না কেন, তিনি যৌবন জলধি-উচ্ছ্বাস হারিযেই ফেলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, কয়েকটি গল্পের দৈর্ঘ্য গল্পের পক্ষে রসহানিকর হয়ে উঠেছে। উৎকল্পনার যে শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে গল্পকথনের চমক সৃষ্টির উৎকর্ষের ওপর গল্পের সার্থকতা নির্ভর করে রয়েছে। পাঠক চমক সৃষ্টির জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে থাকেন। তাঁর সেই উন্মুখতাকে গল্পের এলায়িত রূপ অথবা ব্যাখ্যা ও দৈর্ঘ্য নষ্ট করে দেয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চম খণ্ডের অনেক গল্পে অনুরূপটা ঘটেছে

৫৪ পৃষ্ঠার 'ছুঁচ' এবং ৫৮ পৃষ্ঠাব্যাপী 'ঘনাদাকে ভোট দিন' গল্পের বিস্তারিত ও ব্যাখ্যাত দেহে চমকসৃষ্টির ক্ষণবিদ্যুৎতীক্ষ্ণতা ও ঐশ্বর্য-উল্লাসের অভাব লক্ষণীয়। ১৩৭৭ সালে শারদীয় কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত 'মূলো' গল্পটির অবতারণা-অংশের দৈর্ঘ্য পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'ডমরুচরিত' গ্রন্থকে এই পীড়াদায়ক দৈর্ঘ্য-ত্রুটি থেকে মুক্ত করবার জন্য একাধিক গল্পে বিভক্ত করেছেন। এই ক্ষুদ্র আয়তন হল Raspe-এর গল্পের বৈশিষ্ট্য। এবং তিনি সদাসতর্ক ছিলেন সংক্ষিপ্ততাগুণ সৃষ্টির দিকে। রাজশেখর বসুর উৎকল্পনার গল্পগুলির ঘনপিনদ্ধ ক্ষুদ্র কায়া লক্ষণীয়। ত্রৈলোক্যনাথ 'লুল্লু'র মত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থকে বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে প্রতিটি পরিচ্ছেদকে আবার ঘন ঘন চমকদানে সজ্জিত করে উৎকল্পনার শিল্পরূপটিকে অযথা বিস্তারের রসহানি থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে এই গল্পায়তন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। উক্ত দুই খণ্ডে ১৬ থেকে ২৫ পৃষ্ঠার মধ্যে গল্প শেষ হয়েছে। লক্ষণীয় যে রসবেদনের দিক থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পরবর্তী খণ্ডগুলি থেকে অনেক উচ্চমানের।

ছ'টি খণ্ডেও ঘনাদার কাহিনী প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাপ্ত করলেন না। ঘনাদাকে 'ঘনোদা' করে 'সূর্য কাঁদলে সোনা' নামে একখানা উপন্যাস রচনা করলেন। বৃদ্ধ ইয়ারদের লেকের আসর থেকে যে ঘনশ্যামবাবুকে দশবছর বিচ্ছিন্ন করে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাকে সেখান থেকে আবার ১৩৭৪ সালের ১১ই শ্রাবণ বৃদ্ধদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। হয়তো লেখকের মনে এ-জাতীয় একটা ধারণা কাজ করেছে, ঘনাদাকে ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে বন্দী করে না রেখে এবার বয়স্কদের জন্য ঘনাদাকে নির্মাণ করা যাক্।

কিন্তু ঘনাদা একমেবমদ্বিতীয়ম্। ঘনশ্যাম বা ঘনোদা তার মেক আপ। তাছাড়া 'সূর্য কাঁদলে সোনা' রবীন্দ্রনাথ-কথিত ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। আতাহুয়া-লাপার, হুয়াসকার প্রভৃতি নামের ওপর হোঁচট খেয়ে খেয়ে পাঠক ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। ঘনাদা ছেলে-ছোকরা থেকে বয়স্ক সকল বয়সের পাঠকের রসবোধে উৎকল্পনার গল্পের সীমায় মগ্ন থেকেই নিটোল। তাকে নিয়ে এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসে প্রয়াসী হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঠক-মনে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত ঘনাদার রসোত্তীর্ণ চিত্রখানিকেই খর্ব করেছেন।

দশম অধ্যায়

[সমুদ্ধ]

(১৯১১......)

ত্রৈলোক্য-উৎসধারায় আরেকজন লেখক স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। তিনি সমুদ্ধ। পিতৃদত্ত নাম অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত। উদ্ভট শিকার কাহিনীর হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন। সমুদ্ধ Raspe-র Baron Manchausen-র শিকার কাহিনী নিশ্চয়ই পড়ে থাকবেন। কারণ Raspe-র শিকার কাহিনীর মেজাজ, রসাস্বাদন, রচনাশৈলী ও ঘটনা বিন্যাসের সঙ্গে সমুদ্ধের উদ্ভট শিকারের গল্পগুলির বিস্ময়কর ঐক্য রয়েছে। কর্মজীবনে তিনি একজন অধ্যাপক। সুতরাং Raspe-র গ্রন্থ পড়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। অবশ্যই ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরাধিকার তার মধ্যে লক্ষণীয়। 'ডমরু-চরিত'-এ কুমীর শিকারের যে মৌলিক গল্প রয়েছে, বাংলা সাহিত্যে উদ্ভট শিকার কাহিনীর আরম্ভ সেখানেই। এই ধারারই সার্থক পরিণতি সমুদ্ধের উদ্ভট যত শিকার কাহিনী'তে।[১] 'বাঘের থাবা', 'সাপের ছোবল', 'ভালুকের আলিঙ্গন', 'কুমীরের কীর্তি', 'গণ্ডারের গুণ্ডামি', 'বাইসন ও বায়োস্কোপ', 'কেউটের কেরামতি', 'ওস্তাদের মার'—ইত্যাদি গল্পে শিকারটা উপলক্ষ্য, লক্ষ্য কল্পনার বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তির অনাবিল হাস্যানন্দ সৃষ্টি। যেমন 'বাঘের থাবা' গল্পটি। 'শিকারী কান্তি চৌধুরী মীরপুরে বাঘ মারতে চললেন। বহু সন্ধানে বাঘ শিকার করলেন। কিন্তু সঙ্গী কেতুকে বাঘ জাপটে ধরে এক থাবায় তার মাথাটা চৌচির করে দিয়েছে। কেতুর মাথার খুলি দুই কানের বরাবর ফেটে চৌচির। মাথার উপর দিককার খাপড়াটা একেবারে উড়ে চলে গেছে। কি ভাগ্যিস কেবল ঘিলুটায় চোট লাগেনি। ঘিলুর ওপরে এক টুকরো কচি কলাপাতা বিছিয়ে রুমাল দিয়ে বেঁধে দিলেন শিকারী। কেতু ব্রাণ্ডি খেয়ে আর টিংচার আইডিন লাগিয়ে চোখ মেলল।

---

১. ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণে 'শিকার কাহিনী' নামে তাঁর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নতুন সংস্করণে নামকরণ পরিবর্তিত হয়—'উদ্ভট যত শিকার কাহিনী'।

কিন্তু পাপড়াহীন মাথায় বাড়ি যাবে কি করে? অতএব 'কচি আর বড় দেখে ডাব পাড়া হল। একটা ডাব কেটে তার মালার আধখানাকে চেঁছে ঠিক করে কেতুর মাথায় বসিয়ে দিলাম, দিব্যি কাপে কাপে বসে গেল। সায়েবদের সঙ্গে সুজি ছিল। ভিজিয়ে মোলাম করে কেতুর নতুন খুলি জুড়ে দিলাম। মাথা বেমালুম আস্ত হয়ে গেল। বুনো জাত কিনা, ওদের একটুখানি ওষুধপত্তর পড়লেই অদ্ভুত কাজ করে।'…'দুবছর পরে কেতুর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়। দেখলাম, তেল চুকচুকে টাকটি গামছা ঢাকা দিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

সম্বুদ্ধের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভট গল্প বলবার আসরীয় ভঙ্গীটির সঙ্গে Raspe-র চমকপ্রদ ঘটনা বিন্যাসের কৌশল একত্রিত হয়েছে। Chapter V-র পূর্বউদ্ধৃত গল্পটির সঙ্গে এই গল্পের ঐক্য লক্ষণীয়। সম্বুদ্ধও একটি আসর রচনা করেছেন। কান্তি চৌধুরীর ইয়াররা বলল, 'কিন্তু টাক হয়ে রইল বেচারীর। কেশরঞ্জন মাখিয়ে দেখলে হত না?' কান্তি চৌধুরী বললেন, 'বলেছিলাম। মেগেও ছিল দিনকতক। তা গজাল গুচ্ছের নারকেলের আঁশ। তাই শেষটা কেতু আর মাখেনি। বলেছে, থাক আমার টাকই ভাল।'

উৎকল্পনার হাস্যসৃষ্টির উৎকর্ষ অনায়াস ভঙ্গীটির সৃষ্টিতে। অপূর্ব এক নিস্পৃহতায় লেখক চমক হানেন, ত্রৈলোক্যনাথ, Raspe, রাজশেখর সকলেই এই শিল্পরীতিটি আয়ত্ত করেছেন। সম্বুদ্ধ এই রীতি প্রয়োগে তাঁদের সমগোত্রীয় উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। যেমন 'ভালুকের আলিঙ্গন' উৎকল্পনার হাস্যরসের সার্থক রীতির আরেকটি চমৎকার শিকার গল্প। ভালুকের আলিঙ্গনের মধ্যে আটকে পড়ে কান্তি চৌধুরী ডান হাতের ভোজালি তুলে ভালুকের লোমশদেহে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু ভোজালি লোমে আটকে গেল। ওদিকে প্রচণ্ড পেষণে শিকারীর প্রাণ কণ্ঠাগত। 'এমন সময় হঠাৎ ভোজালিশুদ্ধ ডানহাতখানা অবশ হয়ে পড়েছে, প্যান্টের ডান পকেটে কি একটা শক্ত জিনিষের সঙ্গে ভোজালির বাঁটটা ঠুকে গিয়ে ঠক্ করে আওয়াজ হল। আশ্চর্য মানুষের মন। মৃত্যু তখন চোখের সামনে, অথচ আমার মনে একটু জড়তা নেই। বেশ ধীরে সুস্থে চিন্তা করে যাচ্ছি। বোধহয় মৃত্যু নিশ্চয় জানলে আর আতঙ্ক থাকে না, যত ভয় করে আগেই। ঠক্ করে শব্দটা কানে যেতেই আমার মনে কি রকম একটা চিন্তা জেগে উঠল। ওটা কি? কি রেখেছিলাম পকেটে? চাবির গোছা আমি

পকেটে রাখি না। ...কৌতূহলের জয় হল, সেই সময়েও ডান হাতের আঙুল দিয়ে পকেট টিপে টিপে দেখলাম, জিনিসটা কি। একটা শক্ত ছোট জিনিষ আঙুলে ঠেকল। ইংরেজী T-এর মত তার আকার, ডাঁটটা সরু, গোল। মাথাটা চ্যাপটা। ক্ষুর। চট করে মনে পড়ে গেল, ক্ষুর হাতে করেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ক্ষুর? বিদ্যুতের মত একটা কথা মাথার খেলে গেল। আর দেরী নয়, আর সময় নেই। ডান হাতের ভোজালি বাঁহাতের মুঠিতে গুঁজে দিয়ে, পকেটে হাত পুরে ক্ষুরটা বার করলাম। আমার পাঁজরার পাশে, ঠিক যেখানটাতে ভালুকের হৃৎপিণ্ডটা দুপ দুপ করে লাফাচ্ছে, সেইখানে ক্ষুর বসিয়ে টান লাগালাম। নতুন গিলেট ব্লেড, চড় চড় করে ভালুকের বুকের চামড়া পরিষ্কার কামানো হয়ে গেল। উত্তেজনায় তখন আমার হাত কাঁপছে, মনে হচ্ছে বাঁচতেও বা পারি। ভগবান, আর একটু কালের জন্য আমাকে শক্তি দাও, আর দু'মিনিট। একটান, দু'টান, তিন টান। ভালুকের বুকের প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া হয়ে চামড়া কামানো হয়ে গেছে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরে। চামড়ার ওপরে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আর এক টান। যথেষ্ট। ক্ষুরটা ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাত থেকে ভোজালিটা নিলাম। জয় মা কালী। গায়ের সবটুকু জোর একত্র করে সেই কামানো জায়গায় ভোজালি বসিয়ে দিলাম, হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপর।'

সমগ্র ঘটনাটিকে বিশ্বাস্য করে তুলবার কী সতর্কতা লেখকের। উৎকল্পনার হাস্যরসের সফলতার ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম প্রচেষ্টার শৈল্পিক উৎকর্ষ আশু প্রয়োজন। এই ধারার খ্যাত প্রত্যেক শিল্পী এক্ষেত্রে নিপুণ। সে নৈপুণ্য সম্বুদ্ধ আয়ত্ত করেছেন।

প্রত্যেক প্রতিভাই বড়ো অধমর্ণ। কিন্তু তথাপি স্বীকরণ-শক্তিতে তিনি মৌলিক হয়ে ওঠেন। 'কবিকণ্ঠাভরণ' প্রণেতা আচার্য ক্ষেমেন্দ্র 'কবি জীবিত' সম্পর্কে যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, সেখানে বলেছেন—

ছায়োপজীবী পদকোপজীবী পাদোপজীবী সকলোপজীবী।
ভবৈদথ প্রাপ্ত কবিত্বজীবী স্বোন্মোষতো বা ভুবনোপজীব্যঃ॥

এই স্বোন্মেষণ ক্ষমতার বলে সম্বুদ্ধ ত্রৈলোক্যনাথের কাছে নিঃসংশয় ঋণী হয়েও, Raspe-র কাছেও ঋণী হয়েও, লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পেরেছেন।

সম্বুদ্ধের স্বকীয় রীতিটি হল আসরকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে তিনি আরম্ভেই

একটি চমক ধাঁ করে ছুড়ে দেন। এই চমকটাই লেখকের প্রতিপাদ্য। প্রতিপাদ্যটা প্রথমে দাঁড় করিয়ে লেখক কল্পনার বিচিত্র শক্তিতে তাকে প্রতিপন্ন করেছেন। এতে করে পাঠকের কৌতূহল বহুগুণিত হয়ে এক বিপুলগ্রাসী গল্পাগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। লেখক তাকে কাজে লাগিয়েছেন সুকৌশলে। যেমন 'কুমীরের কীর্তি' গল্পে ইয়ারদের মুখে কুমীর কুমীর শুনে কান্তি চৌধুরী বললেন, 'কি সব কুমীর কুমীর কর। কুমীরের তোমরা দেখেছ কি। তোমরা যা দেখ, ওকে বলে গোসাপ।' এর পর চলল সেই অদ্ভুত গল্প যেখানে ঢাকায় নারায়ণগঞ্জের ওদিকে তিনি বাইশ হাত, চব্বিশ হাত লম্বা কুমীর শিকার করেছেন দস্তার সিকি. দুয়ানি দিয়ে। অথবা 'সাপের ছোবল' গল্পে। 'সাপ? সাপ আর তোমরা কি দেখেছ? সাপের রাজা হচ্ছে রাজসাপ, যার নাম শঙ্খচূড়।' কান্তি চৌধুরী কেবল সে-সাপ দেখেননি, তার ছোবলও খেয়েছেন। তারই বিচিত্র কাহিনী 'সাপের ছোবল'।

চমক পরিবেশনের এই রীতিটি সম্বুদ্ধের নিজস্ব। Raspe ও ত্রৈলোক্যনাথকে স্বীকরণ করে সম্বুদ্ধের স্বাতন্ত্র্য এক্ষেত্রে। এবং এই রীতিতে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে প্রভাবিত করেছেন। বয়সের দিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বুদ্ধের অগ্রজ হলেও উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঘনাদার (১৩৬৩) দশবছর পূর্বে কান্তি চৌধুরীকে নিয়ে (১৩৫৩ সালে সম্বুদ্ধের 'শিকার কাহিনী' মুদ্রিত হয়) সম্বুদ্ধ উৎকল্পনার হাস্যরসের আসরে অবতীর্ণ হন। 'সাপ? সাপ আর তোমরা কি দেখেছ।' কান্তি চৌধুরীর এই ভঙ্গীতেই ঘনাদা বলেন, 'ফুটো? কি ফুটো জীবনে দেখেছ হে।'

ত্রৈলোক্যনাথের ধারায় রাজশেখর বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং সম্বুদ্ধ যথাক্রমে উৎকাল্পনিক পৌরাণিক হাস্যরসের গল্প, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবহের গল্প এবং শিকার কাহিনী রচনা করে উৎকল্পনার হাস্যরসের সাহিত্য-ধারাটিকে বিচিত্র ও সমৃদ্ধিময় করে তুলেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'সে' গ্রন্থে এই বিশেষ হাস্যরসধারার সপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সুকুমার রায় এই বিশেষ ধারাটিকে গদ্য থেকে কবিতার প্রবাহে বাহিত করে তাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন। উৎকল্পনার হাস্যরসের এই সাহিত্যধারা নির্মাণে সম্বুদ্ধের অবদান স্মরণীয়।

একাদশ অধ্যায়

[অন্যান্য লেখকগণ]

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারায় সৃজন ক্ষমতায় যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন কয়েকজন লেখক তাঁদের রচনায় কখনও কখনও উৎকাল্পনিক ঘটনাচরিত্র প্রতিবেশ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু উৎকল্পনার সংস্থানের দ্বারা বিশুদ্ধ হাস্যসৃষ্টি তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না।

এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় **উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর** নাম। বাংলা শিশু সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর একটি বিশেষ নাম এবং প্রেরণাস্থল। সুকুমার রায়ের ওপর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়ের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। প্রত্যক্ষভাবে পিতার গল্পের বহু চিত্র দৃশ্য ভাব তাঁর উৎকল্পনার হাস্যমুখর কবিতা-প্রাকারে সরস হয়ে উঠেছে। যেমন আবোল তবোলের 'গানের গুঁতো' কবিতায় গুপী গাইন বাঘা বাইন-এর চিত্র রয়েছে। ভীষ্মলোচন শর্মার গানের গুঁতোয় গাছপালা ধ্বংস হয়েছে, দালান ফেটে আকাশ কেঁপে প্রলয় ঘটেছে, গুপী আর বাঘার গানের দাপে নৌকা পর্যন্ত নিমজ্জিত হয়েছে। সুকুমার রায়ের 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা' উপেন্দ্রকিশোরের অদ্ভুত কল্পনার প্রেরণাজাত।

উৎকল্পনার ঘটনা চরিত্র কাহিনী উপেন্দ্রকিশোরের রচনায় বহু স্থানে এসেছে। কিন্তু এই সব উপাদান দ্বারা তিনি বাংলা সাহিত্যে শিশু-কিশোরের মনে এক অপূর্ব নবীন সাহিত্য জগৎ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ তাঁর ঘ্যাঘাসুর ও গুপীগাইন বাঘাবাইন, নীলসুতো লালসুতো, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, জীবজন্তু, গাছপালা রূপকথার বিস্ময়, আবিষ্টতা ও মুগ্ধ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। উৎকল্পনার হাস্যরস সৃষ্ট হয়নি। আবোল তাবোলে ভীষ্মলোচনের বিধ্বংসী গানের গুঁতোকে সবরকম উপরোধ অনুরোধ যখন থামাতে ব্যর্থ হল, তখন পাগলা ছাগলের শিংয়ের গুঁতো পশ্চাৎদেশে খেয়ে ভীষ্ম একেবারে ঠাণ্ডা হল। সুকুমার রায়ের কল্পনার এই কৈশোর-উল্লাস পরিণত শিল্পোৎকর্ষের স্পর্শে এক উচ্ছ্বসিত হাস্যসৃষ্টি করেছে। সুকুমার রায়ের লক্ষ্যই ছিল এ-ধরণের খেয়ালী

কল্পনা দিয়ে হাসির উৎসার। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর উৎকল্পনা নিয়ে এ জাতের হাস্যসৃষ্টির কথা আদৌ ভাবেননি। রূপকথার জগতে বা অলৌকিকতার জগতে অসম্ভব কল্পনা-বিন্যাস যেমন প্রধানত হাস্যসৃষ্টি করে না, উপেন্দ্রকিশোরের ক্ষেত্রে অনুরূপটাই সত্য।

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের মত কুলদারঞ্জন রায়ও শিশুসাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর কোন কোন গল্পে উৎকল্পনার উপস্থাপনা রয়েছে। যেমন 'পুণ্যের হিসাব' গল্পটি। জীয়ন্ত মানুষের স্বর্গগমন এবং যমদেবকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার মধ্যে উৎকাল্পনিকতা রয়েছে। এ গল্পে ত্রৈলোক্যনাথের রচনার অনুরূপ সরব হাস্যসৃষ্টির অবকাশ ছিল। কিন্তু তিনি এর মধ্যে বেতাল-পঞ্চবিংশতির অলৌকিক গল্পমেজাজ সঞ্চারিত করেছেন বিক্রমাদিত্য এর প্রশ্নানুরূপ প্রশ্নভঙ্গী এনে। তারই সঙ্গে কলুর কানাগরু, মাথানীচু পেত্নী, বররুচি ও তার কন্যার সাহায্যে প্রশ্নের উত্তরলাভ—এসব ঘটনা ও চরিত্র এনে রূপ-কথার আমেজ সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ মিশ্রণ ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু উৎকল্পনার হাস্যের ফলশ্রুতি রচনাই সেখানে লক্ষ্য কুলদারঞ্জন-এর গল্পে রূপকথার রসাবেদনই প্রাধান্য পেয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস-ধারায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-এর স্থান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কৌতুক হাসি এবং করুণ হাস্যের গল্পসৃষ্টিতেই তাঁর খ্যাতি। কাল্পনিকতার হাসি তাঁর দু-একটি গল্পে বহিরঙ্গ কৌশলরূপে এসেছে। 'বলবান জামাতা' গল্পটিতে কল্পনাকে কিছুটা ব্যবহার করে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করেছেন। বাসর-ঘরে বিদুষী শ্যালিকার বিদ্রূপে নলিনীকান্ত মনস্থ করলেন রমণী শোভন কমনীয়তার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হবেন। সেই উদ্দেশ্যে ডাম্বলসাধনা করে নবনীত কোমল দেহকে ষণ্ডামার্কা গুণ্ডার চেহারায় পরিণত করবার মধ্যে এবং একই নামে একই বৃত্তিসম্পন্ন দুই ব্যক্তির উপস্থাপনা করে শ্বশুর বিভ্রাটের ঘটনায় লেখকের খেয়ালী কল্পনার স্পর্শ রয়েছে। কিন্তু এই গল্পটিকে উৎকল্পনার হাস্যরসের গল্প না বলে Shakespeare-এর 'A Midsummer Night's Dream' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'স্বর্ণ গোলক' জাতীয় Pukish হাসির গল্প বলা সঙ্গত। Pukish হাসির মধ্যে পীড়ন কিছুটা থাকে, তবে কৌতুক হাসির তুলনায় পীড়ণের মাত্রা যেমন কম থাকে, অন্যদিকে খেয়ালী-কল্পনার প্রতি লেখকের প্রবণতাও থাকে। 'বলবান জামাতা'য় অনুরূপটাই লক্ষণীয়। 'রসময়ীর রসিকতা'

গল্পটিতে উৎকল্পনার আপাত সন্নিবেশ রয়েছে। কিন্তু উৎকল্পনার রসোত্তীর্ণ গল্প পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। মৃত্যুর পর বাড়ির বটগাছ আশ্রয় করে স্বামীর গতিবিধি রসময়ীর লক্ষ্য করা, পত্র লিখে বিবাহ-ইচ্ছুক স্বামীকে শাসান—এ সবের মধ্যে কল্পনার হাস্যকর উদ্ভটতা রয়েছে এবং তা নিয়ে 'থিয়োসফিষ্ট' মহলের সোরগোল হাস্যসৃষ্টি করেছে। কিন্তু উৎকল্পনা এ-গল্পে বহিরঙ্গ কৌশল হয়ে এসেছে। গল্পশেষে রসময়ীর ভৌতিক আচরণের রহস্যোদ্ধার যখন ঘটল, পাঠক যখন জানতে পারলেন এ-সবই-রসময়ী ও তার বোন বিনোদিনীর পূর্ব কল্পিত এবং রসময়ীর মৃত্যুর পর বিনোদিনী নিখুঁত অভিনয় করেছে ; তখন গল্পদেহ থেকে উৎকল্পনার আবরণ অপসৃত হয়েছে। বস্তুত এ-গল্পে উৎকল্পনার রূপক-এ প্রভাতকুমার নারী জীবনের এক গভীর বেদনার স্তর স্পর্শ করেছেন। সন্তান উৎপাদনের ব্যর্থতা সম্পূর্ণ স্ত্রীর ওপর চাপিয়ে দিয়ে পুরুষের পুনর্বিবাহ-বাসনাকে তিনি আঘাত করেছেন। তারই সঙ্গে রয়েছে ভূততত্ত্ব বিশারদদের প্রতি লঘু কৌতুকের বক্রহাসি : রাজশেখর বসুর 'ভূশণ্ডীর মাঠে'র সঙ্গে এ গল্পের পার্থক্য এই যে, রাজশেখর স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই ভূশণ্ডীর মাঠে উপস্থিত করে তাদের জন্মান্তরের মিলন-কলহের জীবন নিয়ে উচ্চরব হাস্যসৃষ্টি করেছেন। হাস্যসৃষ্টি এক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য। আর 'রসময়ীর রসিকতা'য় করুণ-হাস্যের সামাজিক গল্প-সৃষ্টিই লক্ষ্য। হাস্য ও কল্পনার উদ্ভটতা এখানে মাধ্যম হয়ে এসেছে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় **মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের** বিশেষ একটি স্থান রয়েছে। দেশবিদেশের গল্পের অনুবাদ ও ছায়াবলম্বন সহ মৌলিক গল্পরচনায় তিনি বাংলা ছোটগল্পের ধারাটি পুষ্ট করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই জীবনের সূক্ষ্ম বেদনার ও গভীর অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে। হাস্যরস সৃষ্টি তাঁর খুবই কম সংখ্যক গল্পে লক্ষ্য করা গেছে। 'আলপনা' গল্প-গ্রন্থের অন্তর্গত 'হুঁকার জন্ম' গল্পটিতে তিনি উৎকল্পনার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। ব্রহ্মার কমণ্ডুল, বিষ্ণুর বাঁশী এবং মহেশ্বরের ডমরু দিয়ে বিশ্বকর্মার উদ্ভাবনী শক্তি হুঁকা নির্মাণ করল। ধূম্রলোকবাসীদের এক সভা আহ্বান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ব্যস্ততা, বিশ্বকর্মার নির্মাণ-কৌশল ব্যাখ্যা, গল্পের শেষাংশে ইন্দ্রের আতঙ্ক এবং ব্রহ্মার ধূমপায়ীদের উদ্দেশ্যে জলকণ্ডুষ নিয়ে অভিসম্পাতে হাস্য উচ্ছ্বসিত হয়েছে। 'কোন ধূমসেবী আজ হইতে ধূমপান যন্ত্র নিঃসৃত সমস্ত ধূমগলাধঃকরণ করিতে পারিবে না, ধূমের অধিকাংশ তাহাকে ফু' দিয়া মুখের ভিতর হইতে বাহির

করিয়া দিতে হইবে। যে এই নিয়ম লঙ্ঘন করিবে সে ধূমপানে কোন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। তাহাকে যক্ষাকাশে অকালে দেহত্যাগ করিতে হইবে।'

গল্পের শেষ দ্বিতীয় ফুট নোটে লেখক মর্ত্যের অল্পবয়স্কদের সিগারেট বিড়ি খাওয়াটাকে একটু মৃদু কটাক্ষ করে গল্পদেহে হাসির উচ্ছ্বাসটাকে আরও বর্ধিত করেছেন। 'হুঁকোর সৃষ্টি হওয়ায় ধূম্রলোকে ধূম্রপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, —এই রূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য তামাক সাজাইবার নিমিত্ত একদল ভৃত্যের প্রয়োজন হওয়ায় ধূম্রলোকবাসীরা মর্ত্যলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন। বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্যদেহ ত্যাগ করিয়া ধূম্রলোকে গিয়া তামাক সাজিবে এই উদ্দেশ্যে।'

তথাপি গল্পটি উৎকল্পনার সার্থকতা লাভ করেনি। উৎকাল্পনিকতা যতটা স্বর্গের ও ধূম্রলোকের পটভূমিকায় নির্ভর করেছে ততটা গল্পের মূল বক্তব্য ও রীতিতে ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়নি। ভাষাও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। 'চন্দনচর্চিত পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হুঁকার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া হুঁকা-শাস্ত্র খুলিয়া সকল সভ্য হুঁকা স্তোত্র পাঠ করিলেন, "হে হুঁক্কে, হে ধূম্রপায়ি-সভাসভ্যজন, হে কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশিসমুদ্গারিণি, তোমাকে বার বার নমস্কার করি"।' দীনবন্ধুর মত মণিলালও মনে করেছিলেন উৎকল্পনার হাস্যরসের ভাষা হবে গুরুগম্ভীর। বস্তুত হাস্যরসের এই ধারাটিতে মণিলাল বড় নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বেদনার গল্পরচনার মধ্যে ক্ষণিক বিনোদনের জন্য যেন তিনি উৎকল্পনার গল্পটি রচনা করেছেন। ফলতঃ কল্পনায় স্থূলতা ও অযত্ন এসে পড়েছে।

উৎকল্পনাকে রূপক করে একাধিক গল্পে ব্যবহার করেছেন **প্রমথনাথ বিশী**। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ বিশীর কলম শক্তিশালী। সৃজনশীল রচনা-নাটক-গল্প-উপন্যাসও তাঁর রয়েছে। বেশ কয়েকটি গল্পে উৎকল্পনা বহিরঙ্গ কাঠামো হয়ে এসেছে। 'গালি ও গল্প', প্র-না-বির নিকৃষ্ট গল্প' এবং 'এলার্জি'তে এ জাতের কিছু গল্প রয়েছে। যেমন 'চারজন মানুষ ও তক্তপোষ', 'চিকিৎসক', 'সাহিত্যিক', 'শিক্ষক', 'একটি ঠোঁটের ইতিহাস', 'নূতনবজ্র', 'কল্কি' প্রমুখ গল্প। বাঘের মুখ থেকে এক ব্যক্তি বহু ভাগ্যে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল। 'কি রূপে ? তখন তাহার মনে পড়িল, সে যে শিক্ষক! সে যে জাতি গঠনের রাজমিস্ত্রি, শ্বাপদ বোধহয় সেই খাতিরেই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে।'... 'সাহিত্যিকের মাথা বড় শক্ত।

হেন ছাদ নাই খসিয়া পড়িয়া তাহাদের মাথা ফাটাইতে সমর্থ।' বরঞ্চ বিপরীতটাই ঘটে। সাহিত্যিকের মাথায় ইঁট লেগে ইঁট চূর্ণ হয়ে গেছে তার প্রমাণ স্বরূপ এক কৌটা ধূলি সাহিত্যিক সকলকে দেখালেন। 'কল্কি' গল্পে বিধাতা, বিশ্বকর্মা ইত্যাদিকে এনে একটি পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করে লেখক যন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। প্র-না-বি এ-ধরণের গল্পগুলিতে Swift বা বঙ্কিমের মতই উদ্ভট বহিঃকাঠামোর অভ্যন্তরে সঞ্চারিত করেছেন তাঁর প্রাবন্ধিক মনন ও বক্তব্য, তীব্র বিদ্রূপ, শ্লেষ। ফলতঃ উৎকল্পনার হাস্যরস রূপকের বাইরে রূপ হয়ে আসতে পারেনি।

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে কবিতা শাখায় খ্যাতি অর্জন করেছেন **সুনির্মল বসু**। সুনির্মল বসুর ছড়া ও কবিতায় সমৃদ্ধ না হয়ে বাংলা ভাষায় খুব কম কিশোর পত্রিকাই একদা প্রকাশিত হত। উৎকল্পনা তাঁর কবিতায় রয়েছে। কিন্তু তা এসেছে অনেকটা উপেন্দ্রকিশোরের শিল্পধারায়। উৎকল্পনার চিত্র, ছন্দ, কথা দিয়ে তিনি একটি শিশু সাহিত্যের কবিতা-জগৎ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। 'হাতীসিং পালোয়ানের' অদ্ভুত বীরত্বের পেছনে উদ্ভট কল্পনা রয়েছে—

'লাথি দিয়ে হাতী মারে সোজা কথা নয়' 'কিন্তু ছোট ইঁদুর যখন টাকের ওপর নাচল অজ্ঞান হয়ে গেল বীর হাতী সিং।' এ ধরনের কবিতায় উৎকল্পনা শৈশব ও কৈশোরের মজা, বিস্ময়, আনন্দ ও উল্লাসের আবর্ত অতিক্রম করে উৎকল্পনার উদাত্ত হাস্যের শিল্পরূপটি লাভ করতে পারেনি। কবির অনুরূপ সৃষ্টি লক্ষ্যও ছিল না।

বাংলা সাহিত্যে বর্তমানকাল পর্যন্ত বড় ছোট বহু লেখকই উৎকল্পনাকে ব্যবহার করেছেন এবং করছেন। কিন্তু অপূর্ব একটি প্রসন্ন মন, উদ্ভাবনী শক্তির মৌলিকতা এবং উৎকল্পনার হাস্যরসের বিশেষ শিল্পরীতিটি সযতনে ও একাগ্রতায় আয়ত্ত করতে না পারার ফলে বিচ্ছিন্ন দু-একটি গল্প কবিতার মধ্যেই তাঁদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ওপর দীর্ঘ বিস্তারিত ও শ্রমসিদ্ধ বহু মূল্যবান আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে। কিন্তু কল্পনার বিচিত্র উদ্ভাবনী ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হয়ে, বহু বর্ষ ধরে এই যে একটি সমৃদ্ধ হাস্যরসধারা রৌদ্রালোকিত বাংলা সাহিত্যের প্রান্তরে উচ্ছল আনন্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তার উৎস সন্ধান ও

গতি প্রকৃতির রহস্য, তার সম্পদগর্ভবহতার সংবাদ সে-সব আলোচনার অনুপস্থিত।

সকল দেশের পাঠক সমাজের মত আমাদের পাঠক সমাজেও অনেকে রয়েছেন যাঁরা হাস্যরসের এই ধারাটিকে সুনজরে দেখেন না। তাঁরা সহজ গ্রহণ শক্তিতে রসাস্বাদনে অসমর্থ। কোন কিছু একটা বক্তব্য অন্তত গুহাহিত অর্থ আবিষ্কার করতে না পারলে তাঁদের রসবোধ তৃপ্ত হয় না। ওদেশে এই শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচক এই বক্তব্যের সন্ধান না পেয়ে ক্যারল-এর বহু রচনাকে বলেছে "a piece ofdullsilliness", Raspe-র উৎকাল্পনিক শিকার গল্পগুলির পশ্চাতে কি 'motive' ছিল এ-নিয়ে একদল ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং বহু পরিশ্রম করে তাঁরা পেলেন, The travels of Baron Munchausen were written to redicule Bruce, the Abyssinian traveller whose adventures were at that time deemed fictitious.[১] এই গবেষকদের শ্রম দেখে এবং উৎকল্পনার হাস্যরসের মধ্যেও motive-সন্ধানের প্রবল প্রচেষ্টা দেখে প্রতিবাদী সমালোচকগণ যুক্তি প্রমাণ দিয়ে দেখালেন Bruce-এর Travels প্রকাশিত হবার চার বছর পূর্বে Raspe-তাঁর শিকার কাহিনী রচনা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও ত্রৈলোক্যনাথকে একজন প্রধান স্যাটায়ারিষ্ট বলে অনেকে যে মন্তব্য করেছেন সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকদের এই অর্থ ও উদ্দেশ্য সন্ধান দেখে 'কঙ্কাবতী' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে (ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী) বর্ণিত এক ঠেঙো মুল্লুক নিবাসী শ্রীমান ঘাঁঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতনীর শুভ বিবাহবার্তা আমাদের এই দুই ঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠক সম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে।"[২]

উৎকল্পনার হাস্যরস গ্রহণে অসমর্থ এই পাঠক সম্প্রদায় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত সকল দেশের সাহিত্যরসিক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, 'For such we can say that we suspect their taste in higher matters."[৩]

---

১. Notes and Queries— No 68, 1851.

২. সাধনা (২য়বর্ষ ১ম ভাগ, ফাল্গুন ১২৯৯)

৩. Arthur Compton Rickett—A History of English Literature. (A Paper Back Edition 1963, Page 496.)

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	ছত্র	যা হবে
৭	শেষ ছত্র	Wonderland
৯	১১	nonsense
১২	২	একেই কি বলে সভ্যতা
১২	২১	Wonderland
২৬	১৯	গুহাচিত্র
৪৭	২২	Italy
৪৮	১৬	সাহিত্য-আধারের
৫০	২৩	mischievous
৭২		(১৮৮৭-১৯১৯)
৯০	১৬	পুষ্করিণী
১০৫	১২	আবৃত্তি
১৪৮	১৫	কুপিত
১৬৩	৩	কবির
১৮৬	৬	তিনি স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ
১৮৬	১৮	মেখলা সাটি
১৮৭	২৩	রাজ্যের রাজা মন্ত্রী
১৮৯	৬	মরে গেলেও
১৮৯	১৬	শোভাময়
১৯৪	১২	all women
১৯৮	১৬	মন্দানিল
২১৩	৯	সূক্ষ্মশরীরটির
২১৭	২২	উদ্ভট
২২৭	১৩	ম্রিয়তাম
২৩০	৩	কতটা মদ খেলে
২৩৮	১৪	'ভালোরে ভালো'